শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দ্বিতীয় সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক ঃ সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সপ্তম মুদ্রণ

মুদ্রক ঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডি-লিট্ ব সাহিত্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
চিত্রের বামদিক হইতে দণ্ডায়মান : স্যার যদুনাথ সরকার, সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চ্যান্সেলার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভাইস্-চ্যান্সেলার মিঃ রহিম।

শ্রীকান্ত

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীকান্ত

দ্বিতীয় পর্ব্ব

১

এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক যখন সত্যই পড়িল, তখন বুঝিলাম, বিস্ময় এবং সঙ্কোচ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য্য করিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করা চলিবে না।

তাই, আজ আবার এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতছিন্ন গ্রন্থিগুলা আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ি ফিরিয়া আসার পরে আমার এই সুখে-দুঃখে-মেশানো জীবনটাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার নিজের নয়। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে, যাহার নিতান্ত গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদলাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর-এরকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল,—কোথাও যেন আর ঘর-বার, আপনার-পর রহিল না। এমনি একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে অন্তর-বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে রোগ বলিয়া, বিপদকে বিপদ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনেই হইল না। সংসারের কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধার যেন আর লেশমাত্র সংস্রব রহিল না।

এসব অনেক দিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। অথচ হারাইয়াছি বলিয়াও কোনো দিন ক্ষোভ করি নাই। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে-শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিরাট শক্তি! আর মনে হয়, সেদিন

আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্বল হাতের উপর এতবড় গুরু-ভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুই হাতের উপরেই আমার সেদিনের সেই অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত বোঝা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু যাক্ সে কথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল অনেকদিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঞ্ঝাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাস্তু! এতদিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি!

আকাশ-কুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা শুকনা পাপড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদিবা দু-এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত, হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলা আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এমনিভাবে আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেয়েলী কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠুক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার অক্ষর এবং নাম-সইর পানে চাহিয়া সহসা নিজের চোখ দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! আমার যে মা দশ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এই যে, বছর বারো-তেরো পূর্বে এই 'গঙ্গাজলে'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এ গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদিবা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে

বটে। মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যত প্রকারে কল্পনা করা যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান নাই।

সে যাই হোক, গঙ্গাজল যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাকা দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে হইল না! বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে সুপাত্র যখন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূঢ়া কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই হতভাগ্য সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর পায়ের তলায় সজোরে একটা ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে-পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে পারি না পারি, পরখ করিবার জন্য একদিন রাত্রে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারারাত্রি ট্রেনে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ন। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসর পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোকে চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া এবং দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সোপান-স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি কি গহনা আছে, এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং করিলে কত টাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল না। বলিলেন, তাঁর কোন-এক আত্মীয় বর্ম্মামুলুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না-নামিতে বাঙালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে,

এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। গঙ্গাজল-মায়ের বর্ম্মামুল্লুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। 'লাল' হইবার আশায় নহে—আমার মধ্যে যে 'ভবঘুরে'টা কিছুদিন হইতে ঝিমাইতেছিল, সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতিপূর্ব্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন মতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যতপ্রকারের জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকারে নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরন দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাত-ছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া শুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ি, বিদ্যা-সাধ্যি দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল; এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমন কতগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মূর্খ হইয়াও শুদ্ধমাত্র স্ত্রীর আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপর দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও চব্বিশ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না; এবং এজন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতূহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ যিনি সুদীর্ঘ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিলরূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না—সে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচ শত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রস্থান করিলাম। কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহিত না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এক উপায় ছিল, পিয়ারীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধেও মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদও জনিতাম না। সেই পৌছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লিখে নাই। বোধ করি, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্ততঃ তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নীচের বসিবার ঘরের বারান্দায় দেখিলাম, দুজন উর্দ্দীপরা দরোয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্ব্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরোয়ানজীর পরিবর্ত্তে কেন যে তাহার এমন দুজন বাহারে দরোয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব কিংবা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি রতন ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক হইয়া গেল। পরে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

এইমাত্র আসচি রতন। খবর সব ভাল?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু! ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আসচি, বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিবঠাকরুন ওপরেই আছেন?

আছেন, বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল! একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার

উপর শুভ্র জাজিম ধপ্ ধপ্ করিতেছে। তাকিয়াগুলায় অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জন-কয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরনে বাঙালীর মত ধুতি-পিরান থাকিলেও মাথার উপর কাজ-করা মস্‌লিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। এক জোড়া বাঁধা-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবলচি এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম। পিয়ারীর গায়ে মুজ্‌রার পোশাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজ-সজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল! তার পরে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এ কি! শ্রীকান্তবাবু যে! কবে এলেন?

আজই।

আজই? কখন? কোথা উঠলেন?

ক্ষণকালের জন্য হয় ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, এখানকার সমস্ত লোককেই ত তুমি চেন না, নাম শুনলে চিনতে পারবে না।

যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি এ যজ্ঞের যজমান তিনিই। বলিলেন, আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে; বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নীচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম। বিচারের সময় বেশী ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোনমতেই প্রকাশ পাইলে চলিবে না। আমার মুখের কথায়, আমার চোখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের ক্ষোভ বা অভিমানের একটি বিন্দুও বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে আসিয়া যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলাম, বাইজীবিবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাঁকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনের জোরটা তাঁর যাচাই ক'রে নিতুম। বলি করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!

প্রশংসা শুনিয়া কর্মকর্তা বাবুটি আহ্লাদে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক, দেখিলাম, তিনি বাঙলা বলিতে না পারিলেও বেশ বুঝেন। কিন্তু পিয়ারীর কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়—রাগে, তাহাও বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ্য করিয়া তেমনি হাসি-মুখে বাঙলা করিয়া কহিলাম, আমার আসার জন্যে আপনাদের আমোদ-আহ্লাদের যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গান-বাজনা চলুক।

বাবুটি এত খুশী হয়ে উঠিলেন যে আবেগে আমার পিঠের উপর একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা বাবু!—পিয়ারীবিবি, একঠো ভালা সঙ্গীত হোক।

সন্ধ্যার পর হবে—আর এখন নয়, বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলার একজন জমিদার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারীবিবিকে তিনি সাত-আট বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়িতে তিন-চারবার মুজ্‌রা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন; কখনও কখনও দশ-বারো দিন পর্য্যন্ত থাকেন—মাস-তিনেক পূর্ব্বেও একবার আসিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—এইবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, বাইজীকেই জিজ্ঞেস করুন না, কেন এসেচি।

পিয়ারী আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটা তীব্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ শান্ত স্বরে; কহিল, উনি আমার দেশের লোক।

আমি হাসিয়া কহিলাম, বাবুজী, মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে—তাহা দেশ-বিদেশের বিচার করে না। কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন, এবং তাঁর চাকর আসিয়া যেই জানাইল, সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করা হইয়াছে, তিনি তখনই প্রস্থান করিলেন। তবলচী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাৎ কেন এমন বিকল হইয়া গেল তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস নে? যা এখান থেকে, বলিয়া রতনের সঙ্গে

সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ির ভারকেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এখন হঠাৎ আসা হ'ল যে?

বলিলাম, দেশের লোক, অনেকদিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম বাইজী!

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমার পরিহাসে সে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া বলিল, আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ত?

থাকতে বল, থাকব।

আমার আর বলাবলি কি! তবে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে। যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে—

বাবু শুচ্ছেন? বেশ! আমি নীচে শোবো, তোমার নীচের ঘরগুলোও ত চমৎকার।

নীচে শোবে? বল কি! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দু-দিনেই এতবড় পরমহংস হয়ে উঠলে কি করে?

মনে মনে বলিলাম, পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনোনি। মুখে বলিলাম, আমার তাতে মান অভিমান একবিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে কর ত সেটা একেবারে নিরর্থক। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খাবার-শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশী বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে বলো, না থাকে দরকার নেই—আমার কম্বল সম্বল আছে।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে কোনরকম দুঃখ হবে না ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না। কারণ স্টেশনে পড়ে থাকার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ গাছতলায় প'ড়ে থাকতুম, এত অপমান সহ্য করতুম না।

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া পারিলাম না। সে যে কি কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম। কিন্তু শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলাম, আমি এত নির্ব্বোধ নই যে, মনে করব তুমি ইচ্ছে ক'রে আমাকে নীচে শুতে ব'লে অপমান করচ। তোমার সাধ্য থাকলে তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক্, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে পাঠিয়ে দাও গে, আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পিয়ারী কহিল, তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝবে না ত বুঝবে কে? যাক, বাঁচলুম! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ আসার সত্যি কারণটা শুনতে পাইনে কি?

বলিলাম, প্রথম কারণটা শুনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক ব'লে।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্ম্মায় যাচ্ছি। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখতে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরি হয়েছে, আসুন!

খুশী হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারী ঘুম পাচ্চে। ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা আছে, বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নীচের ঘরে না ক'রে এ ঘরে করা হ'ল কেন?

রতন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, নীচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই ত কথা ছিল!

সে অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে? আপনি কি যে তামাশা করেন বাবু! বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব শোবেন কোথায়?

রতন কহিল, বঙ্কুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়-হাত চওড়া তক্তাপাশের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেলফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরি হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এসব তাহারই স্বহস্তে-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্য্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি

হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে মনে মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে ঈর্ষার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয়ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্ম্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?

না, তা জানিনে।

তবে?

ফিরতেই হবে, এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।

নেই? তুমি কি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো নাকি?

কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু সংসারের এই একটা ভারী আশ্চর্য্য যে মানুষের দুর্ব্বলতা কখন কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোনদিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানিনে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু একজনের জানি! যদি কোনদিন ফিরে আসি ত শুধু তোমার জন্যই আসব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট-দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে ব'স, এ অবস্থায় কেউ দেখলে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্য্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া

গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠব!

কি কথা বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো? তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি, সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না? চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে প'ড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করি নে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হ'লে তুমিও আটকাতে পারবে না।

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাই ত, তোমাদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয়নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখব। বলিয়া সম্মতির জন্যে অপেক্ষামাত্র না করিয়া আমার পায়ের বালিশটা টানিয়া লইয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'তে পারে তা হ'লে? এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া কিসের জন্যে বর্ম্মায় যেতে চাচ্চ শুনি?

চাকরি করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল; কিন্তু আমাকে ঠকিও না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো?

সেটা বিলক্ষণ জানি; এবং কি করতে বল তুমি?

আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুশী হইল; হাসিমুখে বলিল, মেয়েমানুষে চিরকাল যা ব'লে থাকে, আমিও তাই বলি। একটা বিয়ে ক'রে সংসারী হও—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

প্রশ্ন করিলাম, সত্যি, খুশী হবে তাতে?

সে মাথা নাড়িয়া কানের দুল দুলাইয়া সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়! একশ'বার। এতে আমি সুখী হব না ত সংসারে কে হবে শুনি?

বলিলাম, তা জানি নে, কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল! বাস্তবিক এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে বিয়ে না ক'রে আমার আর উপায় নেই।

পিয়ারী আর একবার তাহার কানের স্বর্ণাভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি ত তা হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব। কিন্তু মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করব, তা বলে দিচ্চি।

আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসিমুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল, কহিল, বেশ ত, ভালই ত! স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ-দুঃখ জানি নে রাজলক্ষ্মী; যা স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্চি।

পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও চালাকি করতে হবে না—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যে নয়; চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই,

তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হল?

পড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়িনে।

তা হ'লে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।

আমি জানতেও চাই নে, বলিয়া যে ঝুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটো কিন্তু তাহার মুঠোর মধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোনো কথা কহিল না। তারপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপের সম্মুখে, মেজের উপর সেই দুইখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলা বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তারপরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলেবেলা দেখেচি।

মার চিঠি পড়লে?

হাঁ, কিন্তু খুড়ীমার চিঠিতে এমন-কিছু লেখা নেই যে তোমাকে তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর থাক ভাল, না থাক ভাল, এ মেয়ে আমি কোনমতেই ঘরে আনব না।

কিরকম মেয়ে ঘরে আনতে চাও, শুনতে পাই কি?

সে আমি এখনি কি ক'রে বলব! বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হ'লে আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর একজন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক্‌, যথাসময়ে তাই না হয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার ক'রে দিয়ো। শ'-পাঁচেক টাকা হ'লেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।

পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়ীমার কথা মিথ্যে হ'তে দেব না; একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বলচি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে—

নইলে কি?

নইলে আবার কি! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার ক'রে তবে কথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা ক'রো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সে না-হয় নাই পারব ; কিন্তু তুমি বর্ম্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে ?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম, কহিলাম, আমার সঙ্গে যে:তে তোমার সাহস হবে ?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, সাহস ! এ কি একটা শক্ত কথা ব'লে তুমি মনে কর ?

আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এই সমস্ত বাড়িঘর, জিনিসপত্র, বিষয়-আশয়—তার কি হবে ?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বন্ধুকে দিয়ে যাবো।

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অতদূরে না গেলেই কি নয় ? এসব তোমার কি কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না ?

বলিলাম, না, কোনদিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে। বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ি হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহারই আবার এতবড় দুর্ব্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারি নে বটে, কিন্তু যখনি ডাকবে, তখনি ফিরে আসব ! যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী।

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে ?

হাঁ, চিরদিন থাকব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল ?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না।

পিয়ারী অপলকচক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তারপর তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফোঁটা গাল বাহিয়া টপটপ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়; যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস ক'রো না।

পলকের জন্য দুইজনের চোখাচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।

২

এক-একটা কথা দেখিয়াছি, সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলা পর্য্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেমনি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোনমতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না; চাকর-বাকরদের সামনেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বলচি আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দ্দয়! একেও এর শাস্তি এক দিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে এত বড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্য্যামী জানেন। আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরোয়ান গাড়ির কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল

পা বাড়াইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয়ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষা দেবে?

বলিলাম, দেব।

পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রার যে ধরন, তাতে—আচ্ছা যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা করব না—খবর দেব, বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আমার পায়ের ধূলা লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক গে, যেও না!

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ ও ঘড়ঘড় শব্দে অপরাহ্নবেলা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কান্নাই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

৩

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিতে না-নামিতে, এক খাঁকি-কুর্ত্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না আসা পর্য্যন্ত, আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়িতে আসিতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড় রাস্তার অন্তর্বর্ত্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁশুটে, গেরুয়া—একটু কুয়াসা করিয়াও ছিল—মনে হইল একপাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোট-ঘাট

লইয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারারাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান অধিকার করিয়া লইবে বলিয়া। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ার যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্য্যন্ত এই কয়লাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রি (অর্থাৎ যার নীচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার জায়গা করিয়া লইবার কথা! কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে, সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনর শ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকলে বসেছিলে—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগ্‌দরি হোগা।

ডগ্‌দরি পদার্থটি কি বাপু?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি।

জিনিসটা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি-না-বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্কোচে ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দরজির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিলে বুঝাইয়া দিল যে, বর্ম্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ

রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি কসাইখানার যাত্রীদের পর্য্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুনযাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এতবড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল? ক্রমশঃ 'পিলেগ্‌কা দগ্‌দরি' আসন্ন হইয়া উঠিল,—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্ত্তী অবস্থায় বেশী ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না, তথাপি পুরোবর্ত্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য বাঙালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, রোগে দেহের স্থান বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তারসাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার চিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাতটা সেদিন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না। সে যাই হোক, পাশ করা যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন আর উপায় কি? যথাসময়ে চোখ বুজিয়া সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পাশ হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারে এই অধিরোহণ-ক্রিয়া যে কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে কলকারখানায় দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন সুমুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, মাদ্রাজী, মারহাট্টি, বাঙালী, চীনা, খোট্টা, উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী শুদ্ধমাত্র পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগে ডাঙা হইতে জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল; এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্ত্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধনালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া এই দল স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল; আমার যত দূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের

জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এক কোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত চক্ষের পলকে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া বাক্স পেটরার বেড়া-দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর-আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেচি; যদি বলেন, নীচে আনি।

বলিলাম, না; বরঞ্চ আমাকেও কোন মতে উদ্ধার ক'রে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া, তাহার সহিত হাতাহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া, পা ফেলিতে পারি, এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ড না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া কম্বল ও সতরঞ্চির এক-আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিসপত্র দেখাইয়া দিয়া বক্‌শিশ লইয়া প্রস্থান করিল। এখানেও সেই ব্যাপার—বিছানা পাতিবার জায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরে নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। স্টিমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে! কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙালী থাকে ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্ত্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মরিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র, কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্য্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন; জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, তাহা

সেইখানেই দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে এতগুলা সঙ্গীত-বিশারদ এক সঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নীচে নামা উচিত হইবে কি না, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি ইংরাজের মহাকবি শেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে মুগ্ধ না হয়, সে খুন করিতে পারে, না, এমনি কি-একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি, তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কি না জানি না, না হইলে, কাবুলিওয়ালা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! এক প্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিতেছিল! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি; হঠাৎ দেখি একব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক লোকের চোখরাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগত-যৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও মোটা জোড়া ভুরু আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায়, ইটি আমার পরি—

কথাটা শেষ না হতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল—পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা ব'লে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্চি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস্ কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবর্ত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্ব্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায়, দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখলেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এ জাত-বোষ্টমীর কথাগুলো মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং শহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত না হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা সুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই। আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্টশান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্রপীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জ্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল।

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমনকিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতার গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাজা বিক্রী করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙার নীচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুশুরি-খেঁসারি সব একাকার করে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ হ'ল যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক্, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্ত্তিমান নোংরা একজোড়া কাবুলিওয়ালা আপাদ-মস্তক সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগাদিগের প্রতি তাহার অত বড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল?

পরিবার কহিল, মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হ'লে—

নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্য এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত বলচি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিস্‌নে—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগ্য কাবুলীকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পারি নে। ওই দেখুন ভাঙা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস; এর বেশী যদি কিছু জানতে চান ত ওই দুষ্ট হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কট মট করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, তা যাক্, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত!

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুঁটলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখাও গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাবুলী জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটিও অমনি বেঁধে দেয়! ফেলিস নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাসে আমি ত হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র কর্কশ-শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিয়া,

টগর চীৎকার করিয়া উঠিল—জাত তুলে কথা ক'য়ো না বলচি মিস্তিরী—ভাল হবে না, তা বলচি—

চীৎকার শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালোমতোই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাশা করেচি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার স্বর আরও এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, কিসের তামাশা! জাত তুলে আবার তামাশা কি! মোচলমানের রুটি দিয়ে মালসা-ভোগ হবে? তোর কৈবত্তর মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্ গে—বাপের পিণ্ডি দিস্!

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—হারামজাদি, তুই বাবা তুলিস?

টগর কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস! বলিয়াই আকর্ণ মুখব্যাদান করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা ছি-ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল—সবসুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙালী নরনারী দ্বারা এক-জাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরোয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাশা দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গালীন তো বহুত আচ্ছি লড়নেওয়ালী হ্যায়! হট্‌তি নহি!

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

৪

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন্ কোন্ শর্ত্তাদি নির্দ্দিষ্ট হইল, কিছু জানি না। তবে,

পরে দেখিয়াছি, শর্ত্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ক্র্যাপ-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অপরের ব্যূহ ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতা পুরুষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে তাহাদের চলা-ফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ-গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্ত্তা, নীচে যাও; কাপ্তান কইচে ছাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট পনের পরে দেখিলাম কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরা-ধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্ত্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্ব্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডাঙাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত এমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগর-দোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষকোটি হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা

চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাহাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না—এ সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে পলাইয়া বেড়াইবার আর জো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্তেন দূরবীন হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্ত্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলো ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই ছাইক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণের একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলে-বেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভেতর ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ-সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জ্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুধুমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়া দিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌ বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্ব্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে তো আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ-মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটি জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে সেই অপরিমেয় গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড-গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ-সুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিট-খানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-সুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গের আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেন-সাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্ত্তে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগিগুলা বার-কতক ঝট্ পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর-এক-প্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট্ ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক, এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন-কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট্ বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনাজলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি-না ম্যা-ম্যা করি, মা মা করিয়াও অন্তত ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয় ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদিবা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের

দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলা-ঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্স্ট ক্লাসের দোর-গোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্য্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া মিস্ত্রীমশাই সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকাল-বেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিস্ত্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিল, মশায়, সাড়েবত্রিশভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র যে-যার কোটে ফিরে এসেচি। আজিকার মিশামিশি সাড়েবত্রিশভাজায় চলে কিনা, জানি না; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন-চারশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ' লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। বমি এবং অনুরূপ আর দুটা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তারবাবু জাহাজের মেথর ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবু আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন। তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্ছে, বোধ করি একটা হ্যামক পেয়েছিলেন, না?

হ্যামক কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্চে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, ডাক্তারবাবু, অধমও এই নরককুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া এখানে ঢুকিতে পারি নাই। শুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া আর বাকী রাত্রিটা ফার্স্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি কি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এমনি খুশী হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকী দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, শুধু ডেক্‌চেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা, ক্ষুধার তাড়নে নির্জ্জীবের মত এই কেদারাটার উপরে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্যবস্তুর চিন্তা করিতেছি—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জ্জিদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুমশায়, একটি বাঙালী মেয়েলোক আপনাকে ডাক্‌তেচে!

মেয়েলোক? বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে! কিন্তু আমাকে কেন? Trial by ordeal ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোন দিন যে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, ঘণ্টাখানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, না বাবুমশায়, বড় কাতর হয়ে ডাক্‌তেচে—

কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষমানুষটি কি করচে?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাক্‌তেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেক দূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল; তাহারই আড়ালে একটি বাইশ-তেইশ বছরের বাঙালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাছেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপরে এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে আস্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল, কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইলাম।

সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি; কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপ মারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। আমার অন্নদাদিদির কপালও বড় ছিল—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিন্দুর ডগ্‌ ডগ্‌ করিতেছে, হাতে নোয়া

ও শাঁখা, আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙা-পেড়ে শাড়ি।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েচে। তবে মনে হয় ডাক্তারবাবু লোক ভাল—কিন্তু, কি প্রয়োজন?

তিনি বলিলেন, ডাকলে যদি ভিজিট দিতে হয়, ত কাজ নেই, নাহয় কষ্ট করে উপরেই যাবেন। বলিয়া সেই রুগ্ন লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, জাহাজের ডাক্তারকে ডাকলে বোধ করি কিছু দিতে হয়ই। কিন্তু সে যাই হোক, এর হয়েচে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটি এঁর স্বামী। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ি থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখচি জ্বর খুব বেশী, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্তবাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক্।

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, চা খান ত?

বলিলাম, হাঁ।

বিস্কুট?

তাও খাই।

আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি ক'রে?

বলিলাম, স্ত্রীলোকটি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠাবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে করেচেন?

বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, তা হলে জুটে পড়ুন, নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা; তাতে টাইফয়েডের লক্ষণ মনে হচ্চে। যা হোক, বেশী দিন টিকবে না, তা ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে যায়।

অবাক হইয়া বলিলাম, আপনি এ সব কি বলচেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছোঁড়াটা বার ক'রে আন্‌চে, না ওকেই বার করে এনেচে, কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্তবাবু? খুব forward, না? দিব্যি কথাবার্ত্তা কয়।

বলিলাম, এ রকম ধারণা আপনার মনে কি করে এল?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কিনা, একটা-না-একটা আছেই। গত-বারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল। একবার বর্ম্মায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখবেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।

বর্ম্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ত্রীর খবর লইতে নীচে গেলাম। 'সপরিবারে' মিস্ত্রীমশাই তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, ঐ মেয়েমানুষটি কে মশাই?

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিতেছিল—ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি?

মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশাই, মাগীর ছোট মন? কে বাঙালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে—খবরটা নিতেও দোষ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সেই দুটি গোল-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগরা বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিস্তিরী মানুষ হয়ে গেল—এখন ও আমার চোখে ধূলো দেবে? আরে, তুই ডাক্তার না বদ্যি যে, যেই একটু জল আনতে গেছি, অমনি ছুটে দেখতে গেছিস্? কেন, কে ও? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি মিস্তিরী! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাবো? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব—তুই যা পারিস, তা কারস্। বলিয়া ফলাহারে মন দিল।

টগরও শুধু একটা 'আচ্ছা' বলিয়া তাহার পাগড়ি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এমনি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর

কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয়, অহর্নিশি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখিতে হইবে, না হয়, যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ করিয়া টগরের এই বিদ্বেষ, ডাক্তারবাবুর এমন কুৎসিত তীব্র কটাক্ষ - সে কে, এবং কি? টগর কহিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাক্তারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কাণ্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে; আর ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজী আছেন।

এমনিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অন্তর্যামী নয়, কিংবা তাহার ভ্রম-প্রমাদ কখনো হয়। সবাই কহে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জহুরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভালো ভাবিয়া নির্বোধ হওয়াতেই যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশীই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নরনারীর উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাক্তার-বাবু বলিয়াছিলেন, অত্যন্ত forward, তা বটে। এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, বাড়ি বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ঔষধে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি ও অশোভন প্রগল্‌ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব, তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট

বৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনিও মাস-খানেক পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করায় অভিভাবকহীন হইয়া বাপের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণীদাদাকে রাজী করিয়া বর্ম্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না করে কোন মতে দেশের বাড়িতে পড়ে থাকলেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার কোন খোঁজ নেন না, কিছু জানেন?

না, কিছু জানিনে।

তার পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, তা জানেন?

জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্ম্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন; কিন্তু কত চিঠি দিয়েচি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোন দিন আমার ফিরে আসেনি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবতঃ হেতু এইমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্মরমণী লইয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেক আছে, যারা সারাজীবন আর কখনো দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, বরং তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

থপ্ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল।

আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাবচেন, আমি জানি।

জানেন?

জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাবতে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা হোক, আমি ভয় করিনে—আমি সতীন নিয়ে ঘর করতে পারব?

তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই

বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাবছেন, আমি ঘর করতে রাজী হ'লেই ত হ'ল না ; আমার সতীন রাজী হবে কিনা, এই ত ?

বাস্তবিক, আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, বেশ তাই যদি হয় ত কি করবেন ?

এইবার অভয়ার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, এ বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু! আমার রোহিণীদাদা বড্ড সাদাসিদে ভাল মানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাধ্য থাকিলে নিশ্চয়ই করব ; কিন্তু এ-সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

সে-কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌছিবে ; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখেচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন্—কেরেন্টিন্। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine। তখন প্লেগের ভয়ে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে ; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্ব্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশ দিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে. এবং সে Port Health Officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় না ক'রে আপনার আসা উচিত ছিল না ; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোক-দেরই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিসই নিজে কাঁধে করে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়—ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয়—তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে স্টিমে ফুটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতিকার নেই, ডাক্তারবাবু ?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তবে ডাক্তারসাহেব জাহাজে উঠলে একবার আপনার জন্য ব'লে দেখব, তাঁর কেরানীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজী—কিন্তু

কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দুইজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার ৬।৭ জন খালাসীকে এলো-পাতাড়ি লাথি মারিতেছে. এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটি অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সহিত ইতিপূর্ব্বে কোনদিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজও কলহ হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত—একদিন তোমাকে এ জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এ ভাবে লাথি মারা ভারী অন্যায়।

লোকটা জবাব দিল, মারা ছাড়া ক্যাটল্ সিধা হয়?

ডাক্তারবাবু একটু স্বদেশী। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই কাপ্তেনসাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।

হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, Doctor, they are your countrymen ; you ought to be proud of them !

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাক্তারবাবুর মুখের উপর দু'হাতের বুড়া আঙ্গুল দুটা নাড়িয়া দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব্ব তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার ক'রে হাস্‌চিস্ যে!

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ্জ ক'রে খায়ে হাসতেচি মোরা?

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তিনি চৌকির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল।

বেলা এগারটার সময় Quarantine-এর কাছাকাছি একটা ছোট স্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাকি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমার তাড়া ছিল না, কারণ ডাক্তারবাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ কতকটা অন্যমনস্কের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ, আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে শহরে গিয়েই নামব।

অভয়া কহিল, না—না, শীগ্‌গির গুছিয়ে নিন।

বলিলাম, আমার এখনও ঢের সময় আছে।

অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে না।

অভয়া বলিল, তা হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও-জায়গায় যাব না। ওখানকার সব কথা শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টল্ টল্ করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে।

সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন—এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারি নে। উঠুন, নীচে চলুন। আপনি না থাকলে ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা ছেলেমানুষ কি করব বলুন ত?

নিজের জিনিসপত্র লইয়া যখন ছোট স্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তারবাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন, ফিরুন—আপনার হুকুম হয়েচে—আপনি—

আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর একটা হুকুমে আমাকে যেতেই হচ্চে।

সহসা বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?

তার জন্য ক্ষমা চাইচি।

না না, তার দরকার নেই, আমি জানতুম। Good bye! চললুম! বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

৫

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য—ভদ্রলোকের জন্য নয়, এবং যে কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশী দেয় নাই, সেই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে এবং কর্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন, কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। সাহেবরা ইহাও জানে যে, কুলির জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জাম এমন কিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেন্টিন যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, তাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই! এ সকলই সত্য, তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপরে এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোট-ঘাট সুমখে লইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পরে মুখোমুখি চাহিয়া দাড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দুরদৃষ্ট। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। তাঁহারা যে-যাহার লোটা-কম্বল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বোঝাগুলি তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া, স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিণীদাদা একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ ও চরম শ্রান্তি—এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব—শুইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি বাঁচেন! অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোঁচকা-বুঁচকিগুলি! অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে! অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে; এক স্কন্ধে ভর করিয়াছেন এক নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায় নারী, অপর স্কন্ধে ঝুলিতেছেন তেমনি অপরিচিত এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ। মোটঘাটগুলা ত সব ফাউ। এই সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এক অজানা জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি কল্পনা করিয়া পাঠক হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ হইতে পারে; হয়ত কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপোকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের

তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া বলিতেছিল, এত বড় গাধা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে! কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না; তবে এক-জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাঙ্গিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও এইবার চোখে পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথায় লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিবে, না, হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেচেন—মনে করবেন না যেন। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যাননি, তার নাম দান। এত বড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয়ত কমই পাবেন, তা ব'লে রাখচি। কিন্তু সে কথা যাক। জিনিস-পত্তর এইখানেই প'ড়ে থাক, চলুন, এঁকে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়।

বোঁচকা-বুঁচকির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি রোহিণীদাদাকে পিঠে করিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল, অন্যান্য জিনিসপত্র সেইখানেই পড়িয়া রহিল। অবশ্য সে-সকল আমাদের খোয়া যায় নাই, ঘণ্টা-দুই পরে তাহাদের আনাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাল্পনিক বিপদের চেয়ে ঢের সুসহ। প্রথম হইতেই ইহা স্মরণ থাকিলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা ছাড়া পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাটীতেও যখন বড়কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ ত মোটে কেরেন্টিন। জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরূপ বেশ forward হইতে পারে তাহা বোধ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, হয়েচে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার আমি করচি।

বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা-দুটি শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি করবেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কম রয়েচে? জিনিসগুলি আনতে হবে, একটা

ভাল ঘর যোগাড় করে আপনাদের দুজনের বিছানা তৈরী করে দিতে হবে, রান্না করে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি হবে, তবে ত একটু বসতে পাবো। না না, মাথা খান, উঠবেন না; আমি এক্ষুনি সমস্ত ঠিকঠাক করে দিচ্চি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবচেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এ সব যোগাড় করব কি ক'রে, না? তা বৈ কি! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে! সে আমি না আর কেউ? বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটিকয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া কেরেন্টিনের অফিস-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যে একজন চাপরাসী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব-ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিসপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দুখানি খাটিয়ার উপর দুজনের বিছানা পর্য্যন্ত তৈরী হইয়া গিয়াছে। এক ধারে নূতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা, কাঠ সমস্তই মজুত। মাদ্রাজী ডাক্তারের সঙ্গে অভয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে কথাবার্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে নিয়ে এ-বেলার মত চারটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ও-বেলা তখন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন খালাসীকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইহারই অভিভাবকতায় এখানের দিনগুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয় বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভয়াতে আমি দুটো জিনিস শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা সে কোনদিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, তাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া দিত, আমরা এক-জায়গার যাত্রী মাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই—দু'দিন পরে হয়ত সারা জীবনের মধ্যেও আর কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আর এমন আনন্দের পরিশ্রমও কখনও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্যই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, এ ত সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে রোহিণীদাদারই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথা-ব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্যেই ত আপনাদের এত দুঃখ।

হয়ত খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘণ্টায় দুটা বাজিতেই

একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আপনাদের চা তৈরী করে আনি—ছুটো বাজল।

মনে মনে বলিতাম, তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন, পুরুষমানুষ ত! যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝবেনই।

তার পরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমরাও সরকারী ছাড়পত্র পাইয়া আর একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, শহরে মোসাফিরখানায় দুই-একদিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া তবে আমি নিজের জায়গায় যাইব, এবং যেখানেই থাকি তাঁহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

শহরে যেদিন পদার্পণ করিলাম, সে দিনটি ব্রহ্মবাসীদের কি একটা পর্ব্বদিন। আর পর্ব্বও তাহাদের লাগিয়াই আছে। দলে দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোশাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সুতরাং আনন্দ-উৎসবে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা—সকল বয়সের স্ত্রীলোকই অপূর্ব্ব পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হাসিয়া, গল্প করিয়া, গান গাইয়া সমস্ত পথটা মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের রং অধিকাংশই খুব ফরসা; মেঘের মত চুলের বোঝা ত শতকরা নব্বই জন রমণীর হাঁটুর নীচে পড়ে। খোপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা—ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই—দ্বিধা-সঙ্কোচলেশহীন—যেন ঝরনার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের দেশের তুলনায় মনে মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, এই ত চাই! এই নইলে আবার জীবন! তাহাদের সৌভাগ্যটা সহসা যেন ঈর্ষার মত বুকে বাজিল। কহিলাম, এই যে ইহারা চতুর্দ্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছনে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্পষ্ট মনে আছে। বচসা বাধিয়াছে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া লইয়া। গড়োয়ান আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান। সে কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা, আর তিন-জন ভদ্রঘরের ব্রহ্মরমণী গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—না, পাঁচ আনা; মিনিট দুই-তিন তর্কাতর্কির পরেই, বলং বলং

বাহুবলং। পথের ধারে একটা লোক মোটা মোটা ইক্ষুদণ্ড গাদি করিয়া বিক্রি করিতেছিল, অকস্মাৎ তিন জনেই ছুটিয়া গিয়া তিন গাছা হাতে তুলিয়া হতভাগা গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সে কি এলোপাথাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতেও পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে একে আটকায় ত ওর বাড়ি মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত তার বাড়ি মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—কিন্তু সে শুধু তামাশা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগড়ি, কোথায় গেল হাতের ছিপ্‌টি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পিয়াদা! চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল!

সবে বাঙলা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে ভদ্রঘরের অবলারাও যে একটা জোয়ান-মদ্দ পুরুষমানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া লাঠি-পেটা করিতে পারে—ক্রমশঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে লাগিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিংবা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিংবা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব—কিন্তু আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদভ্রান্ত হইয়া গেল।

৬

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসায় নূতন ঘরকন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গুনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশী সময় লাগে নাই। কারণ কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় ভ্রান্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং শুধুমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙালী বর্ম্মা মুল্লুকে পদার্পণ করামাত্রই

পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং এখনকার মত নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুটের মাথায় এক ঝাঁকা তরি-তরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়াছিল—জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, ব'লে দিতে পারেন।

লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন্ নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়িকে খুঁজছেন?

বলিলাম, সে ত জানিনে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি! শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব'লে।

লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, ওঃ—মিস্তিরী। অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত দেখতে পাইনে। তখন বড়সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি! আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম্ম? কেটে যে জোড়া দিতে পারি। তবে কি জানেন মশায়—

দেখিলাম, অজ্ঞাতে লোকটার এমন জায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, তা হলে নন্দ ব'লে কোন লোককে আপনি জানেন না।

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেঙ্গুনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্তিরী বললেন? আসচেন কোত্থেকে? বাংলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজচেন।

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!

লোকটি কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি করে? আসুন আমার সঙ্গে! বরাতে করে খাচ্চে মশাই, নইলে নন্দ পাগড়ি নাকি আবার একটা মিস্তিরী। মশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, সে দেবে

আপনাকে চাকরি ক'রে? তা সাহেবকে ব'লে দিতেও পারে একটা যোগাড় ক'রে, কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন? তা হলে আঠারো আনা পাঁচসিকে রোজ ধরতেও পারে। এর বেশী নয়!

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উমেদারিতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় যোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্র-লোকদের মেসে যান না?

কহিলাম, মেস কোথায়, সে ত চিনি না!

সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ও বেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এই বেলায় নন্দর সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমোচ্চে। ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙালে আর রক্ষে থাকবে না মশাই।

সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মধ্যে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দাঠাকুরের হোটেল রয়েচে—চান করে সেবা করে ঘুম দিয়ে বেলা পড়লে তখন দেখা যাবে। চলুন।

হরিপদর সহিত গল্প করিতে করিতে দাঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিং রুমে জন-পনর লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজীতে দুটা কথা instinct এবং prejudice; কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সংস্কার। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়; কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, খাওয়া-ছোঁওয়া বস্তুটা যে instinct হিসাবে সংস্কার নয়, তা দাঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ প্রথম টের পাইলাম; এবং সংস্কার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে এই যে অসংখ্য জাতিভেদের শৃঙ্খল—তাহা দুপায়ে পরিয়া ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান; সে আলোচনা এখন থাক্; কিন্তু এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিস জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে-কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচার প্রচলিত নাই, তেমনি দেশে পা দেওয়া মাত্রই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ছাপান্ন পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার

শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারাও খায়। কারণ জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সে ও একই কথা—না খেলেও, সে ওই খাওয়াই ধরে নিতে হবে। নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। বর্ম্মা ত তিন-চার দিনের পথ; অথচ দেখি, পনর আনা বাঙালী ভদ্রলোকই—বোধ করি ব্রাহ্মণই বেশী হইবেন, কারণ এ যুগে তাঁহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে সস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ পাচক ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে। কিন্তু তাহারা যে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটাপাড়ার ভট্চায্যিদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী! যাঁহারা নিতান্তই এই সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা রুটি, ফলটা পাকড়টাও ছাড়েন না। অথচ সেই একদম নিষিদ্ধ মাংস হইতে বর্ত্তমানে রম্ভা পর্য্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদাগাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড রুমে রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই। তবে আরাম এইটুকু যে, বর্ম্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি কোন গতিকে শাস্ত্রকারের কোভিসিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয়ত আবার একটা ছোট-খাটো ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক্, ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্য্যন্তই থাক। হোটেলে যাহারা সারিসারি পংক্তিভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর, ওয়ার্ক-শপে কাজ করে। সাড়ে-দশটায় ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। শহরের প্রান্তে মস্ত একটি মাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা, এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দাঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্ম্মা আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙালী। ইহাদের কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দাঠাকুর আসিয়া আমাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন, একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থেকে আমার কাছে আহার করুন, চাকরি-বাকরি হ'লে পরে দাম চুকিয়ে দেবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেন না, একমাস থেকে এবং খেয়ে দাম না দিয়েও ত চলে যেতে পারি?

দাঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই?

বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দাঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন; তবেই দেখুন! বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপে অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতে-নাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকা-কড়ি, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকিবার জন্য বর্ম্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাই হোক্, দাঠাকুরের কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া আমার খাবার জায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং রুমে বহু লোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকেও সেখানে না দিয়ে এখানে দিচ্ছ কেন?

সে কহিল, তারা যে নোয়াকাটা, বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্কমেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কাটতে হবে, সে ত এখনও ঠিক হয়নি। যাই হোক, আজ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কাল আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়ো।

ঝি কহিল, আপনি বামুনমানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন?

ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙালী বটে, কিন্তু একজন ডোম আছে।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না, জানি না, কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাল জাত; কায়েত আছে, কৈবর্ত্ত আছে, সদগোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাতসমুদ্দুর-পারে এসে কি অত বামনাই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গাস্নান ক'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির করলেই হবে।

হয়ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারিজন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চল্‌তি-মুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্নানটা হয়ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিত্তির কোনকালেই করে না। বিদেশের আবহাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলে মাত্র দুটি হুঁকা আছে; একটি ব্রাহ্মণের, অপরটি যাহারা ব্রাহ্মণ নয় তাহাদের। আহারাদির পর কৈবর্ত্তের হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্ম্মকারমশাই স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন-দুই পরে এই কর্ম্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না?

কর্ম্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বৈ কি?

তবে?

ও কি আর প্রথমে ডোম ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, বলেছিল, কৈবর্ত্ত। তার পর সব জানাজানি হয়ে গেল।

তখন তোমরা কিছু বললে না?

কি আর বলব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে বলতেই হবে। তবে লজ্জা পাবে, এই জন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হ'লে কি হ'ত?

লোকটা যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর কারও রক্ষে ছিল? তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরিনে; তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে আর সবাই সমান; নবশাখই বলুন আর হাড়ি-ডোমই বলুন কিছুই কারো গায়ে লেখা থাকে না, সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিটচে; আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ খায় না, গাঁজা খায় না—আচার-ব্যবহারে কার সাধ্যি বলে ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে; আর ঐ লক্ষ্মণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি একবার ব্যবহারটা? ব্যাটা দু-দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। সবাই না থাকলে এত দিন ওকে জেলে মেথরের ভাত খেতে হ'ত যে!

লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহার ডোমত্ব গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে-দেশে ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত চর লাগাইয়া তাহাদের আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন অপরিচিত বাঙালীর এত বড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে; এবং সুদ্ধ তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সেকথা উত্থাপন পর্য্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই। যাক। বহুদিন পর্য্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার যে অক্ষর-পরিচয় আছে এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জানিয়াছে, আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজি জানি, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজি জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাহাও সত্য; কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু এইজন্যই আমার কত সংসঙ্কল্পই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু সে কথাও আজ থাক। দেখিলাম বাঙালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল, কিন্তু আজ তাহারা আর একভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া একেবারে খাঁটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে। পুরুষদের মনে মনে হয়ত আজও একটা সাবেক জাতের স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলে-মেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙালী; অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী নই, বাঙালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে, শুধু বাঙালী হলেই যথেষ্ট এবং চট্টগ্রামী বাঙালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া

দুই হাত এক করিয়া দিলেই ব্যাস্। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজী হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা ভালবাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; তাহারাও বলে, আমরা বাঙালী। আবার তাহাদের বিবাহের সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান—এবার কিন্তু আর একতিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটা অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থ-ই হিন্দু এবং দুর্গাপূজা হইতে শুরু করিয়া ষষ্ঠী-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

৭

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল শহরের এক প্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনর-ষোল দিনের মধ্যে ওদিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ-শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও বাহির হই। ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাকরি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটি যে ঠিক তেমনি প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাংলা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকী রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বাঙালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ মাস-মাহিনায় পরের চাকরি করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কোনমতে হাড়-মাংসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণীবাবুরও যে সে-ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাকরি যোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবাগোবা বেচারা-গোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্য্যন্ত যেন ভয় করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক, একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণীদাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নবজলধরমণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরু-গম্ভীর; কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু যে! ভাল ত?

বলিলাম, আজ্ঞে, হাঁ।

যান, ভিতরে গিয়ে বসুন।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ত?

হুঁ—ভেতরে যান না। তিনি ঘরেই আছেন।

তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন?

না—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একরকম খুন হবার জো হয়েচি, দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণীদাদার মধ্যেও যে এতখানি গাম্ভীর্য্য এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই দুরূহ। ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটি কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসি মুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিলাম, চলুন না রোহিণীদা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে।

রোহিণীদা জবাব দিলেন, গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা জানেন শ্রীকান্তবাবু?

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আহ্বানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও এক গ্লাস জল। গণনায় নিরূপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণীদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন—তাই তাঁহার মরণ হইলে তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন? এতদিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও কিছু না; আপনি কেমন আছেন বলুন।

কেমন আছি সে ত নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা চাকরির যোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। রোহিণীবাবু যে বলছিলেন—আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণীদা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পট্ পট্ শব্দে ঘরে ঢুকিয়া কাহারও প্রতি দৃকপাত মাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া এক নিশ্বাসে অর্দ্ধেকটা এবং বাকীটুকু দুই-তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গেলাসটা কাঠের মেঝের উপর ঠকাস্ করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—যাক, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে, ক্ষিধে পেলে খেতে দেবে।

আমি অবাক হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, ক্ষিধে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে-কথা কানেও তুলিলেন না - বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু অর্দ্ধমিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সারাদিন অফিসে খেটে খেটে ক্ষিধেয় গা-মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্তবাবু—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার এতটুকু বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?

তাঁহার মুখের ভঙ্গিতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম, কহিলাম, কিন্তু সেখানে লুচি-মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী বলিলেন, দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে?

আমি জিজ্ঞাসু-মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই সে ধীরে ধীরে বলিল, মাথা ধ'রে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরী করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ?

অভয়া তেমনি শান্তভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

তুচ্ছ বই কি ?

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হতে পারে, কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন ? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি করে !

রোহিণী ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ—একথা আমি বলেচি ?

অভয়া বলিল, বলবে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্চো।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্চি ! ওঃ—তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে ?

অভয়া কহিল, তোমাকে ব'লে লাভ কি ? তুমি কি বিশ্বাস করতে ?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন ! ওঁর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলুম —বাড়ি ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সক্রোধে উত্তর দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও ! আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে ? তোমার কে আমি ? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, ছুটো বেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন ! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—বলিতে বলিতেই তাঁহার কান্নায় কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল ; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখ হেঁট করিল—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না ; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে ত চোখেই দেখিলাম। কিন্তু ইহার নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও সে যে ক্ষুধা এবং খাবার তৈরীর ত্রুটি হইতে বহু দূর দিয়া বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। তবে কি স্বামী অন্বেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেরই কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—এখন তা হলে আসি।

অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আবার কবে আসবেন ?

অনেক দূর—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া, অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুকরা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয়

করবেন। আপনাকে এর বেশী আমি বলতে চাইনে। বসিয়া, আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঠিকানাটা 'ক ?

প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দায় সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণীদাদাকে আশে-পাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্য্যন্ত কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চায়ের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, এবং একবাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত হস্তাক্ষর। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাহার পূর্ব্বেকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে—আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এই বিপদে আপনার উপর আমি যে কত নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বার বার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশী আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে কোন একটা বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারংবার চোখেই দেখিয়াছি; কিন্তু তার পরে? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিংবা আর কোন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্য্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্ত্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা অফিসে চাকরি যোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল, জানি না—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই; লুচিও জোটে। তথাপি যে কি রকম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল, এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে, অভয়ার স্বামী লোকটি যেই হোক, এবং যেখানে যে ভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উমেদারিতে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না!

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দাঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাতের তরকারি প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু চাকরি আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না; যে চক্ষেই প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিককাল পরেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কাহার 'পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকরি পাবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না। এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণীবাবুকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরি-তরকারি কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম—যদিচ তাঁহার গায়ের জামা-কাপড় জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে—তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মাথায় একটা ছাতা পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু আহার্য্য দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিয়াছেন; সেদিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই-বাছাইয়ের অবধি নাই। হাঙ্গামা ও পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই সব কেনা-কাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র ব্যাকুল স্নেহ যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সূর্য্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই সকল লইয়া তাঁহার বাড়ি পৌঁছানো একান্তই চাই, কেন যে এই সকলের মূল্য দিবার জন্য চাকরি তাঁহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম; কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং আমি পাই নাই।

ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়া একরাশ মোট হাতে লইয়া, শতচ্ছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামা-কাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে। আর আমি? বস্ত্রের সামান্য মলিনতায় প্রতিপদেই যেন সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি!

রোহিণীদা চলিয়া গেলেন—আমি তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না, এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে

আমার দুচক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম, এবং নিজের মনই বার বার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অন্ধ সংস্কার আমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়—শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুন কাঠের প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি বস্তুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না, সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি 'সাহেব' হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও দেখিলাম বেশ বাঙলা জানেন। কারণ কলিকাতার অফিস হইতে তিনি বদলি হইয়া বর্ম্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাকরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর—মাহিনাও প্রায় আড়াই গুণ বেশী পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে এক লক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া হাড় বাহির করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাত-মোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়! আমাদের হোটেলের দাদাঠাকুর নেহাত মিথ্যা বলেন না।

গাড়ি ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণীদা অফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুন্নি-বৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক্, আমার ত ছিল না। অতএব অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণীদা জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুন্নকণ্ঠে কহিল, তোমাকে বার বার বলচি রোহিণীদাদা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম ক'রো না, তুমি কি কিছুতেই শুনবে না? আচ্ছা কি হবে আমাদের বেশী টাকায়? দিন ত বেশ চলে যাচ্চে।

রোহিণীর দুচক্ষু দিয়া স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তারপরে এ টুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্য্যন্ত রাখতে পারচি নে, খেটে খেটে দুবেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল! বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ত শ্রীকান্তবাবু, এর অন্যায়! সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পরে বাড়ি এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নটা পর্য্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি অত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি, না? বলিয়া সে আর এক দিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না—আমার বিধাতা-পুরুষেরও ছিল কি না সন্দেহ!

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েক দিন হইল, বর্ম্মা রেল কোম্পানির অফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড়সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানীর চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্য্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা! আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কিনা; তাই আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছ!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই।

রোহিণীবাবু কি বলেন?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ওমুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জানব বলুন? তা ছাড়া, তিনি নিজেই বা জানবেন কি ক'রে? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই কহিল, একটা কথা। আমার জন্য তিনি একবিন্দু দায়ী ন'ন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চীৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরি হবে?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থ-ই অকূল-পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না সত্য, কিন্তু নারীর এতরকমের উল্টাপাল্টা ব্যবস্থা আমি দেখিয়াছি যে বাহির হইতে এই দুটো চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কত বড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্ত্তির মত মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কিন্তু দশহাত না যাইতেই মনে পড়িল ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ি ঢুকিতেই চোখে পড়িল—ঠিক দ্বারের সম্মুখেই অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না— তাহার এই নিগূঢ় অপরিসীম বেদনার একজন নির্ব্বাক সাক্ষী এ-জগতে বিদ্যমান রহিল।

৮

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা, আসিয়া পর্য্যন্তই আমার মনে ছিল, কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না; তার পরে, লিখবই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এমনি ভারী হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ-কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা দুই-তিন পরে সাহিত্য-চর্চ্চা সাঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে; কিন্তু পাছে সকালবেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাঠাইতে

লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্র নারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল, কিন্তু অভয়ার এই পরম এবং চরম সঙ্কটের কালে যে-রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রশ্নটা উল্টাদিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ না পাওয়ার সমস্যাই বার বার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একটিবারও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতাপুরুষ আমার উপরেই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন চার-পাঁচ পরে আমার একজন বর্ম্মা কেরানী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরে নীল পেন্সিলে বড়সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট-কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরানীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ-চুরির অভিযোগে সাস্পেণ্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী! ইহারও চার-পাঁচ পাতা-জোড়া কৈফিয়ত ছিল। বর্ম্মা রেলওয়ে হইতে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাকরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরানীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবা-মাত্রই সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরণে হ্যাট-কোট কিন্তু যেমন পুরানো, তেমনি নোংরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড়-ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে বা ছিটকাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা—তাহার ইহকাল-পরকাল, সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্ত্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া

গেল। অভয়া আর যাই হোক, সে সুশ্রী এবং সে মার্জ্জিতরুচি ভদ্রমহিলা; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্ম্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা যে-দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যুত্তরে লোকটা মিনিট-দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দ্দোষ; তবে সে থাকায় প্রোম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনার লোক ভর্ত্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। একবিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাকরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি? আপনার মত কর্ম্মদক্ষ লোকের বর্ম্মা মুলুকে কাজের ভাবনা কি? রেলওয়ের চাকরি গেলে কদিনই বা আপনাকে ব'সে থাকতে হয়েছিল?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বলচেন তা নেহাত মিথ্যে বলতে পারিনে! কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলিম্যান, অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা—

আপনি কি বর্ম্মার মেয়ে বিয়ে করেচেন নাকি?

লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেব ব্যাটা রিপোর্ট লিখেচে বুঝি? এই থেকেই বুঝবেন শালার রাগ।—বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বলেচেন মশাই। আমি ত তাই সবাইকে বলি, যা করব, তা বোল্ডলি স্বীকার করব। আমার অমন ভেতরে এক, বাইরে আর নেই। আর পুরুষমানুষ—বুঝলেন না? যা বলব, তা স্পষ্ট বলব মশাই, আমার ঢাক্-ঢাক্ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাকরি ক'রে খেতে হবে—বুঝলেন না মশাই!

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দেশে কি কেউ নেই?

লোকটা অম্লানমুখে কহিল, আজ্ঞে না, কেউ কোথাও নেই—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সুয্যিমামার দেশে আসতে পারতাম? মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে-সে ঘরের ছেলে নই, আমরাও একটা জমিদার। এখনো আমার দেশের বাড়িটার পানে চাইলে আপনার চোখ ঠিক্‌রে যাবে। কিন্তু অল্পবয়সেই সবাই মরে-হেজে গেল—বললাম, দূর হোক গে; বিষয়-আশয় ঘর-বাড়ি কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুষ্টিদের বিলিয়ে দিয়ে বর্ম্মায় চলে এলাম।

একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অভয়াকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাকে জানলেন কি ক'রে?

বলিলাম, এমন ত হ'তে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এ-অফিসে দরখাস্ত করেচে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, ওঃ—তাই বলুন। তা স্বীকার করচি, এক সময়ে সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—

এখন?

কেউ নয়। তাকে ত্যাগ ক'রে এসেচি।

তার অপরাধ।

লোকটা বিমর্ষতার ভান করিয়া বলিল, কি জানেন, ফ্যামিলি-সিক্রেট বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হ'লাম। নইলে সাধ ক'রে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা দিয়ে মাড়ায়! আপনি বলুন না এ কি সোজা মনের ঘেন্না!

জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যাবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ, তেমনি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্কোচে দিল—পর হইয়াও আমি তাহা উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তার এই অপরাধের কথা আপনি আসবার সময় ত ব'লে আসেননি! এখানে এসেও কিছুদিন যখন চিঠি-পত্র এবং টাকা-কড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও ত লিখে জানাননি।

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট স্থূল ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এই নিন কথা। জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্রলোক, শুধু চুপি চুপি সহ্য করতেই পারি—ছোটলোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক পিটে প্রচার করতে পারি নে। থাকগে, সে-সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই—এ-সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তা হ'লে কেসটা আপনিই ডিস্‌পোজ করবেন? যাক, বাঁচা গেল, কিন্তু তাও ব'লে রাখচি, সাহেব ব্যাটাকে অমনি অমনি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার পেছনে না লাগেন। আমারও মুরুব্বির জোর আছে, এটা যেন তিনি মনে বোঝেন। বুঝলেন না? আচ্ছা আমি বলি, হারামজাদাকে হেড অফিসে টেনে আনা যায় না?

আমি বলিলাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, নিন

তামাশা রাখুন। বড়সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়েই এ:সেচি ভাবেন? তা মরুকগে, আর একবার আমার সঙ্গে লেগে যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা, বড়সাহেবের অর্ডারটা আজই বার ক'রে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? নটার গাড়িতেই চ'লে যেতুম, রাত্তিরটা কষ্ট পেতে হ'ত না; কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ খোশামোদ জিনিসট এমনি যে, সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া বুঝিয়াও—ক্ষুন্ন করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উল্টা কথাটা মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ বাধ করিতে লাগিল, কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, বড়সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নাই। আপনি আর কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখবেন।

এক মুহূর্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিস্‌মিস্ করবার নোটই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল—হাত জোড় করিয়া কহিল, বাঙালী হ'য়ে বাঙালীকে মারবেন না বাবু, ছেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলা পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরানী, দরোয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জন্যেই বর্ম্মায় এসেচে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে, কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে তার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন—আপনার চাকরি আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখব। না হ'লে আর আমার সঙ্গে দেখা ক'রে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে।

এই নীচ-প্রকৃতির লোকগুলো যে অত্যন্ত ভীরু হয় তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল এমনি সময়ে আসবেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা-বেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল

দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্ম্মা-মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ; তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়াকে মুখ তুলিতে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে বার বার আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?

কথাটা শুনিয়া খুশী হইব কি চোখের জল ফেলিব, ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাই পুনঃ পুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনদিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা সে কাহার উপর জানি না-একদিকে যেমন নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনই এক নিরাশ্রয় রমণীর ততোধিক নিরুপায় প্রশ্নে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল; পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আজ সে বেশী কথা না কহিয়া, শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার পরের দিন আবার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার একছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে ব'লে কি হবে—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করুন গে, বড়সাহেব এবার মাপ করেচেন।

সে হাসিমুখে কহিল, বড় সাহেবের ভাবনা আমি আর ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্ত্তে যাব—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি; এই বলিয়া আবার সে বলিতে শুরু করিয়া দিল—তেমনি নির্জ্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য, এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার ধৈর্য্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ

দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল; না হইলে অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে তাহার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, শুধু বর্ম্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে)। কিন্তু আজ রাত্রেই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলেপুলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রীছাঁদ, তেমনি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে পরতে দেবে, না মরলে এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম— ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল, বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনরকমে না হয় ছিলাম; কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেছে। একবার ভেবে দেখুন দেখি ব্যাপারটা!

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন?

আজ্ঞে না, এখন প্রোমের পোস্টমাস্টার মশায়ের ওখানেই রাখব। তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশ থাকবে। কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা ঠিক ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।

অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিল, আমিও আমার দিনের কাজে মন দিবার জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নীচেই অভয়ার লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল! তার পরে কতবার যে সেই দু-ছত্র পড়িয়াছি এবং আরো কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজ-পত্র কিছু দিয়ে আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে-চারিটা বাজিয়া গেছে এবং কেরানীর দল দিনের কর্ম্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ি প্রস্থান করিয়াছে।

৯

আবার অভয়ার স্বামীর পত্র পাইলাম। পূর্ব্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার সে যে সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহাই সসম্ভ্রমে ও সবিস্তারে নিবেদন করিয়া আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত হওয়া সত্বেও, সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে, এবং তাহার

এক দিকে তাহার বর্ম্মী স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া, অন্য দিকে অভয়াকে আনিবার জন্য প্রত্যহ সাধ্যসাধনা করিতেছে ; কিন্তু কোনমতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্ম্মিণীর এইপ্রকার অবাধ্যতায় সে অতিশয় মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা যে শুধু কলিকালের ফল, এবং সত্যযুগে যে এরূপ ঘটিত না—বড় বড় মুনি-ঋষিদের পর্য্যন্ত যে—দৃষ্টান্ত-সমেত তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া সে লিখিয়াছে, হায়! সে আর্য্য-ললনা কৈ! সে সীতা-সাবিত্রী কোথায়! যে আর্য্য নারী স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বামী-সহ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতেন, তাঁরা কোথায়? যে হিন্দু-মহিলা হাস্যবদনে তাহার কুষ্ঠ-গলিত স্বামী-দেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী? কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ। আর কি আমরা সে সকল চক্ষে দেখিব না? আর কি আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুইপাতা-জোড়া বিলাপ। কিন্তু অভয়া পতি-দেবতাকে এই পর্য্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস করিতেছে তাই নয়, সে আজ পরম-বন্ধু পোস্টমাস্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে-একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্য্যন্ত যে ইজ্জত নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক, না বুঝিয়া হোক আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায় তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলে-মেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্ম্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্যে আলাদা করিয়া তৈরী করা হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঞ্ঝাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত।

সেই পর্য্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্ব্বেই গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর

কথাতেই ভরা। যেন সর্ব্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল, কত অপটু, কত অসহায় এই একটা কথাই ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্ম্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরল-চিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না। নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে নানা কারণে এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ-বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সতীধর্ম্মের একটা অপূর্ব্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্নদাদিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে—আমার সে যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি সবাই অন্নদাদিদি নয়; সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত অত বড় বুকও সকল নারীতে থাকে না; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রন্থকারমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই, কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম; এবং সেই অপদার্থ, পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিণীকে বেশ করিয়া যে দুকথা শুনাইয়া আসিব, তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে কি হয় নাই। অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা ভাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে ত, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এছাড়া আর কি, সে ত আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। ডান দিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উনুন জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বঁটি পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই; কারণ কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপর যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে

বলিতে পারি। কিন্তু নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দায় মোড়াটার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?

সাড়া দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবু? ওঃ—বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দুজনেই চুপচাপ। আমি প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণীদা, আর কেন এখানে! চলুন আমার সঙ্গে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন।

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্চে, তাই।

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আর কি!

তা বটে! কিন্তু এ সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই-না তিরস্কার করিব, কতই-না সৎপরামর্শ দিব ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম, সব ভাসিয়া গেল। এত বড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি—নীতি-শাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশী পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদ্বেষ! সমস্ত সাধু-সঙ্কল্প যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না।

রোহিণী কহিল যে, সে প্রাইভেট টিউশনিটা ছাড়িয়া দিয়াছে; কারণ তাহাতে শরীর খারাপ করে। তাহার অফিসটাও ভাল নয়—বড় খাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি!

চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এই রোহিণীর মুখেই কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছিলাম। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আর এই রাঁধা-বাড়া, অফিস থেকে ক্লান্ত হ'য়ে এসে ভারী বিরক্তিকর। কি বলেন শ্রীকান্তবাবু?

বলিব আর কি। আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ ত জানা কথা।

তথাপি সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। কল্পনার ত কেহ সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না, সুতরাং সে কথা ধরি না। কিন্তু অসম্ভব আশা যে কোনভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কয়টা কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার

পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না যে, যে হৃতভাগ্যের গৃহের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা যদি খাড়া রাখিতে না পারে, ত ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য সংসারে আর কাহারও নাই।

বাসায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে একজন আগা-গোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল, ভদ্দরলোক।

তাই আমার ঘরে!

আহারাদির পরে এই ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। তাহার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। বছর-চারেক পরে নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের সন্ধান মিলিয়াছে। তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মশাই, গল্পে শুনি, আগে কামরূপের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের ভেড়া ক'রে ধরে রাখত। কি জানি, সে-কালে তারা কি করত; কিন্তু এ-কালে বর্ম্মা-মেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে এক তিল কম নয়, সে আমি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি।

আরও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোট ভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাঁধিয়া লাগিব, কথা দিলাম। কেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোট-ভাইয়ের বর্ম্মা-শ্বশুরবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বড় ভাই আড়ালে রাস্তার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোট ভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেল করিয়া প্রাতঃভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, শুধু স্ত্রী তাহার একটি ছোট বোন লইয়া এবং জন-দুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের জীবিকা বর্ম্মা-চুরুট তৈরি করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল। আমাকে বাঙালী দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর বন্ধু ভাবিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; কিন্তু পুরুষেরা তেমনি অলস; ঘরের কাজ-কর্ম্ম হইতে শুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয়। কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্ম্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জ্জনের অন্ন বাড়িতে ধ্বংস করিয়া বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে, লোকে আশ্চর্য্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি-ছি করিয়া, ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে।

মিনিট-দশেকের মধ্যে 'বাবুসাহেব' দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ইংরাজি পোশাক, হাতে দু'-তিনটা আঙটি, ঘড়ি-চেন—কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতে হয় না—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ স্বচ্ছল। তাঁহার বর্ম্মা-গৃহিণী হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট, দেশলাই আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু-টারু এমনি কি-একটা যেন হইবে। যাকগে, আমরা না হয় তাঁকে শুধু বাবু বলিয়াই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি কে?

বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না! বলিলেন, আপনি ত কলকেতিয়া, কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে ভ্রাতৃরত্নের দর্শনাভিলাষে উদগ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে বাবুটির পদধূলি পড়িল, এবং উভয় ভ্রাতায় বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পবে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়েব কি যে মিল হইয়া গেল—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি দাদা বলিয়া ডাক দিযা যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিস্ ফিস্ মন্ত্রণা, আলাপ-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্নে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি একদিনের জন্যেও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। দিন-চারেক পরে দাদাটি আমাকে একগাল হাসিয়া কানে কানে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ি যাইতেছেন। শুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত?

দাদা বলিলেন, আবার! রাম রাম ব'লে একবার জাহাজে চড়তে পারলে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

দাদা কহিলেন, বাপ্ রে! তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে! বেটির যে যেখানে আছে, রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে। বলিয়া চোখ দুটো মিট মিট করিয়া

সহাস্যে কহিলেন, ফ্রেঞ্চ লিভ মশাই, ফ্রেঞ্চ লিভ—এ আর বুঝলেন না?

অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি ত তা হলে ভারি কষ্ট পাবে?

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একেবারে হাসিয়াই আকুল। কোনমতে হাসি থামিলে, বলিতে লাগিলেন, শোন কথা একবার! বর্ম্মা-বেটীদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এঁটোকাঁটার বিচার, না আছে একটা জাত-জন্ম। বেটীরা সব নেপ্পী (এক প্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ঙাপি' বলে) খায়, মশাই নেপ্পী খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নী পালায়। এ ব্যাটা-বেটীদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোটজাত ব্যাটারা—

থামুন মশাই, থামুন, আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধ'রে রাজার হালে খাওয়াচ্চে, পরাচ্চে, আর কিছু না হোক, তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে!

দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে অবাক করলেন মশাই! পুরুষ-বাচ্চা বিদেশে-বিভূয়ে এসে বয়সের দোষে নাহয় একটা শখ ক'রেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত জানতে বাকী নেই, এর না-হয় একটু জানাজানি হ'য়েই পড়েছে—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এমনি ক'রেই বেড়াতে হবে। ভাল হ'য়ে সংসার-ধর্ম্ম ক'রে পাঁচজনের একজন হ'তে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে ঢুকে যে মুরগী পর্য্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না, করলে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বলচি, না, মিথ্যে বলচি!

বস্তুতঃই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। অফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু অফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভেবে দেখলাম, আপনার পরামর্শ ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি—ব'লে যাওয়াই ভালো। এ বেটীরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জাসরম, না আছে একটা ধর্ম্মজ্ঞান। জানোয়ার বললেই ত চলে।

বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্যই ছিল। কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি, তাই তাঁকে see off করিতে জাহাজঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকা-হাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিক ওদিক চাহিতেই সেই বর্ম্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙা। ছোটবাবু মহা ব্যস্ত। তাঁহার দুচাকার গাড়ি লইয়া, তোরঙ্গ বিছানা লইয়া, আরও কত কি যে লট-বহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়-ঝাঁপ করিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহার মুহূর্ত্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিস-পত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সব ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙর-তোলা চলিতে লাগিল—এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্য-সম্ভারের হেফাজত করিয়া, জায়গা ঠিক করিয়া তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারে নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময় ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে। সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা-ভগিনী-জননীর জাতি। তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘ কাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে। তাহারই বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত অমৃত সে ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এত বড় নির্দ্দয় বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল। লোকটা এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের দুচক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্ম্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি-সব বলিতেছে, এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশে-পাশে অনেকগুলি বাঙালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে, কেহ বা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্ম্মা-ভাষায় এবং বাঙলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙলাটা কথঞ্চিত মার্জ্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়,—এক মাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আনিব, তা আমিই জানি। ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁকাইয়া ফুঁফাইয়া বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ টাকা তামাক কিনতে দিলি—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভরল না—অমনি তোর বাড়িটাও বিক্রি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম একটা দাও মারা গেল। এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না!

আশে-পাশে লোকগুলা হাস্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাষ্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন। মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে বা।

খালসীরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, বাবু, সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক-কালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন ক'রে হোক দুশ-আড়াইশ টাকা দাম—এটাই বা ছাড়ি কেন!

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙুলে পরাইয়া দিল। যথা লাভ! বলিয়া লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ জেটি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে! কেহ বা বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে বলিতে গেল, কি মজাটাই করলে! হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল। এমন কত কি মন্তব্য। শুধু আমি কেবল সেই সকলের হাসি-তামাসার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতে, সে আস্তে আস্তে কহিল, বাবুজী এসেছেন, দিদি, ওঠো!

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ ভাঙিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আমার সান্ত্বনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, বাবুজী,

বাড়ি আমার আজ খালি হইয়া গেছে। কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া ঢুকিব। এক-মাসের জন্য তামাক কিনিতে গেলেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব। বিদেশে না জানি কত কষ্টই হবে, কেন আমি যাইতে দিলাম। রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন আমাদের চলিতেছিল;—কেন তবে বেশী লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে পাঠাইলাম! দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে বাবুজী, আমি পরের মেলেই তাঁর কাছে চলিয়া যাইব। এমনি কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানলার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়া-মায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।

একটু থামিয়া আবার বার দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।

চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ির দরজা আটকাইয়া বলিল, না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা খাইয়া আসিবে চল।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ি চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবুজী, রংপুর কত দূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন জায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, মিলে বৈ কি?

সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্যবশতঃই হোক বা চক্ষুলজ্জাতেই হোক, বা হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এত বড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে, ত মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার চোখের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটি তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত

ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশী নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দাঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই সমস্ত গোলমাল যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্ম্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে কোন নর-নারী তিন দিন একত্রে বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্বীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না। আবার বাবুটির দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দু-সমাজ তাহাদের গ্রহণ না হয় নাই করিল, কিন্তু আপামর-সাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারা জীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করা, না হয়, এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ ধর্ম্ম কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে ত—সে হিন্দুরই হোক, বা আর কোন জাতিরই হোক—এত বড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এই সকল কথা না হয় সময় মত চিন্তা করিয়া দেখিব; কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনাদোষে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া তাহাকে মুখ ভ্যাঙচাইয়া পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি, আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব, আইয়ে!

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্য্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার-দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু লজ্জার যে মূর্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে

দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দুরকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পাপিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্মা মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এসব অভ্যাস মত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই!

১০

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ-সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন ব'লে। আজ দুজনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে 'বাবু' বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরশু। কি হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতুহল হচ্ছে। বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

যে-সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তব্ধকঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীধর্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি যে স্ত্রী হ'য়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এত দূরে এসে তাঁর শান্তি ভঙ্গ করেচি,—মেয়েমানুষের এত বড় স্পর্দ্ধা পুরুষমানুষে সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই; তোমাকে বার বার চিঠি লিখে জবাব পাইনে।

তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বললেন, আজ তার জবাব দিচ্চি। এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটা আর একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্ব্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু যে অন্ধ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল! আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং, বেশ করিয়াছে; একথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ, এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চ'লে আসাটা যে অন্যায় এ-কথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই কিন্তুটার বিচারই ত আপনার কাছে চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্ম্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন শুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইচি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার ছাড়া ত কর্ত্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা। তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ ব'লে আমারি উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা কিন্তু পর্য্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে চ'লে আসাটা আমার অন্যায় হয়নি, কিন্তু—এই কিন্তুটার

অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকাই তার নারী-জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেননি?

অভয়া কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না।

কহিলাম, তা হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চ'লে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারী মন খারাপ হ'য়ে আছে। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশী নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্ম্মা মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বলতে পারিনে।

কহিলাম, আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদাদিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এদের কারুর স্থানই আপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদাদিদির সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অভয়া কাঠের মুর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে! কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তার পরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানিনে। এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি ব'লেই তুলনা দিতে পারলুম। তার পরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দুজনের দেখা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্যে অমর হ'য়ে ছিল, সেইদিন তাব প্রমাণ হ'য়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তার পরে?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, তার পরে এমন একদিন এসে পড়ল, যেদিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার পবে কি হ'ল জানেন?

জানি। তার পরে আর নেই।

অভয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই—এম্‌নি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচাব-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন কবাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বলতে পারেন?

না, তাও পারিনে। তা ছাডা আজ আমার মন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে আছে যে, এই সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর এক দিন ভেবে দেখব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে-ক'টি নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েচি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বলতে পারি। সে ভার অসহ্য হ'লেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাবলেও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী! তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেচি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম, তা না হ'লে সে এত সচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না; হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতে চাইত!

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার জো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে; আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েচে ব'লে আমাকেও এখন তার দরকার নেই! দেখুন, আমি নিজেও বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাইনি। তার থেকে এই বুঝেচি, দুঃখ জিনিসটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার কথা বুঝেচি শ্রীকান্তবাবু! অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন! কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেযেচি আমি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল, এদের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরী নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত! আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না; আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলে-পুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু ক'রে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণদুটা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েচেন, তিনি কি তাতেই খুশী হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী

সন্তানদের আপনারা যা খুশি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ব'লে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমনিই বটে! সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব, যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে, যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু? আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয়ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্ম্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন?

ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্তবাবু?

প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে কহিল, যাক, আপনারা জায়গা নাই

দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথাটায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশী দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্য হয়, তাহলে কি তারা অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে, আর আপনারা ন্যায়-ধর্ম্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেচি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেচি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্চে! শুনেচি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে এক ঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরী হয়নি। আমরা হয়ত চোখে দেখে যেতে পাব না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্র আসবে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্ম্মা দেশটাও একটা মুসলমান-প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজ-ঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত, কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার ক'রে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্য্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোন্‌টাতে সত্যকার ধর্ম্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু?

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জানলেন কি করে? আমার ত মনে হয় না, এত বড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষমানুষের মধ্যেও বেশী আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা ব'লে ভাবতে ত অন্ততঃ আমি কোন মতেই পারবো না।

অভয়া ম্লানমুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশী পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাব না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়ে আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব! সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতের বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

১১

মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিয়া একটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দাঠাকুরের হোটেলে একটা হরি-সংকীর্ত্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিতেন! কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন, জানিতাম না। এইমাত্র শুনিয়াছিলাম—তাঁর নাকি অনেক টাকা, এবং সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প, জীবনে যদি উন্নতি লাভ করতে চান ত আপনাকে এমন গুটি-কয়েক সৎ পরামর্শ দিতে পারি, যার মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যাঁর কাছে এই উপদেশ পেয়েছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মাহিনা পেতেন; কিন্তু মরবার সময় বাড়িঘর, পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রেখে গিয়েছিলেন। বলুন ত, একি সোজা কথা! আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজের কথাটা এখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মাহিনা-পত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল—বর্ম্মায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করচেন বলুন দেখি! ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়ে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। দেখতেই ত পান আমি কোন লোকের কথায় থাকি না; কিন্তু আমার কথা মত, বেশী নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি; আমি বলচি আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্য্যন্ত করতে পারবেন।

এই সৌভাগ্যের জন্য অন্তরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ তথ্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন, জানি না; তবে কিনা, তিনি ভিতরে ভিতরে সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজ-মন্ত্রস্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দান-টান করার কথা ছেড়ে দিন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়—এক কোমর মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। সে কথা বলি না—নিজের মুখে রক্তউঠা কড়ি—আজ-কালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলে-পুলে, পরিবারের জন্য রেখে থুয়ে তবে ত?—সে কথা ছেড়েই দিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন, যার সংসারে দেখবেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দেবেন না। বেশী নয় দু-চার দিন আসা-যাওয়া ক'রেই নিজে হাতেই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলে দুটাকা চেয়ে বসবে। দিলে ত গেলই, তা ছাড়া বাইরের ঝগড়া ঘরে টেনে আনা। দু-দুটাকার মায়া কিছু আর সত্যই

কেউ ছাড়তে পারে না—তাগাদা করতেই হয়। তখন হাঁটাহাঁটি ঝগড়াঝাঁটি—কেন, আমার তাতে আবশ্যক কি, বলুন দেখি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্রসন্তান, তাই কথাটা চট্ ক'রে বুঝলেন; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা ব্যাটারা সাতজন্মেও বুঝবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কর্জ্জ ক'রে আর একজনকে টাকা এনে দেবে—এ ছোটলোক ব্যাটারা এমনি আহাম্মুক!

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট ত দু ভরি সোনা এনে রেখে যাও না, দিচ্ছি দশ টাকা ধার! কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত!

তিনি বলিলেন, ঠিক নয় আবার! একশবার ঠিক! আর দেখুন ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয়ত দু-এক ঘা নিজের গায়েই লাগবে; তা ছাড়া এক পক্ষ সাক্ষী মেনে বসবে। তখন কর ছুটাছুটি আদালতে। বরঞ্চ থেমে গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরে এসে দুটো ভালমন্দ পরামর্শ দাও, পাঁচজনের কাছে নাম হবে। কি বলেন?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না; তখ্‌খনি ব'লে বসবে, দাদা মরি—এ বিপদে দুটাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। না হয় ত বলবে, এসো রাত্রি জাগতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার কিছু-একটা—মা শীতলা-না করুন, এই নাক-কান মলচি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের দুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়ে আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের! তারা কখ্‌খনো ওরূপ স্থানে যায় কি? কখ্‌খনো না! নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে ব্যস্! হয়ে গেল। তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি। তার পরে

ভাল হলে আবার যেমন মেলা-মেশা, সব তেমনি। মশাই, কারুর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখনো যেতে নাই।

অফিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু-পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশী মানসিক উন্নতি হওয়া আমার সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি মনের মধ্যে খুব বেশী আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই, এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই, এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ তা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবন-যাত্রার কার্য্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন—বাঙালী পিতামাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিশের সি. আই. ডি-র লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কত বড অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইঁহারই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন!

সেই অবধি অভয়ার বাড়ির দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলি মিলাইয়া লইয়া আগাগোড়া জিনিসটা জ্ঞানের দ্বারা একরকম করিয়া দেখিতে পারিতাম সে-কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক, কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্ত্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাঁহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না! আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্ত্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ-ভোগ করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষ বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের

মানদণ্ডে একদিকে যত বেশী দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর একদিকে তত বড় সুখের বোঝা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকু স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছে, মনে করিয়া নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও চতুর্গুণ আহার্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ-বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সংশয় উত্থিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখ-ভোগের কঠোরতা দেখিয়া দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না, তাহা নয়, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের ঈর্ষাকুল হইয়া উঠে, এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য, এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে, এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ি যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উল্টাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক কতকগুলা দুঃখ-ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্কন্ধে ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বিধবার আচরণ বলুন—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দু-বিসর্গ সম্বন্ধ নাই। বিধবার চাল-চলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, তাহা আমি মানি না। বস্তুতঃ ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে-কেহ তার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চাল-চলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ, না হয় ত নাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ত সব শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশে সকল যুগে বিধবার চাল-চলনটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে ভেবে এসেছে। ইহাই নিরর্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পঙ্গু ক'রে দেবার এত বড় ছায়াবাজি আর নাই।

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুত, তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাশা করিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি ভারি forward; কিন্তু তখন দুজনের কেহই ভাবি নাই—এই forward কথাটির অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্য্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা-কাটাকাটি করিত না--সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত একরকম—কাজ আর-একরকম ছিল না বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না—কেমন একরকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হোক, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, একথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল, ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এমনি একটা কুণ্ঠিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতেছিল বলিয়া, না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন শহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল! হায় রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটি যন্ত্র-তন্ত্র, কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই একমুহূর্ত্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ শহরের চৌদ্দ আনা লোকই হয় চাকুরিজীবী না হয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পলাইবারও জো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে! 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই লোকে ছুটিতে শুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কোনটা যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি-একটা সামান্য কাজের জন্য সকালে বাহির হইয়াছি। শহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্ত্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দু-মিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের প্রত্যেক চলাফেরাটি পর্য্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে, আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই; আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, অনেক দিন ত আমাদের ও-দিকে যাননি—আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেচি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেণ্ট্রিতে ভুগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি করি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেচেন।

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কি না, চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধমকে।

একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখা আবশ্যক। কারণ যাঁহাদের জানা নেই যে, পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী জাতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজি কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাহারা চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দুটাকা বেশী মাহিনা দিয়া তবেই ত্রিবেদী-চতুর্ব্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function একত্রে combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙালী বামুনদের আজিও একাজে রাজী করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উহাদেরই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলেই কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হিন্দুস্থানীর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। (মুরগি রাঁধাইতে আরও চার আনা, আট আনা মাসে

অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্থের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্য্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুস্থানীরা—এ-কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর combined hand-কে আমি কেন ধমক দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধমক শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যাণ্ডটি মনোহরবাবুর নূতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন—শুধু ডিসেণ্ট্রির খাতিরে অল্পদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই, আপনি কি সহজ লোক! শহরশুদ্ধ লোক আপনার কথায় মরে বাঁচে, তা কি আর জানিনে ভাবচেন! বেশী নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ত ওর চৌদ্দ বছর জেল হয়ে যাবে, সে আমি কি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ করে শাসিত করে।

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্য্যন্ত শুনি নাই—তাঁহাকে, বেশী নয়, মাত্র একটা ছত্র লিখিলেই একটা লোকের চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা,—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগা combined hand-কে শাসন করিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার!

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া যখন কাঁদ-কাঁদ হইয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়িতে 'দেও' আছে, এখানে সে কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের 'ছায়া' রাত্রি দিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়িতে যান, ত সে অনায়াসে চাকরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে—

যে অন্ধকার ঘর, তা 'ছায়া'র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্য্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

Combined hand কহিল, কোই চুহা-উহা সড়ল হোগা। চমকাইয়া উঠিলাম। চুহা কি রে? এ ঘরে মরে নাকি?

সে হাতটা উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা ইঁদুরের সন্ধান

পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ-বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ায় শহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নাই; এমন ভদ্র বাড়িওয়ালাও আর নাই, এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান মেস করিয়া বাস করে, তাহারা যেমন শিষ্ট-শান্ত তেমনি অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন-ব্যাটাকে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের কুঁচকি ফুলে উঠেচে। সত্যি-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্য্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কুঁচকিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিট-খানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাকতে পাঠাননি কেন, শীঘ্র পাঠান।

তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়। আনলেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তা ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন প্রায় দু-টাকার ধাক্কা।

বলিলাম, তা হোক, ডাকতে পাঠান।

কে যাবে মশাই? তেওয়ারী বেটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে রাঁধবেই বা কে?

আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, ইনি আপনার কে?

বলিলাম, কেউ না। এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে?

বলিলাম, জানি না। বোধ হয় কেউ নেই।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার; কিন্তু সবচেয়ে দরকার একে প্লেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাকবেন না এ ঘরে—আর দেখুন, আমাকে ফিস্ দেবার দরকার নেই।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি!

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, 'পিলেগ' কথাটা ভারী বুঝে।

তখন আমাকে যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইস-ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম, আমি আর তিনি—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া। এইভাবে ধস্তা-ধস্তি করিয়া বেলা দুটা বাজিয়া গেল, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্ণের কাছাকাছি সে ক্ষণেকের জন্য সচেতনভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিন শ গিনি আছে—স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজলেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের 'মেস'টা। তাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশী রকম নড়া-চড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে-সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারটা বাজিতে চলিল, কিন্তু পাশের ঘর খোলার

সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে; কৌতূহল-বশে সেই ছিদ্র-পথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকে যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল! সুমুখের খাটের উপর দুইজন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথোলিকরা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়। সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ-ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘণ্টা-দুই ছটফট করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল!

কিন্তু তামাশাটা এই যে, যিনি জানা-শুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহারই মৃতদেহটা এবং গিনি-পোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকি রাত্রিটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, একথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক্, মনোহর ত ঠেলাগাড়ি চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ণ। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিংবা সত্যসত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলি-ব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু মনোহরের ন্যায় আইস-ব্যাগ লইয়া টানাটানি করাটা সঙ্গত নয়, শোভনও নয়, স্থির করিতে দেরি হইল না। কারণ, চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এতবড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধু লোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্ত্তব্য নহে—অশাস্ত্রীয়।

সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ সেই যে রেঙ্গুনের আর এক প্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাপিষ্ঠা পতিতা নারী আছে,—এতদিন যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয় সে মরুক। হয়ত তাহাতে কিছু পুণ্য-সঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ি আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

১২

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশী ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশী? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চললুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এতবড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরচে না অভয়া। এখনও গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েচে, এখনও জ্ঞান আছে—এখনও ভদ্রভাবে প্লেগ হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত করে বল, আচ্ছা যাও।

অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম তা হলে নূতন ক'রে ঘর-সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হ'ল।

কিন্তু খুব সম্ভব, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন-দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

অফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন অফিসের পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র; আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময় এই শর্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমে সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, আমি মরলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না, যাহা তোমার না জানিলেই

নয়, কিন্তু আমার ত তা নয়! আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পার নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্বেও মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয়, যে, তুমি ভাল আছো।

আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্কুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়, তোমার এ কথা আজ আমি অস্বীকার করি না। বঙ্কুর সে ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো এসো, আমার মাথার দিব্যি রহিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়াই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্দ্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সেদিন আমি এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধ একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটী নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই, তিনি শুদ্ধ মাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য। আজ আমার গুরুদেবের শ্রীমুখের কথাগুলি বার বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়িতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে, গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আমি আড়ালে দাড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মন্তর নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা নেবে না? বলিলাম, আমি মহাপাপিষ্ঠা। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, তা হলে ত আরও বেশী দরকার মা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্যি পরিচয় দিইনি, দিলে এ-বাড়ির যে চৌকাঠও আপনি মাড়াতে চাইতেন না। গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ি না হয় নাই মাড়ালুম, কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়িতে কেন আসবো না মা?

আমি চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হতে হবে! সে কথা

কি সত্য নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেননি মা। কিন্তু সে ভয় যার নাই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নেই কেন?

তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, একবাড়ির মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর একজনকে তা স্পর্শ করে না—কেন বলতে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয়ত করে, কিন্তু যে সবল সে কাটিয়ে উঠে, যে দুর্ব্বল সেই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটা রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটি কোনদিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে দেয়, সেই অপরাধই আর-একজন হয়ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত বিধিনিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধতে পারে না। সঙ্কোচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায়, যা অধর্ম্ম, তা কি সবল-দুর্ব্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায় অধর্ম্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা, বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা হলে সংসারে সবলে-দুর্ব্বলে কোন প্রভেদ থাকত না। সে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ত্রিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত অন্ততঃ এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলছে, আর যাদের শুধু ছাই জমা আছে তাদের কর্ম্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।

শ্রীকান্তদা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তাঁর ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইতেছি। তাঁর কর্ম্মের বিচার একটু সাবধানে করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত-সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে—এই নাও।

অভয়া দুই-তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপরে শতযোজন দূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজি অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখ-মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, শ্রীকান্তদাদা—

বাধা দিয়া বলিলাম, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে!

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা বন্ধ ক'রো না।

অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই সব মতলব আঁটা হচ্ছে?

কেন, আমি কি মানুষ নই?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে! রোহিণীবাবু বেচারা অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হ'য়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার ভারী ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি অসুখ ব'লে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম, আজ তা হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য্য নয় বটে।

অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তুমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে একবার যাও শ্রীকান্তদাদা। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে। কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার বড় প্রয়োজন। পরদিনই অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও এক মাসের ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাত্রার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্তদাদা, একটা কথা দাও।

কি কথা দিদি?

সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে মীমাংসা করে দিতে পারে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল?

স্বীকার করিয়া জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশে গাড়িতে গিয়া বসিলাম। অভয়া গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর একবার নমস্কার করিল; বলিল, রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েচি। কিন্তু জাহাজের ওপরে কটা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো, শ্রীকান্তদাদা, আর তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে।

আচ্ছা বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার দুটি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

১৩

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বঙ্কু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়িতে অপেক্ষা করচেন। আপনি নেবে যান, আমি জিনিস-পত্র নিয়ে পরে যাচ্চি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্ব্বাদে! আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ির কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ি করে পিছনে আসিস্—দুটো বাজে, এখনও ওঁর নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আমরা বাসায় চললুম। গাড়োয়ানকে যেতে বলে দে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন যে-আজ্ঞে বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয়নি ত?

না।

বড্ড অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ করেছিল বটে, বড্ড নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্চে না! বাড়ি থেকে কবে এলে?

পরশু; অভয়ার কাছ থেকে তোমার আসবার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আসতেই ত হ'তো—দু দিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল, এ হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে লুকাইতে পারিলাম না, সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্চে আমাকে, রোগা?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হাঁ রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিল—এমনি ক্লান্ত, এমনি পরিশ্রান্ত! নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু জায়গা অন্বেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ বললে না যে?

কহিলাম, নাই শুনলে।

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি। সত্যি?

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমনি অপ্রতিভ করে দাও যে—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখা-দেখি ত সম্পর্ক নয় যে সেজন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই। কারণ, একে ত লোকে ও-কথা বলে না, তা ছাড়া বললেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে মনে জানো যে—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি অন্তর্য্যামী কিনা, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েচো! আমি কখ্‌খনো ও কথা ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি করে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেমনি কি এখনো দেখতে আছি, না কি? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েচ।

রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসি মুখখানি আমার মুগ্ধ-দৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ও দেশের আবহাওয়া কি সহ্য হচ্চে না?

কহিলাম, না হলে ত উপায় নেই। যেমন করে হোক সহ্য করিয়ে নিতেই হবে।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম, রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ, যে দেশের জল-বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার আশায় নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ হইল না, সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সে সত্যি। তা ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙালী রয়েছেন। তাঁদের যখন সইচে, তখন তোমারই বা সইবে না কেন? কি বল?

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এই প্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আঘাত করিল। তাই শুধু একটা ইঙ্গিতে সায় দিয়াই নীরব হইয়া রহিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার প্লেগের কাহিনীটা কিভাবে রাজলক্ষ্মীর শ্রুতিগোচর করিব। সুদূর প্রবাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যখন দিন

কাটিতেছিল, তখনকার সহস্রপ্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের ভিতর কি ঝড় উঠিবে, দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কিরূপ অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে, কত রঙে ভরিয়া যে, দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখন সেইটাই আমাকে সবচেয়ে লজ্জায় বিঁধিল। মনে হইল, ছি ছি—ভাগ্যে কেহ কাহারো মনের খবর পায় না—নইলে—কিন্তু থাক্ গে সে কথা। মনে মনে বলিলাম, আর যাহাই করি সেই মরণ-বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে যাইব না।

বৌবাজারের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সিঁড়ি—তোমার ঘর তেতলায়। একটু শুয়ে পড় গে। আমি যাচ্চি। বলিয়া সে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ি হইতে আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্য্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই। একখানি দামী সূর্য্যাস্তের ছবি আমার ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্য্যন্ত সে কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেমনি করিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিখিবার সাজসরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখমলের চটিজুতাটি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি সযত্নে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরামচৌকি আমি সর্ব্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি সেইভাবে জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহারি উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাঁটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।

স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুর বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ন-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। কহিল, ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারী গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে দেব। বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আসব ?

হাঁ, নিয়ে আয়। আর বঙ্কু বাড়ি থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস্।

আমি আবার চোখ বুজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে বঙ্কু ? একবার এ-দিকে আয় দিকি।

তাহার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেমনি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটু ব'স! কি-কি আনতে হবে, একটা ফর্দ্দ করে দরোয়ান সঙ্গে করে একবার বাজারে যা বাবা। কিচ্ছুই নেই।

দেখিলাম এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্য্যন্ত করে নাই; কিন্তু তা না হয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বঙ্কুর সম্মুখে অবধি দর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল! আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বঙ্কুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় হইতে হইয়াছিল। তাহাব সহিত আজিকার আচরণের কতই না প্রভেদ।

জিনিসপত্রর ফর্দ্দ করিয়া বঙ্কু প্রস্থান করিল। রতনও চা ও তামাক দিয়া নীচে চলিয়া গেল। পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—আচ্ছা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশী ভালবাসে বলতে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশী ভালবাসে।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জানলে?

বলিলাম, যেমন করেই জানি, সত্যি কি না বল ত?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক, বেশী ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই সংসারে এতবড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে এ ত তাঁর কর্ত্তব্য ছিল না। অথচ সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। এবং সে হিসাবে যা-কিছুই ইহার কঠিন দুঃখ, যা-কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েছে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছু ভুলিনি। পুরুষমানুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। সখ ফুরালে, কিংবা হালে পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্যগণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে—

এই ত বলচ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। তার নিন্দিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে আসতে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্য্যাদা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্ব্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত কোন মেয়েমানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।

কথাটা এদিক হইতে কোনদিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাদা-সিধা চুপ-চাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই চক্ষের পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম, চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই। কেন না আমার বিশ্বাস, যা-কিছু পাপ, যা-কিছু অপরাধ সে তাঁর অন্তরের তেজে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ নির্ম্মল করে দিয়েচে। তা নইলে ত আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

হীন কেন?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ! স্বামী-পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে না-কি? সে পাপ ধ্বংস করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাকলে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আগুনের কথা থাক্। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, পুরুষমানুষ চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল, চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী; কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটতে পারে না। মেয়েমানুষকে সহ্য করতেই হয়। নইলে ত সংসার চলতে পারে না।

কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেয়েমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার! একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ তা হলে তুমি আগুন আগুন কি বক্‌ছিলে?

রাজলক্ষ্মী সহাস্য মুখে কহিল, কি বকছিলুম শুনবে? আজই ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভয়ার চিঠি পেয়েচি। আগুনটা কি জান? সেদিন প্লেগ ব'লে যখন সবে-পাতা সুখের ঘর-কন্নার দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে নির্ব্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল আমি তাকেই বলচি তাঁর আগুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাঁতে ছিল না। কর্ত্তব্য ব'লে বুঝলে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে, দ্বিধায় পিছুতে দেয় না,—আমি তাকেই এতক্ষণ আগুন আগুন ব'লে বকে মরছিলুম। আগুনের আর এক নাম সর্ব্বভুক জানো না? সে সুখ-দুঃখ দুই-ই টেনে নেয়—তার বাচ-বিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেচেন জানো? তিনি রোহিণীবাবুকে সার্থক করে তুলতে চান। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়াই শুধু সংসারের অপরের জীবনের সার্থকতা পৌছাতে পারে। আর ব্যর্থ হতে শুধু একটা জীবন একাকীই ব্যর্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানা দিক দিয়ে নিষ্ফল করে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না? বলিযা হঠাৎ সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তারপরে দুজনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার মাথার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া রুক্ষ চুলগুলা নিরর্থক চিরিয়া চিরিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, তিনি খুব শিক্ষিতা, না? নইলে এত তেজ হয় না।

বলিলাম, হ্যাঁ, যথার্থই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েচেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বারবার চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম, এ লোভ তাঁর আছে না কি? কৈ আমি ত শুনিনি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ, এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! তুমি ত বেশ!

কহিলাম, তাহলে তোমারও আছে নাকি?

যাও—বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি পশ্চিমের খোলা-জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল দুটিতে নানাবর্ণের দ্যুতি ঝিক্‌মিক্ করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আত্মসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কেন, আমার কি ছেলে-মেয়ে নেই যে লাভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েচি, ছেলের বিয়ে দিতে

এসেচি—একটি দুটি নাত্তি-নাত্তিনী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, বন্ধুর বিয়ে ত এখনো দশ-বারদিন দেরি আছে; চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।

কহিলাম, তাও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি? রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। না হয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন তখন ব্যাণ্ডের কর্নেট এবং ব্যাগপাইপের বাঁশি বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের স্টেশন-যাত্রার পথেও এমনি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে, তাহলে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না; তা হলে সৃষ্টি থাকে কি করে?

তাহার অসামান্য গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ, আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে বেশী নেই। অন্ততঃ আমাদের এ-দেশে ত নেই বললেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকাই ত ভাল! বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্নার সাধ-আহ্লাদ নেই।

কহিলাম, সাধ-আহ্লাদ থাকলেই যে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে, তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই আমাকে বুঝিয়ে দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র নির্ব্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্র-গৃহস্থদের সম্বন্ধেই, তার কারণও তুমি জানো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে কহিল, তোমার ও মস্ত ভুল।

আমারও কেমন জিদ চাপিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুল হলেও

তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বঙ্কুর বাপ যখন তোমাদের দু'বোনকেই এক সঙ্গে মাত্র বাহাত্তরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সেদিন এখনো এত পুরানো হয়নি যে তোমার মনে নেই। তবে নাকি সে লোকটার নেহাৎ পেশা বলেই রক্ষে; নইলে ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি-একটি ছেলেপুলে হতো —একবার ভেবে দেখ দেখি অবস্থাটা?

রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, ভগবান যাদের পাঠাতেন তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই, যা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এই জন্য?—এই সব ছেলে মানুষ করতে?

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না হয় তিনি নাই দেখতেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হ'তো।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ সরকারী এবং বেসরকারী অফিস কোয়ার্টার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ অফিসে কেরানী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেন ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু খাদ্যসামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ী, কাহারও রুমালে বাঁধা একটু পাঁঠার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু তরি-তরকারি এবং ফলমূল। সাতদিনের পর গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলেমেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্যমত অল্প-স্বল্প মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেন ধরিবার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, কেন এঁরা সব এমনভাবে ইস্টিশনের দিকে ছুটচেন? আজ কি?

আমি ফিরিয়া চাহিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এঁরা সব অফিসের কেরানী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন। পাড়াগাঁয়ে ত এসব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, না?

আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, আঃ—ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি স্ফূর্ত্তি—কেউ চেঁচামেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্নাঘরে দৌড়বে বাড়িতে বাড়িতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ির জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ গা, এঁদের মাইনে কত?

বলিলাম, কেরানীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ-ত্রিশ-কুড়ি—এমনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়িতে ত এঁদের মা আছেন, ভাই-বোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম্ম, লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলিকাতার বাসা খরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগেব খরচ—বাঙালী কেরানী-জীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

রাজলক্ষ্মীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি জান না। এঁদের বাড়িতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।

তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনাবোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এঁদের ঘরকন্নার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি এদের চোদ্দআনা লোকের কিছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, না হয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এদের ছেলেমেয়েদের কথা শুনবে?

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না-না, শুনব না, শুনব না—আমি চাইনে শুনতে।

সে যে প্রাণপণে অশ্রু সংবরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবা-মাত্রই টের পাইলাম, তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া শেষে নিজের কৌতূহলের কাছে পরাজয় মানিয়া, আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলেপুলের কথা। কিন্তু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মিছিমিছি বাড়িয়ে ব'লো না। দোহাই তোমার!

তাহার মিনতি করার ভঙ্গি দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলাম না; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম, বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা,

তুমি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও শোনাতাম না, যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষা ক'রে ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে। অস্বীকার করলে নাস্তিক ব'লে হয়ত আবার আমাকে গাল-মন্দ করবে, কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব বাপ-মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই ক'রো—আমি যা জানি তাই শুধু বলব। কেমন?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তার মায়ের উপরই থাকে ব'লে আমার মনে হয়। ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই ভারটা নেবার উপায় আছে কি না—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ চালাকি ক'রো না—সে আমি জানি।

জানো? যাক, তা হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা না হয় মেনেই নাও!

রাজলক্ষ্মী ম্লানমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে এক ফোঁটা দুধ পাবার জো নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ! বলিলাম, যাক, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানা পুকুরের জল, আর বিদেশী কৌটা-ভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয়ত এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্যও জোটে, কিন্তু, সে সৌভাগ্য এ-সব ঘরে বেশীদিন থাকার আইন নেই। মাস-চারেকের মধ্যেই আর একটি নূতন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, হাঁ, হাঁ, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না! তুমি তারপরে বল।

কহিলাম, তারপর ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়ার জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বললুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্ত্তি হবার মুলতুবির ফুরসতে—ঐগুলো খাঁটি দেশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সূতিকাগৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে করে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন-কতক চ্যাঁচানো।

রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাঁচানো কেন ?

বলিলাম, ওটি মায়ের স্বভাব বোলে। এমন কি কেরানীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন !

বাছা রে !

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুইটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি ? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও না হয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিকটা অগোচরেই থাকিত। বাঙলার ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশী ক্ষতি হইত। ঠিক এমনি সময় রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক কেরানী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের ভাল ! তুমি ত পাষাণ। তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখকষ্ট এমন আহ্লাদ করে বর্ণনা করচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে। বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ি পৌঁছতে এঁদের আগ্রহটাও ভেবে দেখবার বিষয়।

রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্ত্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল, আমিও ত তাই বলচি ! আজ বাবা আসচে বলে ছেলে-পুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট ? ওঁদের মাইনে হয়ত কম, তেমনি বাবুয়ানিও নেই। কিন্তু, তাই বলে কি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, এত কম ? কখ্খনো নয়। অন্ততঃ—একশ-দেড়শ টাকা, আমি নিশ্চয় বলচি।

বললাম, হতেও পারে। আমি হয়ত ঠিক জানিনে।

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরানীর জন্যও

মাসে দেড়শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপ্‌রিও কত পান?

কহিলাম, উপরিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, তোমাকে যতই দেখচি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্ছে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো ব'লেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বেঁধো।

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাত দুটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ি আসিয়া স্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ থাকা সত্বেও বঙ্কু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম; যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতর গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেন পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়-গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরি-তরকারির পুঁটুলি এবং অন্য হাতে দাঁড়শুদ্ধ একটি মাটির পাখি লইয়া শুধু প্লাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুঙ্কার ছাড়িয়া একলম্ফে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং বঙ্কু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কানা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শশব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার বার বলিতে লাগিল, দেখতে পাইনি। মা, আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম; যা হবার হয়েচে, আপনি শীঘ্র যান, আপনার ট্রেন ছেড়ে দিল বলে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুক্‌রা কয়টা কুড়াইবার জন্য বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া আসিয়া সে আর একদফা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙা অংশগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ—গেল সোমবার বাড়ি থেকে আসবার সময় বলে দিলে, আমার জন্যে একটি পাখি-পুতুল কিনে এনো না! কিনতে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কিনা—দু আনা—তার একটি পয়সা

কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি করে আট-আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম, কিন্তু এমনি অদেষ্ট দেখুন না যে, দোড়গোড়ায় এসে ভেঙে গেল! রোগা মেয়েটার হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেঁদে বলবে, বাবা আনলে না। যা হোক টুকরো-গুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বলব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সযত্নে তাহার খুঁটে বাঁধিয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড্ড লেগেচে—আমি দেখতে পাইনি। লোকসানকে লোকসানও হ'লো, গাড়িটাও পেলুম না—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধঘণ্টা আগে গিয়ে দেখতে পেতুম। বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্লাটফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বঙ্কু পাঁড়েজীকে লইয়া কি-একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেচে না কি? কোথায় লাগল।

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপিচুপি কহিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেচে—কিন্তু সে এমন জাগায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও জো নেই, বোঝবারও জো নেই।

১৪

শ্রীমান বঙ্কুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল এই খবরটা তখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল, সেকেণ্ড ক্লাশ ফাস্ট ক্লাশে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত তাও ত আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ি ছিল? কেন রেল কোম্পানীকে মিছে এতগুলো টাকা বেশী দেওয়া।

বঙ্কুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠায় বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম; কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফরমে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন?

লোকটি কহিলেন, বৰ্দ্ধমান।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপিচুপি বলিল, তা হলে ত উনি

অনায়াসে আমাদের গাড়িতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকাটা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম, ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ করিয়া বলিল, না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথাবার্ত্তায় এতটা পথ যেতে পারব।

বুঝিলাম, এতক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বন্ধু এবং নিজের চাকর-বাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়িতে উঠার দৃষ্টি-কটুত্বতা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিলাম, কাজ কি একটা বাজে লোককে গাড়িতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাকে জব্দ করবার এতবড় একটা সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো! এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন স্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁহাকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়িতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহুল্য তাঁহাকে রাজী করাইতে ক্লেশ পাইতে হইল না, অনুরোধমাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেন গোটা-দুই স্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা স্টেশন উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি, আশপাশের গ্রামগুলোর খবর পর্য্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাঁদের জন্য সে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্দ্ধমানের কাছাকাছি আসিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া সে তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ি বাহির করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক হইলেন। পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না, না, মা, সরলাকে আমি আসচে বারে পুতুল কিনে দেব, আপনি কাপড় রেখে দিন। তা ছাড়া এ যে বড্ড দামী কাপড় মা?

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রখানি তাহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশী দাম নয়। আর দাম যাই হোক, এখানি তার হাতে দিয়ে বলবেন, তার মাসী তাকে ভাল হ'য়ে পরতে দিয়েচে।

ভদ্রলোকের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। আধঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন, সে ভাল হ'য়ে উঠুক, কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তার মাসী যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত। বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একট মাসী-পিসী থাকলে বেঁচে যেতুম মশাই। এইবাব কিন্তু আপনার মেয়েটি চট্‌পট্‌ সেরে উঠবে দেখবেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা তখন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুজনের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখ-দুঃখের কথা—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং যে প্রশ্ন নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা দশ-বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নূতন নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয়ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্য্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিসটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়—সে আমিও জানি, এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যেদিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া!

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দ্দাম আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্ব্বস্ব দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নাই; আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা-বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মারিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাৎ সন্দেহ হয় তাহারা আছে, কি নাই। তাহাই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলে-খেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্য্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখ-দুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।

বর্দ্ধমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কান্নাটা কার কল্যাণে হ'লো? সরলা, না তার মায়ের?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?

বলিলাম, কাজে কাজেই। মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার জো নেই। সে যাক, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল শুনতে পাইনে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে, সে শুনে তোমার লাভ নেই।

কহিলাম, লাভের আশা করিনে—শুনে লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিংবা তাহার মায়ের জন্য যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, তার বাপের জন্যে ঝরাটা আমি পছন্দ করিনে।

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম, এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না, ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু সে ত হইলই না, বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ এইদিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর-এক দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কিন্তু বহুক্ষণ মৌন ছিলাম, কথা কহিবার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল ; তাই বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম। বলিলাম, বর্দ্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তরই দিল না, তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দুঃখে যে কানই দাও না। এ বিলেত-ফেরতের বিদ্যা শিখলে কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, বিলেত-ফেরতের উপর যে তোমার ভারী ভক্তি দেখি !

বলিলাম. হাঁ, তাঁরা ভক্তির পাত্র যে !

কেন, তারা তোমাদের করলে কি ?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু পাছে কিছু করে এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ তোমাদের অন্যায়। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে—সব দিক থেকেই বার করে দিয়েচ। তবু যদি তারা তোমাদের জন্য এতটুকুও করে, তাতেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কহিলাম, আমরা ঢের বেশী কৃতজ্ঞ হতুম যদি তারা সেই রাগে পুরাপুরি মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম সমাজকে নষ্ট করছে, যারা হিন্দু বলে মনে করে, তারা হিন্দু সমাজকে ত্যক্ত করে মারছে। ওরা নিজেরা কি, যদি তাই আগে ঠিক করে নিয়ে পরের জন্যে কাঁদতে বসতো, তাতে হয়ত ওদের নিজেদেরও মঙ্গল হ'তো, যাদের জন্য কাঁদে তাদেরও হয়ত একটু উপকার হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু আমার ত তা মনে হয় না !

বলিলাম, না হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে, সে অন্য কথা। কই—তার ত কোন জবাব দাও না !

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো, সে জন্যে আটকাবে না। আগে তোমার ক্ষিদে পাক, তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা করে যে-কোনও স্টেশন থেকে যা মেলে খাবার কিনে গিলতে দেবে—এই ত ? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখচি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয় ?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার উপর থাকবে না ?

তা বটে ! বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নিরবে বসিয়া রহিল।

পরের স্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের জায়গাটা চাহিয়া লইল এবং

তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া, থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল। দেখিলাম, এ বিষয়ে একবিন্দু ভুলচুক কোথাও নাই ; আমি যাহা কিছু ভালবাসি সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটি ভোজন সমাধা করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলা সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস্ খেগে যা—আর তোদের গাড়িতে অন্য কেউ যদি খায় দিস্।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কই, তুমি খেলে না ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, আমার ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেচে। কত বলচি, মা ইস্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই যাবি, না দাঁড়িয়ে তর্ক করবি ?

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল ; ট্রেন ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথায় চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

বাধা দিয়া কহিলাম, পরে দেখব অখন। কিন্তু—

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার 'কিন্তু' গেয়ে লেকচার দিতে হবে না, আমি বুঝেচি। আমি মুসলমানকে ঘৃণাও করিনে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করিনে। করলে নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুম না।

কিন্তু নিজে খেলে না কেন ?

মেয়েমানুষের খেতে নেই।

কেন ?

কেন আবার কি ? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।

কিন্তু পুরুষমানুষের নিষেধ নেই ?

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, না। পুরুষমানুষের জন্যে আবার এত বাঁধা-বাঁধি আইন-কানুন কিসের জন্যে ? তারা যা ইচ্ছে খাক, যা ইচ্ছে করুক, যেমন করে হোক সুখে থাক্, আমরা আচার পালন ক'রে গেলেই হ'লো। আমরা

শত কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি! এই যে সন্ধ্যা হতে না হতেই ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখছিলে?

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু কষ্ট সইতে না পারাটা আমাদেরও গৌরবের কথা নয়।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল না, এতে আমাদের এতটুকু অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয় যে, কষ্ট সহ্য করতে যাবে। লজ্জার কথা আমাদেরই যদি না পারি।

কহিলাম, এ ন্যায়শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে? কাশীর গুরুদেব?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার যা-কিছু শিক্ষা সে তোমারই কাছে। তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।

বলিলাম, তাহলে গুরুর কাছে ঠিক উল্টোটাই শিখে রেখেচ। আমি কোনদিন বলিনে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই চিরদিন মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে আমাদের চেয়ে এক তিল ছোট নও।

রাজলক্ষ্মীর চোখ দুটি সহসা ছলছল করিয়া উঠিল। বলিল, সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখতে পেরেচি। তোমার মত সবাই যদি এমনি করে ভাবতে পারত, তাহলে পৃথিবী সুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুনতে পেতে। কে বড় কে ছোট, এ সমস্যাই কখনো উঠত না।

অর্থাৎ এ সত্য নির্ব্বিচারে সবাই মেনে নিত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

আমি তখন হাসিয়া কহিলাম, ভাগ্যে পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা। কিন্তু আপনাদের এত হীন মনে করতে লজ্জা করে না?

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ। অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।

আমি কহিলাম, তা বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এমনি বদ্ধমূল যে, এর হীনতাটাও আর আমাদের চোখে পড়ে না। বোধ করি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়ের চেয়ে তোমরাই আজ সত্যিসত্যি ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে ক'রে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে ক'রে ছোট করে দিয়েচ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।

কথাটা অকস্মাৎ যেন নূতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি যেটুকু ছিল,

তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে তামাশা করেছিলে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে ত জানো না?

জানি না, তাহা স্বীকার করিতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস জানবার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাপ্সা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশী, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি করে, তাকে মেনে চলেই বা কি করে।

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমিই বা এত বুঝবে কি করে? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখ-দুঃখ ভোগ করোনি তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভাবতে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে, সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেমনি ভুল হয়েচে।

বলিলাম, তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের আইনে হচ্ছে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি কি করে জানলে দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশী জ্ঞান নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি করে থাকবে? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে নাকি? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জানবে কোথা থেকে! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশী নিন্দে করে বেড়ায় যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল ক'রে পরের সমাজ, না জানো ভালো ক'রে নিজেদের সমাজ।

বলিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে ব'লে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাকে তামাশা করচ, তা জানি। কিন্তু

তামাশা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ির গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়! অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরদের চেয়েও বেশী খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও, কিন্তু অন্য দেশের রাণী ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রো না, আমি এই কথাটাই তোমাকে বলচি।

বলিলাম, তর্কশাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে ডোবাবার জো করে তুলেচ বটে, কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্চিনে, তা মানচি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিচ্ছু নেই।

বলিলাম, থাকলেও সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্চে। কিন্তু তোমার কথাটা একরকম বুঝতে পেরেচি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে জন্যেই হোক ছোট-বড় উঁচু-নীচু সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না—চায় না। এতে যে কত অনিষ্ট হয়েচে, সে আমিই টের পেয়েচি।

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন করে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ত আমাদের এই দশা। কিন্তু আগেকার কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ ইতিহাসটা ঠিক জানিনে।

সে কহিতে লাগিল, কখ্খনো ছিল না। সেখানে কখ্খনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্মভয় ছিল। আজও ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি সত্যিই এত কষ্ট?

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, আমার কথা আমার অন্তর্য্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ির গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট স্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে শুরু করিলে বলিলাম, কি করলে তোমার বাকী জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেচি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিচ্ছু না থাকে—একেবারে নিরাশ্রয়, তা হলেই—

আবার দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে, সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েচে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেদিন অভয়ার কথা শুনেচি, সেইদিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু তাদের জীবন-যাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ ত তুমি জানো না।

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে সত্যি; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক, আমার মত দুঃখ যে তারা কোন দিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি ক'রে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বলচি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগেব কথা মুখে আনচো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি!

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জ্জন দিতে পারি।

বাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমাব জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জ্জন দিতে হবে না। কিন্তু তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেবই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধূলোব মত ফেলে দিয়েচে, সে-কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল. থাক্‌, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা ভুল। তুমি ঘুমোও—এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও কয়ো না। বলিয়া সে উঠিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌছিলাম এবং পিয়ারীর বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রী-লোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এরা সব আমার ভাড়াটে।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, হাসলে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায় আমাকেই খাওয়া-পরা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়; বেঁচে থাকলে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পারো না?

আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি বই কি। এমনিধারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্ন-বস্ত্র যোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি!

তা ছাড়া দু-একজন আমার কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু জানলে কি ক'রে?

পিয়ারী একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন অসময়ে যাঁরা আমাদের সদ্গতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ত প্রাণ থাকতে ভোলা যায় না কিনা!

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এদের। তাই কাছে এনে একটু কড়ানজরে রেখেচি, যাতে লোকের আর বেশী উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখতে ইচ্ছা করে রাজলক্ষ্মী।

মলে দেখো! আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরি হলে তোমাকে তুলব অখন। বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আজ যে বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ের এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম! গুরুদেব তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম, আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসতে চাই।

পিয়ারী বলিল, বঙ্কুর বিয়ের ত এখনো দেরি আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি।

একটু মুস্কিলে পড়িলাম! আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়ো সেখানে কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়া উঠিব। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমেষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয়ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক দুর্নাম জিনিসটা এমন যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামের ভয় না ক'রে পারে না!

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন-রাত কাটল। ভাগ্যি সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলেনি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনাশুনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না।

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা, মানুষ হিসাবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবার একটা সীমা আছে—সেটা ডিঙিয়ে যেয়ো না।

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, কলঙ্কই বটে। কিন্তু আমি হলে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোটমানুষ রাজলক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তস্বরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিইনি। সে জন্য তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না! কিন্তু ছোটমানুষ ব'লে যে তোমাকে ভাবতে পারিনি। তা হলে ত বাঁচতুম, গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্ত্তা বন্ধ নাকি?

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল না, কিছু বলবে?

বলিলাম, চল প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত, যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি?

চাও না?

না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না।—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুরবেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে কি তুমি থাকতে পারো যে, অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করচ।

রাজলক্ষ্মী শান্ত-গম্ভীর মুখে বলিল, সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।

তবে ইচ্ছেটা কি ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও একরকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও একরকম করে তা বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি। কিন্তু—

তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু কিছুই না। কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরচি—, বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাবচে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে করচে! ছিঃ, ছিঃ এ যেন একটা হাসির ব্যাপার করে তুলেচি।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বুড়ো বয়সে এ-সব কি আমায় সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও। তবে পারো যদি, বর্ম্মা যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যেয়ো। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধারও অন্তর্ধান হইল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এ সব মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্যসত্যই কি একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকালবেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জলখাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই পিয়ারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ি নাই, সাজসজ্জা করিয়া, জুড়িগাড়ি চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। জুড়িগাড়িই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না—তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সংবাদে বিস্বাদ হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, ঘরে আলো জ্বলিল, রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে

ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা ভয় করিতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কি না ভাবিতেছি, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ির সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়িতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ি ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

১৫

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণী? তুই গোবিন্দলালকে চিনিস না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার!

রাজলক্ষ্মী শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তা হলে কি করতে?—খুন?

হাসিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অত বড় নবাবী শখ নেই। তা ছাড়া এই বিংশ-শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর নরাধম কে আছে যে, সংসারে এই এত বড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেবে? বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণী! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তোমার রূপ ত্রিলোকবিজয়ী হোক, তোমার কণ্ঠ বীণানিন্দিত এবং ঐ দুটি চরণকমলের নৃত্য উর্ব্বশী তিলোত্তমার গর্ব্ব খর্ব্ব করুক—আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করিয়া ধন্য হই!

পিয়ারী কহিল, এ সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থম্। সে যাক্, আমি এই একটার ট্রেনে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙালীর পরম তীর্থ চাকরিস্থান—অর্থাৎ বর্ম্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে কর না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চলে যাচ্চো?

বলিলাম, পাপ-মুখে এখনও বলতে পারিনে। এ গোলকধাঁধা যদি পার হতে পারি তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার করতে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছে? একেবারেই না। বরঞ্চ জ্ঞানে অজ্ঞানে অত্যাচার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চলে যাবে।

হাঁ।

আমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই। আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, শুনবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নয় যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে! যাবে যাও—বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সদর-দরজায় একখানা গাড়ি থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া ক'রো— আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

তা না হয় হলো, কিন্তু ফিরে বঙ্কুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কেউ কখনো বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল যদি অন্যায়ই একটা করে থাকি, তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে করবে?

বলিলাম, পিয়ারী, এগুলো যে দাসী-বাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ত মানাচ্ছে না!

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর পিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরক্তমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চৈস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনে, তা জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজ হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিও না। আজ এমন করে তুমি চলে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা আজ তোমার-আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক্। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ করলুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেচি, দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া আর চলবে না।

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কেন?

কহিলাম, অপ্রিয় সত্য সহ্য করতে পারবে?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের ওপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ এরকম কাজ আমি মাঝে মাঝে করবই?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙ্গে পড়বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, দেখিলাম, তাহার দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি ?

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল ; কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত ও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নয়, ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো করতে পারো না, অপরকে করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হয়ে যাবো, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না ? সে তুমি কেমন করে বাধা দেবে বল ত ?

রাজলক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না !

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হতে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা করবার বস্তু নয় লক্ষ্মী !

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত।

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্ব্বদাই দেখা যায় না ! যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী ! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়।

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ করে চলে যাবে ?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন বর্ম্মা যাবার পূর্ব্বে আমি আর একবার দেখা করে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম্ম, একথা আমি কখনো মানবো না। বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয় ত একটার ট্রেন ধরিতে পারি। নিঃশব্দে ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলাম !

বকৃশিশের লোভে গাড়ি প্রাণপণে ছুটিয়া স্টেশনে পৌছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পশ্চিমের ট্রেন প্লাটফরম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। খবর লইয়া জানিলাম

আধঘণ্টা পরেই একটা ট্রেন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

সুতরাং পশ্চিমের পরিবর্তে পূবের টিকিট কিনিয়াই আধঘণ্টা পরে এক বিপরীত-গামী বাষ্পীয় শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্ণ বেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়িটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘর-দুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমনে ও বাস করিবার সংকল্প শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ ত সুখের কথা, আহ্লাদের কথা! এইবার একটি বিয়ে-থা করে সংসারী হ শ্রীকান্ত। আমরা দেখে চক্ষু জুড়োই।

বলিলাম, সেই জন্যেই ত এসেচি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই।

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামী-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, আমি বাহিরের ঘরেই না হয় থাকব—ঘরে ঢুকিয়া দেখি এককোণে চুন এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহার মালিক বলিলেন, তাই ত। এগুলো দেখেশুনে কোথাও এখন সরাতে হবে দেখচি। এ ঘরটা ত ছোট নয়—ততক্ষণ না হয় এই ধারে একটা তক্তাপোশ পেতে—কি বলিস্ শ্রীকান্ত!

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত না হয় তাই হোক।

বস্তুতঃ এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্ম্মায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে ভিতরে একটি গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম না।

রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, ওটা গরম। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।

তথাস্তু। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙিল—বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছু না, ওটা ম্যালোয়ারী। ওতে ভাত খাওয়া চলে।

কিন্তু আজ আর সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না, রাঙাদি, আমি এখনো

তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয়ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দ ডাক্তার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ি টিপিয়া, জিব দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র 'কেনা দাম'টুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল—আমার ঠাকুরদাদা আসিয়া বলিলেন, তাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক—তোমার পিসীমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন।

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। এমনি ভাবে আরও চার-পাঁচদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দ ডাক্তার আসিয়া যথারীতি ঔষধ দিয়া তিন দিনের বাকী কেনা দামটুকু প্রার্থনা করিলেন। শয্যা হইতে কোনমতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম—মনিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দ ডাক্তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, আজ্ঞে না, যায়নি কিছুই।

কিন্তু তাঁহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাবিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক, তুমি আমার পর নও, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়া পরমাত্মীয়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, একথা কেউ যেন না শোনে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে বোঝা যাবে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়া প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাশা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চায়, একথা পাড়া-

গাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না; সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম না। প্রথম হইতে স্থির করিয়াছিলাম এ-কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলেই যাহা হয় করিব—সম্ভবতঃ অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যন্ত্রের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়া হোক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এমনি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সেদিন কোনদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে একবারে মরিয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান-দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাক-পিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানলা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই, মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে দূরে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল। দেখি, কোচমানের পাশে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। গাড়োয়ান কহিল, মা, দেরি হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?

একটু দাঁড়াও, বলিয়া সে অবিচলিত ধীর পদক্ষেপেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাত দিয়া আমার কপালের, বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জ্বর নাই। ও-বেলায় সাতটার গাড়িতে যাওয়া চলবে কি? ঘোড়া খুলে দিতে বলব?

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, এই দুদিন জ্বরটা বন্ধ হয়েচে। কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না হয় আজ থাক্। রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই; হিম লাগতে পারে, কাল সকালেই যাবে।

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, এ গ্রামে এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন সাহসে? তুমি কি মনে কর তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, বেশ যা হোক। এইখানেই মানুষ হলাম, আর এখানে আমাকে চিনতে পারবে না? যে দেখবে সেই ত চিনবে।

তবে?

কি করব বল? আমার কপাল, নইলে তুমি এখানে এসে অসুখে পড়বে কেন?

এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই ত হ'তো।

তা কি কখনও হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই স্থির থাকতে পারি?

বলিলাম, তুমি না হয় স্থির হলে, কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির করে তুললে। এখনি সবাই এসে পড়বে, তখন তুমিই বা মুখ দেখাবে কি করে, আর আমিই বা জবাব দেব কি!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেমনি উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল; লজ্জা-সরম আমার যা কিছু, এখন সব তুমি।

ইহার পরে আবার বলিবই বা কি! শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কুর বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হঁা।

এখন কোথা থেকে আসচো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে! সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েচি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়?—পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হলে—তারপর—

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেইখানে রেজেস্ট্রী করতে হবে। লেখাপড়া সব

একরকম ক'রে রেখেই এসেচি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দানপত্র? কাকে কি দিলে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি দুটো ত বঙ্কুকেই দিয়েচি। শুধু কাশীর বাড়িটা গুরুদেবকে দেব ভেবেচি। আর কোম্পানীর কাগজ, গয়না-টয়নাগুলো ত আমার বুদ্ধি-বিবেচনামত একরকম ভাগ করে এসেচি, এখন শুধু তুমি বললেই—

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, তা হলে তোমার নিজের রইল কি? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হ'লো, যদি সে শেষে তোমাকেই খেতে না দেয়?

আমি কি তাই চাইচি নাকি? নিজের সমস্ত দান ক'রে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো? তুমি ত বেশ!

অধৈর্য্য আর সংবরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলাম, হরিশচন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে? খাবে কি? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হতে যাবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমাকে এ বুদ্ধি যে দিয়েচে, সেই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাববে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম ক'রো না—স্থির হয়ে শোও।

স্থির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখেই খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যকর-রঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি অপরূপ শোভায় সৌন্দর্য্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা-দ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নেই।

এই নির্ব্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল বোধ করি কেহই হিসাব করি নাই, সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম। এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুরদাদাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরদা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন খবরটা তাঁহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ি করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায় আসে নাই। সেই জন্যই বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত বাড়ির মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুরদা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত

মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্ছে এঁকে কোথায় দেখেচি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমেষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্ব্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যেই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটি চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্যে দুজনের চোখাচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

পল্লী-সমাজ

পল্লী-সমাজ

১

বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ় রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিল, এই যে মাসী, রমা কই গা ?

মাসী আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা হ'লে রমা কি করবে স্থির করলে।

জলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিসের বড়দা ?

বেণী কহিল, তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন! রমেশ ত কাল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই করবে বলে বোধ হচ্ছে—যাবে না কি ?

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ি ?

বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, সে ত জানি দিদি। আর যেই হোক, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবিনে। তবে শুনচি না কি ছোঁড়া সমস্ত বাড়ি-বাড়ি নিজে গিয়ে ব'লবে—বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে তা হলে কি বলবে ?

রমা সরোষে জবাব দিল, আমি কিছুই বলব না—বাইরে দরোয়ান তার উত্তর দেবে।

পূজানিরতা মাসীর কর্ণরন্ধ্রে এই অত্যন্ত রুচিকর দলাদলির আলোচনা পৌঁছিবামাত্রই তিনি আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনঝির কথা শেষ না হইতেই অত্যুত্তপ্ত খৈএর মত ছিটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, দরোয়ান কেন ? আমি বলতে জানিনে ? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বলব যে, বাছাধন জন্মে

কখনো আর মুখুয্যে-বাড়িতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমন্তন্ন করতে আমার বাড়িতে? আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব! তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল! তখনও ত আর আমার যতীন জন্মায়নি—ভেবেছিল, যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তাহ'লে মুঠোর মধ্যে আসবে—বুঝলে না বাবা বেণী! তা যখন হ'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি-সব জপ-তপ, তুক-তাক করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোটজাত হয়ে চায় কি না যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে! তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্য্যন্ত পেলে না। ছোটজাতের মুখে আগুন! বলিয়া মাসী যেন কুস্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ ছোটজাতের উল্লেখে বেণীর মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া। রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসীকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, কেন মাসী তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতে-গড়া জিনিস নয়? যে যেখানে জন্মেছে সেই তার ভাল।

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, না রমা, মাসী ঠিক কথাই বলচেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোটখুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদবি। আর তুক-তাকের কথা যদি বল ত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোটখুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচায্যির অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েচে আজকাল রমেশের মুরুব্বি।

মাসী কহিলেন, সে ত জানা কথা বেণী! ছোঁড়া দশ-বারো বছর ত দেশে আসেনি—এতদিন ছিল কোথায়?

কি করে জানব মাসী। ছোটখুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব, আমাদেরও তাই। শুনচি এত দিন নাকি বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাশ করে এসেচে, কেউ বলচে উকিল হয়ে এসেচে, কেউ বলচে সমস্তই ফাঁকি—ছোঁড়া না কি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ি এসে পৌঁছিল, তখন দুচোখ নাকি জবা-ফুলের মত রাঙা ছিল।

বটে? তা হলে তাকে ত বাড়ি ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়!

বেণী উৎসাহভরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল, পড়ে বৈ কি! সে ত আমার চেয়ে বেশী বড় নয়। তা ছাড়া

শীতলাতলার পাঠশালে দুজনেই পড়তাম যে। কিন্তু তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাসতেন।

মাসী আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার ভালবাসার মুখে আগুন। সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে। তাদের মতলব ছিল, তোকে কোনমতে হাত করা।

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মাসী! ছোটখুড়ীমার যে,—

কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসীকে বলিয়া উঠিল, সে সব পুরনো কথার দরকার নেই মাসী।

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাক্, তাহার জননীর সম্বন্ধে রমার কোথায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, তা বটে, তা বটে,। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠলে চোখের জল ফেলেন।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এ সকল প্রসঙ্গ চাপ দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তবে এই ত স্থির হ'ল দিদি, নড় চড় হবে না ত?

রমা হাসিল। কহিল, বড়দা, বাবা বলতেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিসনে মা! তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে ত! তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার জো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে বিষয় ভাগ করে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করার ভার শুধু আমারই উপর যে! আমার ত নয়-ই, আমাদের সংস্রবে যারা আছে, তাদের পর্য্যন্ত যেতে দেব না। একটু ভাবিয়া কহিল, আচ্ছা বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ি যায়?

বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, সে চেষ্টাই ত করচি বোন। তুই আমার সহায় থাকিস্, আর আমি কোনও চিন্তা করি নে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচায্যি। আর তারিণী ঘোষাল নেই, দেখি এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষা করে!

রমা কহিল, রক্ষে করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি বলে রাখলুম, শত্রুতা করতে এও কম করবে না।

বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উবু হইয়া বসিল। তার পর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিল, রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা, পেকে গেলে আর হবে না তা নিশ্চয় বলে দিচ্চি। বিষয়-সম্পত্তি কি করে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেখেনি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্ম্মূল করতে পারা যায় ত ভবিষ্যতে আর যাবে না, এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালের ছেলে—আর কেউ নয়।

সে আমি বুঝি বড়দা।

তুই না বুঝিস্ কি দিদি! ভগবান তোকে ছেলে গড়তে গড়তে মেয়ে গড়েছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। আচ্ছা, কাল একবার আসব। আজ বেলা হ'ল যাই, বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িল। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান আসিল—রাণী কই রে?

রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলায় তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীর প্রতি চাহিয়া দেখিল তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই রুক্ষ-মাথা, খালি-পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বেণীর প্রতি চোখ পড়িবামাত্র বলিয়া উঠিল, এই যে বড়দা এখানে? বেশ চলুন, আপনি না হ'লে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কৈ রাণী কোথায়? বলিয়াই কপাটের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পালাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্ত্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে! আরে ইস্, কত বড় হয়েছিস্ রে? ভাল আছিস্?

রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না, কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, চিনতে পাচ্ছিস রে? আমি তোদের রমেশদা।

এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি ভাল আছেন?

হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু আমাকে আপনি কেন রমা? বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, রমার সেই কথাটা আমি কোন দিন

তুলতে পারিনি বড়দা! যখন মা মারা গেলেন; ও তখন ত ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, রমেশদা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব।—তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত?

কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে একটিবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিতে লাগিল, আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকী, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি তাই হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করতে পারচি না।

মাসী আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

রমেশ এই মাসীটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই; কারণ সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষে সেই যে মুখুয্যেবাড়ি ঢুকিয়াছিলেন আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসী বলিলেন, না হ'লে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা! বলা নেই, কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির ভিতর ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার?

রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমি চললুম, বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িল।

রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, কি বোকচ মাসী, তুমি নিজের কাজে যাও না—

মাসী মনে করিলেন, তিনি বোনঝির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিষ মিশাইয়া কহিলেন, নে রমা, বকিস্ নে। যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোমাদের মত চক্ষুলজ্জা হয় না। বেণীর অমন ভয়ে পালানোর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হ'ত! আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্ম্মবাড়িতে জল তুলতে, ময়দা মাখতে যাবো। তারিণী মরেচে, গাঁ-সুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে, এ কথা আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর মুখের ওপর বলে গেলেই ত পুরুষমানুষের মত কাজ হ'ত।

রমেশ তখনও নিস্পন্দ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভিতর হইতে রান্নাঘরে কপাটের শিকলটা ঝন্ ঝন্ করিয়া নাড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল

না। মাসী রমেশের নির্ব্বাক ও অত্যন্ত পাংশুবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-দরোয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাইনে—একটু হুঁশ করে কাজ ক'রো বাপু—যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্দরলোকের বাড়ির ভেতর ঢুকে আবদার করে বেড়াবে! তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনও পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলুম।

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে রান্নাঘরের দিক উদ্দেশ করিয়া কহিল, যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমি ত এত কথা জানতাম না—না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম, সেজন্য আমাকে মাপ করো রাণী! বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পালায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসীর সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আহ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল, সরিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ, শোনালে বটে মাসী! আমার সাধ্যই ছিল না, অমন করে বলা! এ কি চাকর-দরোয়ানের কাজ রমা! আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কি না, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বার হয়ে গেল। এই ত—ঠিক হ'ল!

মাসী ক্ষুণ্ণ অভিমানের স্বরে বলিলেন, খুব ত হ'ল জানি, কিন্তু এই দুটো মেয়ে-মানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বলে গেলেই ত আরও ভাল হ'ত! আর নাই যদি বলতে পারতে, আমি কি বললুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন সরে পড়া উচিত হয়নি!

মাসীর কথার ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল, এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, তুমি যখন নিজে বলেচ মাসী, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েচে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না—

মাসী এবং বেণী উভয়েই যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসী রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, কি বললি লা?

কিছু না। আহ্নিক করতে বসে ত সাতবার উঠলে—যাও না, ওটা সেরে ফেল না—রান্নাবান্না কি হবে না? বলিতে বলিতে রমা নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেণী শুষ্কমুখে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মাসী?

কি করে জানব বাছা! ও রাজরাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসী-বাঁদীর কর্ম্ম! বলিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে তিনি মুখখানা কালিবর্ণ করিয়া তাঁহার পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

২

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অর্জিত হইবার একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যক। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে মহাকুলীন বলরাম মুখুয্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুয্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন! বিবাহ করিয়া, বর্দ্ধমান রাজ সরকারের চাকরি করিয়া এবং আরও কি কি করিয়া এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতৃঋণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাই দুঃখে-কষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষেই না কি দুই মিতার মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখ-দর্শন করেন নাই। বলরাম মুখুয্যে যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও ঘোষাল তাঁহার বাটীতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য্য কথা শুনা গেল। তিনি নিজেই সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়াছেন। সেই অবধি এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুয্যে ও ঘোষালবংশ ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছে। ইঁহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকও অস্বীকার করিত না।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ঘোষালবংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট তরফের তারিণী ঘোষাল মোকদ্দমা উপলক্ষে জেলায় গিয়া দিন-ছয়েক পূর্ব্বে হঠাৎ যেদিন আদালতের ছোট-বড় পাঁচ-সাতটা মুলতুবি মোকদ্দমার শেষফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কোথাকার কোন অজানা আদালতের মহামান্য শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহাদের কুঁয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা

হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বড় তরফের কর্ত্তা বেণী ঘোষাল বুড়োর মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন এবং আরো গোপনে দল পাকাইতে লাগিলেন কি করিয়া খুড়োর আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর খুড়ো-ভাইপোর মুখ দেখাদেখি ছিল না। বহু বৎসর পূর্ব্বে তারিণীর গৃহ শূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাড়ির ভিতরে দাস-দাসী এবং বাহিরে মোকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ রুড়কি কলেজে এই দুঃসংবাদ পাইয়া পিতার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘ কাল পরে কাল অপরাহ্নে তাহার শূন্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ম্মবাড়ি। মধ্যে শুধু দু'টো দিন বাকী। বৃহস্পতিবার রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই-একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মুরুব্বিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কেহ আসিবে না তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য্য ও তাহার বাড়ির লোকেরা আসিয়া কাজকর্ম্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা না থাকিলেও উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিয়াছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রমেশ বাড়ির ভিতরে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্যে বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জন-দুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতি বৃদ্ধ পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ি ঢুকিলেন। তাঁহার কাঁধে মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গোঁফ তামাকের ধুঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে সেই ভীষণ চশমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যেবংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার বেণী ঘোষালের মুখের সামনে বলে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। একটু থামিয়া বলিল, আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম করে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্ম্মদাস শুধু ধর্ম্মেরই দাস, আর কারো নয়। এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্যভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাত হইতে হুঁকাটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাতে এক টান দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিল!

ধর্ম্মদাস নিতান্ত অত্যুক্তি করেন নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করেন নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল। তাহারা প্রাঙ্গণের একধারে ভিয়ান চড়াইয়াছে—সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কাঙ্গালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে—চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য্য থান ফাড়িয়া পাট করিয়া গাদা করিতেছিল—সেদিকে জন-কয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছিমিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া ধর্ম্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যুত্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া 'না না' বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্ম্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড়্ ঘড়্ করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মদাস যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিবার সুবিধা তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মনে মনে ভারী একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। সে এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিল না। ধর্ম্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কাল সকালে, বুঝলে ধর্ম্মদাসদা, এখানে আসব বলে বেরিয়েও আসা হ'ল না, বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলুম, কাজ নেই—তারপর মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বললে জান বাবা রমেশ! বললে, খুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েচ, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, লোকজন খাবে-টাবে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন। তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশ কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত এক মুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বললুম, বেণীবাবু, এই ত পথ, একবার কাঙ্গালী-বিদায়টা দাঁড়িয়ে দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটাও বলি একে! এতটা বয়েস হ'ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তাও বলি ধর্ম্মদাসদা, আমাদের সাধ্যিই বা কি! যাঁর কাজ তিনি উপর থেকে করাচ্চেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বৈ ত নয়!

ধর্ম্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, সে কাসিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলীমশাই, বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া ধর্ম্মদাস আরও ভাল কিছু বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিল, তুমি ত আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুতো বোনের খুড়তুতো ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ি—সে সব তারিণীদা জানতেন। তাই যে কোন কাজ-কর্ম্মে—মামলা-মোকদ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে!

ধর্ম্মদাস প্রাণপণ-বলে—কাসি থামাইয়া খিচাইয়া উঠিল, কেন বাজে বকিস্ গোবিন্দ? থক্—থক্—থক্—আমি আজকের নয়, না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বললি, আমার জুতো নেই, খালি-পায়ে যাই কি করে? থক্—থক্—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিলে। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি! থক্—থক্—থক্।

গোবিন্দ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, এলুম?

এলিনে?

দূর মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী তোর বাবা।

গোবিন্দ তাহার ভাঙ্গা ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, তবে রে শালা!

ধর্ম্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া ধরিয়া হুঙ্কার দিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিল। রমেশ শশব্যস্তে উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্ম্মদাস লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ও শালার সম্পর্কে আমি বড় ভাই হই কি না, তাই শালার আক্কেল দেখ—

ওঃ, শালা আমার বড় ভাই! বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

শহরের ময়রারা ভিয়ান ছাড়িয়া চাহিয়া রহিল। চতুর্দ্দিকে যাহারা কাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, চেঁচামেচি শুনিয়া তাহারা তামাশা দেখিবার জন্য সুমুখে ছুটিয়া আসিল। ছেলেমেয়েরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল এবং এই সমস্ত লোকের দৃষ্টির সুমুখে রমেশ লজ্জায় বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান! এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে! বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কাপড়ের থাক দিতে দিতে সমস্তই দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া আসিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, প্রায় শ'চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?

রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভিভূত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই! বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের

হয়। বৃহৎ কাজ কর্ম্মের বাড়িতে কত ঠেঙাঠেঙি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হয়ে যায়—আবার যে-কে সেই হয়। নিন উঠুন চাটুয্যেমশাই—দেখুন দেখি আরও থান ফাড়ব কি না?

ধর্ম্মদাস জবাব দিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্ব্বক খাড়া হইয়া বলিল, হয়ই ত! হয়ই ত! ঢের হয়! নইলে বিরদ কর্ম্ম বলেচে কেন? শাস্তরে আছে লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে! সে বছর—তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যেমশায়ের কন্যা রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিদে নিয়ে রাঘব ভট্টচায্যিতে হারাণ চাটুয্যেতে মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেল? কিন্তু আমি বলি ভৈরব-ভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলেদের একখানা ক'রে দিলেই নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী, সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্ম্মদাসদা?

ধর্ম্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি বাবাজী! ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেচে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ!

এখন পর্য্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বস্ত্র বিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। ইহার সুযুক্তি-কুযুক্তি সম্বন্ধে নহে, এখন এইটাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহারা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এত বড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড করিয়া বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া রমেশ সংক্ষেপে কহিল, আরও দু'শ কাপড় ঠিক করে রাখুন।

তা নইলে কি হয়? ভৈরবভায়া, চল, আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে বল? বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বস্ত্র-রাশির নিকটে গিয়া বসিলেন। রমেশ বাটীর ভিতর যাইবার উপক্রম করিতেই ধর্ম্মদাস তাহাকে একপাশে ডাকিয়া চুপি চুপি অনেক কথা কহিলেন। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কাপড় গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী আড়চোখে সব দেখিল।

কৈ গা, বাবাজী কোথায় গো? বলিয়া একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিতশ্মশ্রু প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল। ইহার সঙ্গেও গুটি-তিনেক ছেলে-মেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরনে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়। বালক দুটি কোমরে এক একগাছি ঘুনসি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল, এস দীনুদা, ব'সো। বড় ভাগ্যি

আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়ল। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায়, তা তোমরা—

ধর্ম্মদাস গোবিন্দের প্রতি কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিল। তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিল, তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না দাদা; বলিয়া তাহার হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিল। দীনু ভট্‌চায আসন গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হুকাটায় নিরর্থক গোটাদুই টান দিয়া বলিল, আমি ত ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকরুণকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারী আয়োজন হচ্চে? পথে আসতে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে যোলখানা করে লুচি আর চার-জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, তা ছাড়া হয়ত একখানা করে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনুদাকে বলছিলাম বাবাজী, তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড-সোগাড একরকম করা তো যাচ্ছে, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েচে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ির টান রয়েচে; কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্ম্মদাসদা, এরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনুদা ত পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসচেন। ওরে ও ষষ্ঠীচরণ, তামাক দে না রে! বাবা রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই! নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভিতরে বুঝি ধর্মদাস-গিন্নী এসেচে? খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি কোরো না বাবা! বিট্‌লে বামুন যতই ফোসলাক, ধর্মদাস-গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চাবিটাবি দিও না বাবা, কিছুতে দিও না—ঘি, ময়দা, তেল, নুন, অর্দ্ধেক সরিয়ে ফেলবে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়ে তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্য্যন্ত লোকসান হবে না।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মৌন হইয়া রহিল! তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। ধর্মদাস যে তাহার গৃহিণীকে ভাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া দিবার কথা এত গোপনে কহিয়াছিলেন, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আন্দাজ করিয়াছিল কিরূপে?

উলঙ্গ শিশু-দুটা ছুটিয়া আসিয়া দীনুদার কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল—বাবা, সন্দেশ খাব।

দীনু একবার রমেশের প্রতি একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, সন্দেশ কোথায় পাব রে?

কেন, ঐ যে হচ্চে, বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া দিল।

আমরাও দাঁদামশাই, বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আরও তিন-চারটি ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্ম্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল।

বেশ ত, বেশ ত, বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল—ও আচায্যি-মশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েচে, খেয়ে ত আসেনি—ওহে ও, কি নাম তোমার? নিয়ে এসো ত ঐ থালাটা এদিকে।

ময়রা সন্দেশের থালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল; বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল—ওরে ও খেঁদি, খাচ্ছিস ত, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল্ দেখি?

বেশ বাবা, বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল। দীনু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ তোদের আবার পছন্দ? মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিগর, এ কড়াটা কেমন নামালে—কি বল গোবিন্দভায়া, এখনও একটু বোদ আছে বলে মনে হচ্ছে না?

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে আছে বৈ কি! এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিকের—

তবে কৈ দাও দেখি একটা গোবিন্দভায়াকে, চেখে দেখুক কেমন কলকাতার কারিগর তোমরা! না, না, আমাকে আবার কেন? তবে আধখানা—আধখানার বেশী নয়। ওরে ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—

রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে গোটা-চারেক থালাও নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠীচরণ।

প্রভুর আদেশমত ভিতর হইতে গোটা-তিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বৃহৎ থালার অর্দ্ধেক মিষ্টান্ন এই তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সদ্‌ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

হাঁ, কলকাতার কারিগর বটে! কি বল ধর্ম্মদাসদা? বলিয়া দীননাথ রুদ্ধনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মদাসদার তখনও শেষ হয় নাই, এবং যদিচ তাঁহার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোঝা গেল এ-বিষয়ে তাঁহার মতভেদ নাই।

হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে! বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তবে মিহিদানাটা একটু পরখ করে দিন।

মিহিদানা? কই আনো দেখি বাপু?

মিহিদানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে এই নূতন বস্তুটির সদ্ব্যবহার

দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল! দীননাথ মেয়ের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, ওরে ও খেঁদি, ধর্ দিকি মা এই ছটো মিহিদানা।

আমি আর খেতে পারব না বাবা।

পারবি, পারবি। এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বৈ ত নয়! না পারিস আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ্, কাল সকালে খাস, হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! যেন অমৃত! তা বেশ হয়েচে। মিষ্টি বুঝি দুরকম করালে বাবাজী!

রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

অ্যা ক্ষীরমোহন! কৈ সে ত বার করলে না বাপু?

বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া দীননাথ কহিলেন, খেয়েছিলুম বটে রাধা-নগরের বোসেদের বাড়ি। আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি।

রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথাটা বিশ্বাস করা তার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না। রাখাল কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ভেতরে বোধ করি আচায্যিমশাই আছেন; যা ত রাখাল, কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দেখি।

সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া বলিল, আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু।

রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, বল গে, আমি আনতে বলচি।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী রমেশের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন, দেখলে দীনুদা, ভৈরবের আক্কেল? এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ। এই জন্যই আমি বলি—

তিনি কি বলেন তাহা না শুনিয়া রাখাল বলিয়া উঠিল, আচায্যিমশাই কি করবেন? ও-বাড়ি থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে!

ধর্ম্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিল, কে, বড় গিন্নী?

রমেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, জ্যাঠাইমা এসেছেন?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট-বড় দুই ভাঁড়ারই তালাবন্ধ করে ফেলেছেন।

বিস্ময়ে আনন্দে রমেশ দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

৩

জ্যাঠাইমা!

ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন; বেণীর বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওয়া উচিত নয়, কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না।

রমেশ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। এক-দিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জ্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখেই দুই-একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য তাঁহার দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে এক সময় বড় ভালবাসিতেন। বধূ-বয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাশুড়ী-ননদের যন্ত্রণায় লুকাইয়া বসিয়া এই দু'টি জায়ে তখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম গ্রন্থি বন্ধন হয়। তার পরে, গৃহ-বিচ্ছেদ, মামলা-মোকদ্দমা, পৃথক হওয়া, কত রকমের ঝড়-ঝাপ্টা এই দুইটি সংসারের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিবাদের উত্তাপে বাঁধন শিথিল হইয়াছে, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। বহুবর্ষ পরে সেই ছোটবৌয়ের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহারই হাতে সাজানো এই সমস্ত বহু পুরাতন হাঁড়ি-কলসির পানে চাহিয়া জ্যাঠাইমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে-ছিল। রমেশের আহ্বানে যখন তিনি চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি আরক্ত আর্দ্র চক্ষু-পল্লবের পানে চাহিয়া রমেশ ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। জ্যাঠাইমা তাহা টের পাইলেন। তাহাতেই বোধ করি এই সদ্য-পিতৃহীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার লেশমাত্র তিনি বাইরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, চিনতে পারিস্ রমেশ?

জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে যতদিন না সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, ততদিন এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়া-ছিলেন এবং কিছুতে ছাড়িতে চাহেন নাই। সে-ও মনে পড়িল এবং এ-ও মনে হইল সেদিন ও-বাড়িতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ি নাই বলিয়া দেখা পর্য্যন্ত করেন

নাই। তার পর রমাদের বাড়িতে বেণীর সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাহার মাসীর নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বিশ্বেশ্বরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছি বাবা, এ সময়ে শক্ত হ'তে হয়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল যেখানে অভিমানের কোন মর্য্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কহিল, শক্ত আমি হয়েচি জ্যাঠাইমা! তাই যা পারতুম নিজেই করতুম, কেন তুমি আবার এলে?

জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, তুই ত আমাকে ডেকে আনিসনি রমেশ, যে, তোকে তার কৈফিয়ত দেব? তা শোন বলি। কাজকর্ম্ম হবার আগে আর আমি ভাঁড়ার থেকে খাবার-টাবার কোন জিনিস বা'র হতে দেব না; যাবার সময় ভাড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কাল এসে তোর হাত থেকে নেব। আর কারু হাতে দিস্‌নি যেন। হাঁ রে, সেদিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না। ভাবিয়া কহিল, বড়দা তখন ত বাড়ি ছিলেন না।

প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে সস্নেহে অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, আ আমার কপাল! এই বুঝি? হাঁ রে, দেখা হয়নি বলে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের উপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু তোর কাজ ত তোর করা চাই। যা একবার ভাল করে বল গে যা রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হ'তে তোর কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা যে, কোন লোকের হাতেপায়ে ধরে মিটমাট করে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মী-মানিক আমার, যা একবার —এখন বোধ হয় সে বাড়িতেই আছে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না। বিশ্বেশ্বরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে ঢের বেশী জানি। তাঁদের কথা শুনিসনে। আয় আমার সঙ্গে, তোর বড়দার কাছে একবার যাবি চল্‌।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না জ্যাঠাইমা, সে হয় না। আর বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যাই হোন তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।

সে আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার মনে হইল, জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশী মলিন হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তবে তাই। যখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা কয়ে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিসনি বাবা, কিছুই আটকাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আসবো। বলিয়া বিশ্বেশ্বরী তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন; বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ ম্লানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী, বড়গিন্নী এসেছিলেন, না?

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

শুনলুম ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেলেন, না?

রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ কহিলেন, দেখলে ধর্ম্মদাসদা, যা বলেচি তাই। বলি মতলবটা বুঝলে বাবাজী?

রমেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র দীনু ভট্চায তখনও যান নাই। কারণ তাহার বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল না। ছেলেমেয়ে লইয়া যাহার দয়ায় পেট ভরিযা সন্দেশ খাইতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক দুটা আশীর্ব্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে-তাহার সাত-পুরুষের স্তব-স্তুতি না করিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিলেন না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, এ মতলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া? তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়াছিলেন; নির্ব্বোধের কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, বোঝো না সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এ-সব ব্যাপারের কি বোঝো যে মানে করতে এসেচ?

ধমক খাইয়া দীনুর নির্ব্বুদ্ধিতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উষ্ণ হইয়া জবাব দিল, আরে এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোনখানে? শুনচ না, গিন্নীমা স্বয়ং এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন। এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, ঘরে যাও না ভট্চায। যে জন্যে ছুটে এসেছিলে

—গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে, আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেয়ো, আজ আর হবে না। এখন যাও, আমাদের ঢের কাজ আছে।

দীনু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠস্বরে থামিয়া গেল—আপনার হ'ল কি গাঙ্গুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন খামকা অপমান করচেন কেন?

গোবিন্দ ভৎ'সিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্কহাসি হাসিয়া বলিল, অপমান আবার কাকে করলুম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না সত্যি কথাটি বলেচি কি না? ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় ফিরি যে? দেখলে ধর্ম্মদাসদা, দীনে বামনার আস্পর্দ্ধা? আচ্ছা—

ধর্ম্মদাসদা কি দেখিলেন, তা সেই জানে, কিন্তু রমেশ লোকটার নির্লজ্জতা ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তখন দীনু রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেচে। আমি বড় গরীব, সে-কথা সবই জানে। ওঁদের মত আমার জমি-জমা-চাষ-বাস কিছুই নেই। একরকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-সিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভাল জিনিস ছেলে-পিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেননি—তাই বড়-ঘরে কাজকর্ম্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে ক'রো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে দেখে খুশীই হয়েচেন।

হঠাৎ দীনুর গম্ভীর শুষ্ক চোখদু'টা জলে ভরিয়া উঠিয়া টপ্ টপ্ করিয়া দু'ফোঁটা সকলের সুমুখেই ঝরিয়া পড়িল। রমেশ মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল। দীনু তাঁহার মলিন ও শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়প্রান্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, শুধু আমিই নয় বাবা। এদিকে আমার মত দুঃখী-গরীব যে যেখানে আছে, তারিণীদার কাছে হাত পেতে কেউ কখনো অমনি ফেরেনি। সে-কথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাও টের পেত না যে! আর তোমাদের জ্বালাতন করব না। নে মা খেঁদি, ওঠ, হরিধন, চল্ বাবা ঘরে যাই, আবার কাল সকালে আসব, আর কি বলব বাবা রমেশ, বাপের মত হও, দীর্ঘজীবী হও।

রমেশ তাহার সঙ্গে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, ভট্‌চায্যিমশাই, এই দুটো-তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখবেন। আর বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু এ বাড়িতে হরিধনের মায়ের যদি পায়ের ধুলো পড়ে ত ভাগ্য বলে মনে করব।

ভট্‌চায্যিমশায় ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া

ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, আমি বড় দুঃখী বাবা রমেশ, আমাকে এমন করে বললে যে লজ্জায় মরে যাই।

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নিজের রূঢ় কথা স্মরণ করিয়া গাঙ্গুলীমশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই সে থামাইয়া দিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ যে আমার নিজের কাজ রমেশ, তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাইত এসেছি; ধর্ম্মদাসদা আর আমি দুই ভায়ে ত তোমার ডাকবার অপেক্ষা রাখিনি বাবা।

ধর্ম্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাসিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাসির ধমকে চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিল, বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই। আমাদের জন্মের ঠিক আছে।

তাহার কুৎসিত কথায় রমেশ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু রাগ করিল না। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহারা শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কত বড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না।

জ্যাঠাইমার সস্নেহ অনুরোধে এবং তাহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে পীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকাহাঁকিটাই সবচেয়ে বেশী। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছে, এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদলে রেখো বেণীবাবু! নবাবী কাণ্ডকারখানা শুনলে ত? তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি, তা ত জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর্, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা ক'রে বাপের ছাদ্দ করে, তা ত কখন শুনিনি বাবা! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বেণীমাধববাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করেচে।

বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, তা হলে কথাটা ত বা'র করে নিতে হচ্চে গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া বলিলেন, সবুর কর না বাবাজী! একবার ভাল করে ঢুকতেই দাও না—তার পরে—বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? এ কি রমেশ বাবাজী? আমরা থাকতে এত রাত্তিরে তুমি কেন বাবা?

রমেশ সে কথার জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বড়দা, আপনার কাছেই এলুম।

বেণী থতমত খাইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিল, আসবে

বৈ কি বাবা, একশ'বার আসবে! এ ত তোমারই বাড়ি। আর বড়ভাই পিতৃতুল্য! তাই ত আমরা বেণীবাবুকে বলতে এসেছি, বেণীবাবু, তারিণীদার সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক্—আর কেন? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল হালদারমামা? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে বাবা—কে আছিস্ রে, একখানা কম্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না বেণীবাবু, তুমি বড়ভাই —তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া বড়গিন্নীঠাকরুণ যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী চমকাইয়া উঠিল—মা গিয়েছিলেন?

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত খবরটা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, শুধু যাওয়া কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার—করা-কর্ম্ম যা কিছু তিনিই ত করচেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?

সকলে চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, নাঃ —গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নীঠাকরুনের মত মানুষ কি আর আছে? না হবে কেন? না বেণীবাবু, সামনে বললে খোশামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়? বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। বেণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, আচ্ছা—

গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল, শুধু আচ্ছা নয়, বেণীবাবু! যেতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার উপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কি রকম করা হবে একটা ফর্দ্দ করে ফেলা হোক না কেন? কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কথা কি না হালদারমামা? ধর্ম্মদাসদা চুপ করে রইলে কেন? কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীতকণ্ঠে বলিল, বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেণী গম্ভীর হইয়া কহিল, মা যখন গেছেন তখন আমার যাওয়া না-যাওয়া—কি বল গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্ব্বেই রমেশ বলিল, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে বড়দা, যদি অসুবিধা না হয় একবার দেখে-শুনে আসবেন।

বেণী চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলল, দেখলে বেণীবাবু, কথার ভাবখানা।

বেণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দর কথাগুলো মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্দ্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেণী ঘোষালের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের সুমুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রমেশ? কেন রে?

রমেশ উঠিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, একটু দাঁড়া বাবা, একটা আলো আনতে বলে দি।

আলোয় কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না। বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই এক পাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন, এত রাত্তিরে যে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয় নি জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলুম।

তবেই মুস্কিলে ফেললি বাবা? এঁরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, চাটুয্যেমশাই—

রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, জানিনে জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জানতেও চাইনে—তুমি যা বলবে তাই হবে।

অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু তখন যে বললি রমেশ, এরাই তোর সবচেয়ে আপনার! তা যাই হোক, আমার মেয়েমানুষের কথায় কি হবে বাবা? এ গাঁয়ে যে আবার—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা কাজ-কর্ম্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।

রমেশ বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না। কারণ, এই কয়েকদিনের মধ্যেই সে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা?

সে অনেক কথা বাবা? যদি থাকিস্ এখানে আপনিই সব জানতে পারবি। কারুর সত্যকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে-অপবাদ আছে—তা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দুদিন আগে যেতুম রমেশ, তা হলে এত উদ্যোগ আয়োজন কিছুতে করতে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি, বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে কি যে ছিল, তাহার ঠিক মর্ম্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না। এবং কাহারও সত্যকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে

পারে, তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না, বরঞ্চ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী বললেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণশূদ্রই নিমন্ত্রণ করে আসব। কিন্তু, তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে; তুমি হুকুম দাও জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, এ-রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ। তাতে ভারী গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয় বাবা। সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেচে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হ'লে ত কোনমতে চলতে পারে না রমেশ!

ভাবিয়া দেখিলে রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত তাহা নহে, কিন্তু এইমাত্র নাকি বাইরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্র এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ—ওঁরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, শুধু এরা নয় রমেশ, তোমার বড়দা বেণীও সমাজের কর্ত্তা।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করো গে রমেশ! সবেমাত্র বাড়িতে পা দিয়েই এদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।

বিশ্বেশ্বরী কতটা দূর চিন্তা করিয়া যে এরূপ উপদেশ দিলেন, তীব্র উত্তেজনার মুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না; কহিল, তুমি নিজে এইমাত্র বললে জ্যাঠাইমা, নানান কারণে এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশী। তা ছাড়া, আমি যখন সত্যি-মিথ্যে কারো দোষ-অপরাধের কথাই জানিনে, তখন কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অন্যায়।

জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, আমি তোর গুরুজন, মায়ের মতো। আমার কথাটা না শোনাও তোর পক্ষে অন্যায়।

কি করবো জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করেচি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করবো।

তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখ অপ্রসন্ন হইল; বোধ করি বা মনে মনে বিরক্তও হইলেন; বলিলেন, তা হলে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছলমাত্র।

জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল, কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমি জানতুম জ্যাঠাইমা, যা অন্যায় নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে। আমার—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল রমেশ যে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না ?

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কাল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবী করিতে-ছিল, এখন দেখিল, এ দাবীর অনেক উর্দ্ধে তাঁর আপন সন্তানের দাবী জায়গা জুড়িয়া আছে। সে ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই দাঁড়াইয়া চাপা অভিমানের স্বরে বলিল, কাল পর্য্যন্ত তাই জানতুম জ্যাঠাইমা ! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা পারি আমি একলা করি, তুমি এসো না ; তোমাকে ডাকবার সাহসও আমায় হয়নি।

এই ক্ষুণ্ণ অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর রহিল না। কিন্তু আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার ভাঁড়ার-ঘরের চাবিটা এনে দিই, বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবি আনিয়া রমেশের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘণ্টাকয়েক মাত্র পূর্ব্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন। কিন্তু একটা রাত্রিও কাটিল না, তাহাকে আবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল, না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করেচেন।

৪

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ির ভিতরে আহারের জন্য পাতা পাতিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল হাঁকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল ! ভিতরে রন্ধনশালার কপাটের একপাশে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রৌঢ়া

রমণী তাহাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখামাত্র প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ বাবা, তুমি গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি, যত দোষ কি এই ক্ষ্যেন্তি বামনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার খুশি শাস্তি দেবে?

গোবিন্দকে দেখিয়াই কহিল, ঐ উনি মুখুয্যে-বাড়ির গাছ-পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আমার কাছে আদায় করেননি কি? গাঁয়ের ষোল আনা শেতলা-পুজোর জন্যে জুজোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেননি কি? তবে? কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি?

রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী বসিয়া ছিল, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার রমেশের দিকে একবার প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন, যদি আমার নামটাই করলে ক্ষ্যান্তমাসী, তবে সত্যি কথা বলি বাছা! খাতিরে কথা কইবার লোক এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়, সে দেশসুদ্ধ লোক জানে। তোমার মেয়ের প্রাশ্চিত্যও হয়েচে, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি—সব মানি। কিন্তু তাকে যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিইনি! মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—

ক্ষ্যান্তমাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, ম'লে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পুড়িয়ে এসো বাছা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোটভাজ যে ঐ ভাঁড়ার-ঘরে বসে পান সাজচে, সে ত আর বছর মাস-দেড়েক ধরে কোন্ কাশীবাস করে অমন হলদে রোগা শলতেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল শুনি? সে বড়লোকের বড় কথা বুঝি? বেশি ঘাঁটিয়ো না বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।

গোবিন্দ ক্ষ্যাপার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে রে হারামজাদা মাগী—

কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না, বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, মারবি নাকি রে? ক্ষ্যেন্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ উজোর হয়ে যাবে তা বলে দিচ্চি। আমার মেয়ে ত রান্নাঘরে ঢুকতে যায়নি; দোরগোড়ায় আসতে না আসতে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান করে বসলো, বলি তার বেয়ানের তাঁতি অপবাদ ছিল না কি? আমি ত আর আজকের নই গো, বলি আরও বলব, না এতেই হবে?

রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য্য ব্যস্ত হইয়া ক্ষ্যান্তর হাতটা

প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সানুনয়ে কহিল, এতেই হবে মাসী, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী ওঠ্ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে বসবি চল্।

পরাণ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্চি। গোবিন্দ! কালীচরণ! তোমাদের মামাকে চাও ত উঠে এসো বলচি। বেণী ঘোষাল যে তখন বলেছিল, মামা, যেয়ো না ওখানে! এমন সব খান্‌কী নটীর কাণ্ডকারখাবখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ-বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই? কালী! উঠে এসো।

মাতুলের পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছর-চারেক পূর্ব্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোট ভগ্নিটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল—ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে এই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই! সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, যে যাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলে সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাণ হালদার, আর যদু মুখুয্যেমশায়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই দুটো মাগীকে কেন বাড়ি ঢুকতে দিয়েচেন, তার জবাব না দিলে আমরা এখানে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়ের লোক, সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন চাল সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ইহা তাহাদের অবিদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা যাহারা যা খুশি বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীনু ভট্‌চায কাঁদ কাঁদ হইয়া বার বার ক্ষ্যান্তমাসী ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙ্গুলী, একবার হালদার মশায়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিক হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্ম্ম যেন লণ্ডভণ্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল। কিন্তু রমেশ একটি কথা কহিতে পারিল না। একে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাংশুমুখে কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রমেশ!

অকস্মাৎ একমুহূর্ত্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কপাটের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল, কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপনিই কখন আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল ইনিই বিশ্বেশ্বরী, ইনিই ঘোষাল-বাড়ির গিন্নীমা।

পল্লীগ্রামে শহরের কড়া পর্দ্দা নাই। তত্রাচ বিশ্বেশ্বরী বড়বাড়ির বধূ বলিয়াই হোক কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং সকলেই বড় বিস্মিত হইল। যাহারা শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার আশ্চর্য্য চোখ দুটির পানে চাহিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ থামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেমনি সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গাঙ্গুলীমশায়কে ভয় দেখাতে মানা করে দে রমেশ! আর হালদারমশায়কে আমার নাম করে বল্ যে, আমি সবাইকে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনেচি, সুকুমারীকে অপমান করবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজ-কর্ম্মের বাড়িতে হাঁকা-হাঁকি, গালিগালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যাঁর অসুবিধে হবে তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।

বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানে শুনিতে পাইল। রমেশের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না—হইলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাঁড়াইয়া দেখিতেও পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় লইতে দেখিয়া সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল; তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, কে আসিল, না আসিল তাহার খোঁজ লইতে পারে নাই। কিন্তু আর যেই আসুক, জ্যাঠাইমা যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনার অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে একজন তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে অস্ফুটে কহিল, বসে পড় না খুড়ো? ষোলখানা লুচি, চারজোড়া সন্দেশ কে কোথায় খাইয়ে-দাইয়ে সঙ্গে দেয় বাবা!

পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়া রাখিল এবং আহারের জন্য পাতা পড়িলে তত্ত্বাবধানের ছুতা করিয়া সকলের সঙ্গে পংক্তি-ভোজনে উপবেশন করিল না। যাহারা তাহার এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল তাহারা সকলেই

মনে মনে বুঝিল, গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিবে না। অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত এবং প্রত্যেকেই খুঁদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ি প্রভৃতি বাটীর অনুপস্থিত বালকবালিকার নাম করিয়া যাহা বাঁধিয়া লইলেন তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে।

সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম্ম প্রায় সারা হইয়া গিয়াছে, রমেশ সদর-দরজার বাহিরে একটা পেয়ারাগাছের তলায় অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, মনটা তাহার ভাল ছিল না। দেখিল, দীনু ভট্চায ছেলেদের লইয়া লুচি-মণ্ডার গুরুভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একরূপ অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে খেঁদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে—

সবাই যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটা বুঝিতে পারিল; পলাইবার পথ থাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বলিয়া আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে কহিল, খেঁদি, এসব কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস্ রে?

তাহাদের ছোট-বড় পুঁটুলিগুলির ঠিক সদুত্তর খেঁদি দিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া দীনু নিজেই একটুখানি শুষ্কভাবে হাসিয়া বলিলেন, পাড়ার ছোটলোকদের ছেলেপিলেরা আছে ত বাবা, এটো-কাঁটাগুলো নিয়ে গেলে তাদের দুখানা-চারখানা দিতে পারব। সে যাই হোক বাবা, কেন যে দেশশুদ্ধ লোক ওঁকে গিন্নীমা বলে ডাকে তা আজ বুঝলুম।

রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের ধার পর্য্যন্ত আসিয়া— হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভট্চায্যিমশাই, আপনি ত এদিকের সমস্ত জানেন, এ গাঁয়ে এত রেষারেষি কেন বলতে পারেন?

দীনু মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হায় রে বাবাজী, আমাদের কুঁয়াপুর ত পদে আছে। যে কাণ্ড এ কদিন ধরে খেঁদির মামার বাড়িতে দেখে এলুম! বিশ ঘর বামুন-কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে কিন্তু চারটে দল। হরনাথ বিশ্বেস দুটো বিলিতি আমড়া পেড়েছিল বলে তার আপনার ভাগ্নেকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে। সমস্ত গ্রামেই বাবা এই রকম—তা ছাড়া মামলায় মামলায় একেবারে শতচ্ছিদ্র!—খেঁদি, হরিধনের হাতটা একবার বদলে নে মা।

রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, এর কি কোন প্রতিকার নেই ভট্চায্যিমশাই?

প্রতিকার আর কি করে হবে বাবা—এ যে ঘোর কলি! ভট্টাচার্য্য একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে একটা কথা বলতে পারি বাবাজী। আমি ভিক্ষে-সিক্ষে

করতে অনেক জায়গাতেই তো পাই—অনেকে অনুগ্রহ করেন। আমি বেশ দেখেচি, তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের দয়া-ধর্ম্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না করে আর ছেড়ে দেয় না। বলিয়া দীনু যেমন ভঙ্গি করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল।

দীনু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, হাসির কথা নয় বাবাজী, অতি সত্য কথা। আমি নিজেও প্রাচীন হয়েচি—কিন্তু—তুমি যে অন্ধকারে অনেক এগিয়ে এলে বাবাজী।

তা হোক ভট্‌চায্যিমশাই, আপনি বলুন।

কি আর বলব বাবা, পাড়াগাঁ-মাত্রই এই রকম। এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ক্ষ্যান্তবামনি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই ওকে ভয় করে। জাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ও-ই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়ায়।

রমেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। দীনু নিজেই বলিতে লাগিল—এই আমার কথা তুমি দেখে নিয়ো বাবা, ক্ষ্যান্তিবামনি সহজে নিস্তার পাবে না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার দু-দুটো ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা। কিন্তু যাই বল বাবা, মাগীর সাহস আছে। আর সাহস থাকবে নাই বা কেন? মুড়ী বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে, সকলের সব কথা টের পায়। ওকে ঘাঁটালে কেলেঙ্কারীর সীমা-পরিসীমা থাকবে না তা বলে দিচ্চি। অনাচার আর কোন্ ঘরে নেই বল? বেণীবাবুকেও—

রমেশ সভয়ে বাধা দিয়া বলিল, থাক্, বড়দার কথায় আর কাজ নেই—

দীনু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কহিল, থাক্ বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, কারো কথায় আমার কাজ নেই। কেউ যদি বেণীবাবুর কানে তুলে দেয় ত আমার ঘরে আগুন—

রমেশ আবার বাধা দিয়া কহিল, ভট্‌চায্যিমশাই, আপনার বাড়ী কি আরো দূরে?

না বাবা, বেশী দূর নয়, এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে—কোন দিন যদি—

আসব বৈ কি, নিশ্চয় আসব। বলিয়া রমেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আবার কাল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্তু তার পরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন, বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘজীবী হও—বাপের মত হও। বলিয়া দীনু ভটচায্ অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্ব্বচন করিয়া ছেলেপুলে লইয়া চলিয়া গেল।

৫

এ-পাড়ার একমাত্র মধু পালের মুদীর দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশ-বারদিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকী দশ টাকা লইয়া যায় নাই বলিয়া রমেশ কি মনে করিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। মধু পাল মহা-সমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোটবাবুর আসিবার হেতু শুনিয়া গভীর আশ্চর্য্যে অবাক হইয়া গেল। যে ধারে, সে উপযাচক হইয়া ঘর বহিয়া ঋণ শোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথায় কথায় অনেক কথা হইল। মধু কহিল, দোকান কেমন করে চলবে বাবু? দু-আনা, চার আনা, এক টাকা, পাঁচ সিকে করে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাকী পড়ে আছে। এই দিয়ে যাচ্ছি বলে দু'মাসেও আদায় হবার জো নেই। এ কি, বাঁড়ুয্যেমশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ে নখে গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডান হাতে কচুপাতায় মোড়া চারিটি কুচোচিংড়ি। তিনি ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরে এলুম, তামাক খা' দিকি মধু, বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, সৈরুবি জেলেনীর আক্কেল দেখলি মধু, খপ্‌ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে? কালে কালে কি হ'ল বল দেখিরে, এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক-কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, হাত ধরে ফেললে আপনার?

ক্রুদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশাই একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আড়াইটি পয়সা শুধু বাকী, তাই বলে থামকা হাটসুদ্ধ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার? কে না দেখলে বল্! মাঠ থেকে বসে এসে গাড়ুটি মেজে নদীতে হাত পা ধুয়ে মনে করলুম হাটটা একেবারে ঘুরে যাই! মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে—আমাকে স্বচ্ছন্দে বললে কি না, কিছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে! আরে আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস? ডালাটা ফস্ করে তুলে ফেলতেই দেখি না—অম্নি ফস্ করে হাতটা চেপে ধরে ফেললে। তোর আড়াইটা—আর আজকের একটা—এই সাড়ে-তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস মধু?

মধু সায় দিয়া কহিল, তাও কি হয়!

তবে তাই বল না। গাঁয়ে কি শাসন আছে। নইলে ষষ্ঠে জেলের ধোপা-নাপতে বন্ধ করে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না।

হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবুটি কে মধু?

মধু সগর্ব্বে কহিল, আমাদের ছোটবাবুর ছেলে যে! সেদিনের দশ টাকা বাকী ছিল বলে নিজে বাড়ি বয়ে দিতে এসেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশায় কুচোচিংড়ির অভিযোগ ভুলিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, অাঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাক বাবা। হাঁ, এসে শুনলুম একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনও হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল চোখে দেখতে পেলুম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাঁড়ির হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!

রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু দোকানসুদ্ধ সকলে তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহা কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তামাক সাজিয়া মধু দোকানি বাঁড়ুয্যের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে? একটি চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত?

হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার। হলে হবে কি—সেখানে কে থাকতে পারে বল্। যেমনি ধোঁয়া তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস্ ত জানবি তোর বাপের পুণ্যি!

মধু কখনও কলকাতায় যায় নাই। মেদিনীপুর শহরটা একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে ভারী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলেন কি।

বাঁড়ুয্যে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোর রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না, সত্যি কি মিথ্যে। না মধু, খেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকব সেও ভাল, কিন্তু বিদেশে যাবার নামটি যেন কেউ আমার কাছে আর না করে। বললে বিশ্বাস করবিনে, সেখানে সুষনি-কলমি শাক, চালতা, আমড়া, থোড়, মোচা পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়। পারবি খেতে? এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেছি। দিবারাত্রি পেট ফুট্ ফাট্ করে, বুক জ্বালা করে, প্রাণ আইঢাই করে, পালিয়ে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গাঁয়ে বসে জোটে একবেলা একসন্ধ্যা খাব, না জোটে, ছেলেমেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করব, বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জার কথা নেই, কিন্তু মা-লক্ষ্মী মাথায় থাকুক—বিদেশে কেউ যেন না যায়।

তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে যখন সভয়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে তখন বাঁড়ুয্যে উঠিয়া আসিয়া মধুর তেলের ভাঁড়ের ভিতরে উড়খি ডুবাইয়া এক ছটাক তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্দ্ধেকটা দুই নাক ও কানের গর্ত্তে ঢালিয়া দিয়া বাকীটা

মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, বেলা হয়ে গেল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পয়সার নুন দে দেখি মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাবো!

আবার বিকেলবেলা? বলিয়া মধু অপ্রসন্নমুখে নুন দিতে তাহার দোকানে উঠিল। বাঁড়ুয্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময়-বিরক্তির স্বরে কহিয়া উঠিলেন, তোরা সব হলি কি মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস্ দেখি? বলিয়া আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা নুন তুলিয়া ঠোঙায় দিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। গাড়ু হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ঐ ত একই পথ—চল না বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।

চলুন, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু দোকানি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া করুণ-কণ্ঠে কহিল, বাঁড়ুয্যেমশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অমনি—

বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিল—হাঁ রে মধু, দুবেলা চোখাচোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্য্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটা-বেটির মতলবে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা আমার গেল—আর এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল! কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষ মাস—দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে?

মধু এতটুকু হইয়া গিয়া অস্ফুটে বলিতে গেল, অনেক দিনের -

হলেই বা অনেক দিনের? এমন করে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না, বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার। দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি; তাই বলি—

রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুইমহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কিন্তু সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।

লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর যাই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি বিনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসনগ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোট রকমের ইস্কুল মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চাল্লশ জন ছাত্র পড়ে। দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্ণমেণ্ট সাহায্য আছে, তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাহিতেছে না; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন

পড়িয়াছিল তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে, উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই— সুতরাং ঘরের খাইয়া বনমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেডমাস্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাস্টার-পণ্ডিত চারিজন এবং তাহাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতি বৎসর মাইনার পরীক্ষায় পাস করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম, বিবরণ পাড়ুইমহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দুজন শিক্ষকের কোনমতে, ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে আর-একজনের সঙ্কুলান হয়, শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন-চারি মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবার করিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া সাত টাকা চারি আনার বেশী আদায় করিতে পারেন নাই।

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচ-ছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয় এবং এই পাঁচ ছয়টা গ্রামময় তিন-মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র সাত টাকা চারি আনা আদায় হইয়াছে। রমেশ প্রশ্ন করিল, আপনার মাহিনা কত?

মাস্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পনের আনা। কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাস্টার তাহা বুঝাইয়া বলিল, আজ্ঞে গভর্ণমেণ্টের হুকুম কি না, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন—আমি মিথ্যে বলচিনে।

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না?

মাস্টার লজ্জিত হইল। কহিল, কি করব রমেশবাবু! বেণীবাবু ও কয়টি টাকাও দিতে নারাজ।

তিনি কর্তা বুঝি?

মাস্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, তিনিই সেক্রেটারী বটে; কিন্তু তিনি একটি পয়সাও

কখনো খরচ করেন না। যদু মুখুয্যে মহাশয়ের কন্যা—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকিলে ইস্কুল অনেক দিন উঠিয়া যাইত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।

রমেশ কৌতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর একটি ভাই এ ইস্কুলে পড়ে না?

মাস্টার কহিল, যতীন ত? পড়ে বৈ কি।

রমেশ বলিল, আপনার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আজ আপনি যান, কাল আমি আপনাদের ওখানে যাব।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হেডমাস্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বিদায় হইল।

৬

বিশ্বেশ্বরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনই দশখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না, তাই সে গিয়া রমার মাসীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে না-কি তক্ষক দাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসীটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়িয়া যে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসের দেহটা কাঠের না বলিয়াই হৌক, কিংবা একাল সে কাল নয় বলিয়াই হৌক, জ্বলিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশ্বেশ্বরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ, ইহা যে তাঁহার পুত্রের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা কথার জবাব দিতে গেলেও এই স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বসিয়াছিলেন।

তবে পাড়াগাঁয়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই। রমেশ শুনিতে পাইল। জ্যাঠাইমার জন্য তাহার প্রথম হইতেই বার বার মনের ভিতরে উৎকণ্ঠা ছিল এবং এই লইয়া মাতা-পুত্রে যে একটা কলহ হইবে সে আশঙ্কাও করিয়াছিল। কিন্তু বেণী যে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন করিয়া অপমান ও নির্য্যাতন করিবে এই কথাটা সহসা তাহার কাছে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে

হইল এবং পরমুহূর্তেই তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, ও-বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে; কারণ, যে লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাছ-বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না। কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। সেদিন দীনুর কাছে এবং কাল মাস্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারী একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ মূঢ়তা ও সহস্র প্রকার কদর্য্য ক্ষুদ্রতার ভিতরে এক জ্যাঠাইমার হৃদয়টুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই মুখুয্যে-বাটীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাস—তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হোক—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আবার এই ঘটনায় তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত মন ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসী ও বোনঝিতে মিলিয়া যে অন্যায় করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু এই দুইটা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে বা সে কি করিবে এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে তাহাও কোনমতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। মুখুয্যে ও ঘোষালদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্য্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্য্যদের বাটীর পিছনে 'গড়' বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। এক সময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল, ক্রমশঃ সংস্কার অভাবে বুজিয়া গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না। কই, মাগুর প্রভৃতি যে-সকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু ছিল। ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল, ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, সরকার-মশাই, লোক পাঠাননি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্ছে যে!

সরকার কলম কানে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে ধরাচ্ছে?

আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয্যেদের খোট্টা দরোয়ানটাও আছে দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগ্‌গির পাঠান।

গোপাল কিছু মাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, আমাদের বাবু মাছ-মাংস খান না।

ভৈরব কহিল, নাই খেলেন, কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত!

গোপাল বলল, আমরা পাঁচজন ত চাই, বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন। কিন্তু রমেশবাবু একটু আলাদা ধরনের। বলিয়া ভৈরবের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া, সহাস্যে একটুখানি শ্লেষ করিয়া কহিল, এ ত তুচ্ছ দুটো সিঙ্গি-মাগুর

মাছ, আচায্যিমশাই! সেদিনের হাটের উত্তরদিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দু-ঘরে ভাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কি করব বাবু? আমার রমেশবাবু আর মুখটা একবার তোলবারও ফুরসত পেলেন না। তারপর পীড়াপীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বললেন, কাঠ? তা আর কি তেঁতুলগাছ নেই? শোন কথা! বললুম, থাকবে না কেন। কিন্তু ন্যায্য অংশ ছেড়ে দেবেনই বা কেন, আর কে কোথায় এমন দেয়? রমেশবাবু বইখানা আবার মেলে ধরে মিনিট-পাঁচেক চুপ করে থেকে বললেন, সে ঠিক। কিন্তু দুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া করা যায় না!

ভৈরব অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বলেন কি!

গোপাল সরকার মৃদু হাসিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া কহিল, বলি ভাল, আচায্যিমশাই, বলি ভাল। আমি সেই দিন থেকে বুঝেচি, আর মিছে কেন! ছোটতরফের মা-লক্ষ্মী তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্ধান হয়েছেন!

ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু পুকুরটা যে আমার বাড়ির পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।

গোপাল কহিল, বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দিবারাত্রি বই নিয়ে থাকলে, আর শরিকদের এত ভয় করলে কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়? যদু মুখুয্যের কন্যা—স্ত্রীলোক, সে পর্য্যন্ত শুনে হেসে-কুটিপাটি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে ডেকে না কি সেদিন তামাশা করে বলেছিল, রমেশবাবুকে ব'লো, একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে। এর চেয়ে লজ্জা আর আছে? বলিয়া গোপাল রাগে-দুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বাটীতে স্ত্রীলোক নাই। সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙা ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে উত্তেজিত করিবার জন্য সে সম্পত্তি-রক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িবামাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া ঘুমন্ত বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, কি, রোজ রোজ চালাকি নাকি! ভজুয়া?

তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই চালাকিটা যে কাহার তাহা সে ঠাহর করিতে পারিল না। ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অত্যন্ত বলবান ও বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া হুকুম করিয়া দিল—সমস্ত

মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেউ বাধা দেয় তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি না আনা সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার একপাটি দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে।

ভজুয়া ত এই চায়। সে তাহার তেলে-পাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাংলাদেশের তেলে-জলে মানুষ; হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচিকে মোটে ভয় করে না। কিন্তু ঐ যে অতি দৃঢ়কায় বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথা কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে ভৈরবের তালু পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিক শুভানুধ্যায়ী, তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময় মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া সকার-বকার চীৎকার করিয়া দুটা কৈ-মাগুর ধরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত তাহার হইল না। গালিগালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব যদি বা একটা হুঙ্কার দিলেন, ভৃত্যটা তাহার ঠোঁটটুকু পর্য্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক, ফৌজদারীতে জড়াইবার মত তাহার সাহসও নাই, সঙ্কল্পও ছিল না। মুহূর্ত্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ড হাতে ভজুয়া ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই ভৈরব অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—ওরে ভোজো, যাস্‌নে। বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ একদণ্ডও বাঁচব না।

রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই। ভজুয়া অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, এ কথা ঢাকা থাকবে না বাবা। বেণীবাবুর কোপে পড়ে তাহলে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘরদোর পর্য্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষা করতে পারবে না।

রমেশ ঘাড় হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, কথাটা ঠিক বাবু।

রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুয়াকে তাহার নিজের কাজে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার আকারেই এই ভৈরব আচার্য্যের অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্য্যামীই দেখিলেন।

হাঁ রে যতীন, খেলা করছিস, ইস্কুলে যাবিনে ?

আমাদের যে আজ-কাল দু'দিন ছুটি দিদি।

মাসী শুনিতে পাইয়া কুৎসিত মুখ আরও বিশ্রী করিয়া বলিলেন, মুখপোড়া ইস্কুলের মাসের মধ্যে পনর দিন ছুটি। তুই তাই ওর পিছনে টাকা খরচ করিস্, আমি হ'লে আগুন ধরিয়ে দিতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন ষোল আনা মিথ্যাবাদিনী বলিয়া যাহারা মাসীর অখ্যাতি প্রচার করিত তাহারা ভুল করিত। এমন এক-আধটা সত্য কথা বলিতেও তিনি পারিতেন এবং আবশ্যক হইলে করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

রমা ছোট ভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি কেন রে যতীন ?

যতীন দিদির কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্চে যে। তারপর চুনকাম হবে—কত বই এসেচে, চার-পাঁচটা চেয়ার টেবিল, একটা আলমারি, একটা খুব বড় ঘড়ি একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি ?

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রে !

হাঁ দিদি, সত্যি। রমেশবাবু এসেচেন না—তিনি সব ক'রে দিচ্ছেন। বলিয়া বালক আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুমুখে মাসীকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া এই ছোট-ভাইটির মুখ হইতে রমেশের ইস্কুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই-এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া যান, তাহাও শুনিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে যতীন, তোকে তিনি চিনতে পারেন ?

বালক সগর্ব্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ—

কি ব'লে তুই তাঁকে ডাকিস ?

এইবার যতীন একটু মুস্কিলে পড়িল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ হেডমাস্টার পর্য্যন্ত যেরূপ তটস্থ হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। ডাকা ত দূরের কথা—ভরসা করিয়া ইহারা কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিদির কাছে স্বীকার করাও ত সহজ নহে। ছেলেরা মাস্টারদিগকে 'ছোটবাবু' বলিয়া ডাকিতে শুনিযাছিল। তাই সে বুদ্ধি খরচ করিয়া কহিল, আমরা ছোটবাবু বলি। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুঝিতে

কিছু বাকী রহিল না। সে ভাইকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, ছোটবাবু কি রে! তিনি যে তোর দাদা হ'ন। বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস্, এঁকে তেমনি ছোটদা বলে ডাকতে পারিস্‌নে?

বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল—আমার দাদা হ'ন তিনি? সত্যি বলচ দিদি?

তাই ত হয় রে—বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখনি প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু ইস্কুল যে বন্ধ। এই দুটা দিন তাহাকে কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তবে যে-সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই বা সে থাকে কি করিয়া! সে আর একবার ছটফট্ করিয়া বলিল, এখন যাব দিদি?

এত বেলায় কোথায় যাবি রে? বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া যতীন খানিকক্ষণ অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এমনি বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাক্‌তে যতীন? বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। বালক হইলেও সে তাহার দিদির কণ্ঠস্বরের কি-রকম একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে প্রাণতুল্য ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাস কখনও প্রকাশ পাইত না।

যতীন প্রশ্ন করিল, ছোটদার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল, হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি করে তুমি জানলে?

প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে সে কিংবা গ্রামের আর কেহ কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই তাহাও নয়, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখাপড়ার জন্য এই অত্যল্পকালের মধ্যেই এরূপ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূর্খ নয়।

যতীন এ লইয়া আর জিদ করিল না। কারণ ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেই চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আচ্ছা দিদি, ছোটদা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না? বড়দা ত রোজ আসেন।

প্রশ্নটা ঠিক যেন আকস্মিক তীক্ষ্ণ ব্যথার মত রমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তথাপি হাসিয়া কহিল, তুই তাকে ডেকে আনতে পারিস্ নে?

এখনই যাব দিদি? বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওরে, কি পাগলা ছেলে রে তুই, বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভয়-ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। খবরদার যতীন, কখ্খনো এমন কাজ করিস্‌নে ভাই, কখ্খনো না। বলিয়া ভাইটিকে সে যেন প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতি দ্রুত হৃদ্‌কম্পন স্পষ্ট অনুভব করিয়া যতীন বালক হইলেও এবার বড় বিস্ময়ে দিদির মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একে ত এমনধারা করিতে কখনও সে পূর্ব্বে দেখে নাই, তা ছাড়া ছোটবাবুকে ছোটদাদা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অন্যপথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাঁহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। এমন সময়ে মাসির তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে আসিতেই রমা যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনতিকাল পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি বলি বুঝি, রমা ঘাটে চান করতে গেছে! বলি একাদশী বলে কি এতটা বেলা পর্য্যন্ত মাথায় একটু তেল-জলও দিতে হবে না? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

রমা জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি যাও মাসী, আমি এখনই যাচ্ছি।

যাবি আর কখন? বেরিয়ে দেখ্‌গে যা বেণীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।

মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসীর অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের উপর মহা কোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা বড় ঝুড়ির প্রায় এক ঝুড়ি। ভাগ করিবার জন্য বেণী নিজেই হাজির হইয়াছেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই—কি মাছ পড়ল হে বেণী। বলিয়া লাঠি হাতে ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিলেন।

তেমন আর কই পড়ল। বলিয়া বেণী মুখখানা অপ্রসন্ন করিলেন। জেলেকে ডাকিয়া কহিলেন, আর দেরি করচিস্ কেন রে? শীগ্‌গির করে দু-ভাগ করে ফেল না।

জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কি হচ্চে গো রমা? অনেকদিন আসতে পারিনি। বলি, মায়ের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই, বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী বাড়ি ঢুকিলেন।

আসুন, বলিয়া রমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

এত ভিড় কিসের গো? বলিয়া গাঙ্গুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য হইয়া গেলেন--ব্যস! তাই ত গা—মাছ বড় মন্দ ধরা পড়েনি দেখচি। বড় পুকুরে জাল দেওয়া হ'ল বুঝি?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহুল্য মনে করিয়া মৎস্য বিভাগের প্রতি ঝুঁকিয়া রহিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা সমাধা হইয়া গেল। বেণী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকুই চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া ধীবরের প্রতি একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিল এবং মুখুয্যেদের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথার সমান উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে, একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এমন দুশমনের মত যে, সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেও মনে থাকে। গ্রামের ছেলে-বুড়া সবাই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল, এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবি গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কর্ত্রী বলিয়া চিনিল তাহা সেই জানে, দূর হইতে মস্ত একটা সেলাম করিয়া 'মা-জী' বলিয়া সম্বোধন করিল এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা যেমনই হোক, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দী-বাঙলা মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশবাবুর ভৃত্য এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। রমা বিস্ময়ের প্রভাবেই হোক, বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক সহসা উত্তর দিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেণীর ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, এহ যাও মাৎ।

চাকরটা ভয়ে চার পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। আধ-মিনিট পর্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই, তখন বেণী সাহস করিল। যেখানে ছিল সেইখান হইতে বলিল, কিসের ভাগ?

ভজুয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটা সেলাম দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, বাবুজী, আপকো নেহি পুছা।

মাসী অনেক দূরে রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝন্ ঝন্ করিয়া বলিলেন, কি রে বাপু মারবি না কি!

ভজুয়া এক মুহূর্ত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, পরক্ষণে তাহার ভাঙ্গা গলার

ভয়ঙ্কর হাসিতে বাড়ি ভরিয়া উঠিল। খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু প্রায় লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, মা-জী? তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সম্ভ্রমের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুকান ছিল, রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল বলিল, কি চায় তোর বাবু?

রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুয়া হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য সেই কর্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলো লোকের সুমুখে রমা হীন হইতেও পারে না। তাই কটুকণ্ঠে কহিল, ঘোষ বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বলগে যা, যা পারে তাই করুক গে।

বহুৎ আচ্ছা মা-জী। বলিয়া ভজুয়া তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেণীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেও প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহার ব্যবহারে বাড়িসুদ্ধ সকলেই যখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া হিন্দি-বাঙলায় মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্য ক্ষমা চাহিল এবং কহিল, মা-জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুরধার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্যে বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। বাবুজী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু—বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বুকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয়ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন, বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভজুয়া, যা, মা-জীকে জিজ্ঞেস করে আয় ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না, বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিসুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, বাবুজী বলে দিলেন—আর যে যাই বলুক ভজুয়া, আমি নিশ্চয় জানি মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুটাবাত বার হবে না—সে কখনও পরের জিনিস ছোঁবে না, বলিয়া সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবামাত্র বেণী মেয়েলি সরু গলায় আস্ফালন করিয়া কহিলেন, এমনি করিয়া উনি বিষয় রক্ষে করবেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করছি, আমি আজ থেকে গড়ের একটা শামুক-গুগলিতেও ওকে হাত দিতে দেব না, বুঝলে না রমা, বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। মা-জীর মুখ হইতে কখনো ঝুটা বাত বাহির হইবে না—ভজুয়ার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝমাঝম্ শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল।

তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল যেন কোথাও এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। শুধু এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আঁচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৮

জ্যাঠাইমা!

কে, রমেশ? আয় বাবা, ঘরে আয়। বলিয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। ঘরে পা দিয়াই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ, জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। তাহার ভারী একটা চিত্তজ্বালার সহিত মনে হইল, ইহারা মাসীকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ত্রুটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জার মত নিভৃতে কাছে আসিয়াও বসে। এদিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাগমে রমারও অবস্থাসঙ্কট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এ গ্রামের মেয়ে তাই নয়, রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটা এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও লজ্জা করে, না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তা ছাড়া মাছ লইয়া এই যে সেদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাই সবদিক বাঁচাইয়া যতটা পারা যায় সে আড় হইয়া বসিয়াছিল। রমেশ আর সেদিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া ধীরে-সুস্থে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?

রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এলে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়!

জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয়ত শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে, উভয়েই বিস্মিত ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

বালাই ষাট! ওকি কথা বাপ! বলিয়া বিশ্বেশ্বরীর চোখ দুটি যেন ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

রমেশ শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বেশ্বরী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না—বাবা?

রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বার-দুই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি শীঘ্রই খারাপ হয়? তা নয়, শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ড টিকতে পাচ্ছিনে, সমস্ত প্রাণটা যেন আমার থেকে থেকে খাবি খেয়ে উঠচে।

শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তোর জন্মস্থান—এখানে টিঁকতে পারছিস্‌নে কেন বল্ দেখি?

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আমি বলতে চাইনে। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জান।

বিশ্বেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সব না জানলেও কতক জানি বটে। কিন্তু সেই জন্যেই ত বলচি, তোর আর কোথাও গেলে চলবে না রমেশ।

রমেশ কহিল, কেন চলবে না জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চায় না।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, চায় না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ডাল-রুটি-খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্যে?

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। আজ কেন যে তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যে পথটা বরাবর স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আট-দশ বৎসর পূর্ব্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে—প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতে সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্য সময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সন্তর্পণে ইহারা পার হয়, কিন্তু বর্ষাকালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটা বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙা তালের ঢোঙা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহারা, আছাড় খাইয়া, হাত-পা ভাঙিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখ সত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্য্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টামাত্র করে নাই। মেরামত করিতে টাকা-কুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই টাকাটা রমেশ নিজে না দিয়া চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আট-দশদিন পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আট-দশটা পয়সা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসিবার সময় পথের ধারে

সেকরাদের দোকানের ভিতরে এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কানে যাওয়ায় সে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, একটা পয়সা কেউ তোরা দিস্‌নে। দেখচিস্‌নে, ওর নিজের গরজটাই বেশী। জুতো পায়ে মসমসিয়ে চলা চাই কিনা! না দিলেও আপনি সারিয়ে দেবে তা দেখিস্! তা ছাড়া এতকাল যে ও ছিল না, আমাদের ইস্টিশান যাওয়া কি আটকে ছিল?

কে আর-একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুজ্যেমশায় বলছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। খোশামোদ করে দুটো বাবু বাবু করতে পারলেই বাস।—তখন হইতে সারা সকালবেলাটা এই দুটো কথা তাহাকে যেন আগুন দিয়া পোড়াইতেছিল।

জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই ঘা দিলেন। বলিলেন, সে ভাঙনটা যে সারাবার চেষ্টা করছিলি তার কি হ'ল?

রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, সে হবে না জ্যাঠাইমা·কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, দেবে না বলে কি হবে না রে? তোর দাদামশায়ের ত তুই অনেক টাকা পেয়েচিস্—এই ক'টা টাকা তুই ত নিজেও দিতে পারিস্।

রমেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, কহিল, কেন দেব? আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ গাঁয়ের কারো জন্যে কিছু করতে নেই। রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল, এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে; ভাল করলে গরজ ঠাওরায়; ক্ষমা করাও মহাপাপ, ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল।

জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখ-মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ রাগ করিয়া কহিল, হাসলে যে জ্যাঠাইমা?

না হেসে করি কি বল্ ত বাছা? বলিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিস্ রমেশ, বল্ দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে? একটু থামিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল—তা যদি জানিস্ রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েচেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক্ বাবা।

কিন্তু এরা যে আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তাই থেকেই কি বুঝতে পারিস্‌নে বাবা, এরা তোর রাগ-অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখবি সমস্তই এক।

সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে আছ মা?—হ্যাঁ রমেশ, তোরা দু'ভাই-বোন কি কথাবার্তা বলিস্‌নে?—না মা সে ক'রো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা হয়ে গেছে সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দু'জনে মনান্তর করে থাকলে ত কিছুতেই চলবে না।

রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনান্তর রাখতে চাইনে জ্যাঠাইমা!

অকস্মাৎ তাহার মৃদুকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকো না জ্যাঠাইমা। সেদিন কোন গতিকে ওর মাসীর হাতে প্রাণে বেঁচেছ, আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তিনি বাড়ি ফিরবেন, বলিয়াই কোন-রূপ বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিলেন, যাস্‌নে রমেশ, কথা শুনে যা!

রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, না জ্যাঠাইমা, যারা অহঙ্কারের স্পর্দ্ধায় তোমাকে পর্য্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি ব'লো না, বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্ব্বেই চলিয়া গেল।

বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত্ত বিশ্বেশ্বরীর পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসীকে শিখিয়ে দিই, না তার জন্য আমি দায়ী?

জ্যাঠাইমা তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, শিখিয়ে যে দাও না এ কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর জন্যে দায়ী তোমাকে কতকটা হতে হয় বৈ কি মা!

রমা অন্য হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজে অস্বীকার করিয়া বলিল, কেন দায়ী? কখ্‌খনো না। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি মিথ্যে দোষ দিয়ে অপমান করে গেলেন?

বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, সকলে ত ভেতরের কথা জানতে পারে না মা। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখনো নেই, এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি ত জান না মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েচি, তোমার ওপর কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস; সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে দু'ঘরে যখন ভাগ করে নিলে, তখন ও কারো কথায় কান দেয়নি যে ওর তাতে অংশ ছিল। তাদের মুখের ওপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই—রমা যখন আছে তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি

পাবই, সে কথনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি মা, এত বিবাদ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর সেই বিশ্বাসই ছিল যদি না সেদিন গড়পুকুরে—

কথাটার মাঝখানেই বিশ্বেশ্বরী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আনত শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, আজ একটা কথা বলি মা তোমাকে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশী। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই মা সেই জিনিসটিকে তোমরা চারিদিক থেকে ঘা মেরে নষ্ট করে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলচি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।

রমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। খানিক পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেলা গেল, আজ বাড়ি যাই জ্যাঠাইমা, বলিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

৯

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ি পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার সমস্ত উত্তাপ যেন জল হইয়া গেল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল—এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কি কষ্টই না পাইতেছিলাম। বাস্তবিক, রাগ করি কাহার উপর? যাহারা এতই সঙ্কীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেও জানে না, শিক্ষার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বল-ক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বল-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছুই হইতে পারে না। তাহার মনে পড়িল, দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া কতবার ভাবিয়াছে— আমাদের বাঙালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে, যাহা বহুজনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট সরল গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙালীর সত্যকার ঐশ্বর্য্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায় রে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরশ্রীকাতরতা

চোখে পড়ে নাই! নগরের সজীব-চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে, তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মত রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আজিও সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে! ধর্ম্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে। অথচ সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতধর্ম্ম নাই বলিয়া শহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা অশ্রদ্ধারও অন্ত নাই।

রমেশ বাড়িতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটি এগার-বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া লিখিতেছিল; উঠিয়া আসিয়া কহিল, ছেলেটি দক্ষিণপাড়ার দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য এসেচে।

ভিক্ষার নাম শুনিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি শুধু ভিক্ষা দিতেই বাড়ি এসেছি সরকারমশাই? গ্রামে কি আর লোক নেই?

গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা বাবু! কিন্তু কর্ত্তা ত কখনও কারুকে ফেরাতেন না, তাই দায়ে পড়লেই এই বাড়ির দিকেই লোক ছুটে আসে।

ছেলেটির পানে চাহিয়া প্রৌঢ়াটিকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, হ্যাঁ কামিনীর মা, এদের দোষও ত কম নয় বাছা! জ্যান্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত করে দিলে না, এখন মড়া যখন ওঠে না, তখন টাকার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে! ঘরে ঘটিটা-বাটিটাও কি নেই বাপু?

কামিনীর মা জাতিতে সদ্‌গোপ, এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশ্বেস না হয় বাপু, গিয়ে দেখবে চল। আর কিছু থাকলেও কি মরা-বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি! চোখে না দেখলেও শুনেচ ত সব? এই ছ'মাস ধরে আমার যথাসর্ব্বস্ব এই জন্যই ঢেলে দিয়েচি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে!

রমেশ এই ব্যাপারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার;

তখন বুঝাইয়া কহিল, এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্তী ছয় মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ শব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয় মাসকাল তাহার সর্ব্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহারও কিছু নাই। সে জন্যে ছেলেটিকে লইযা আপনার কাছে আসিয়াছে।

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেলা ত প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয় মড়া পড়েই থাকবে?

সরকার হাসিয়া কহিল, উপায কি বাবু? অশাস্ত্রর কাজ ত আর হতে পাবে না। আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন—যা হোক, মড়া পড়ে থাকবে না, যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে—হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?

ছেলেটি মুঠা খুলিযা একটি সিকি ও চারিটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা কহিল, সিকিটি মুখুয্যেরা দিযেচে, আর পয়সা চারিটি হালদারমশাই দিযেচেন। কিন্তু যেমন করেই হোক ন'সিকের কমে ত হবে না। তাই, বাবু যদি—

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তোমরা বাড়ি যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে লোক পাঠিযে দিচ্চি। তাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত দুই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, এমন গরীব এ-গাঁয়ে আর কয় ঘর আছে জানেন আপনি?

সরকার কহিল, দু'-তিন ঘর আছে, বেশী নেই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল বাবু, শুধু একটা চালতা গাছ নিয়ে মামলা করে দ্বারিক চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা, দু-ঘরই বছর-পাঁচেক আগে শেষ হয়ে গেল। গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, এতদূর গড়াত না বাবু, শুধু আমাদের বড়বাবু আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী দুজনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা করে তুললেন।

তারপর?

সরকার কহিল, তারপর আমাদের বড়বাবুর কাছেই দু-ঘরের গলা পর্য্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েচেন। হাঁ, চাষার মেযে বটে ওই কামিনীর মা। অসময়ে বামুনের যা করলে এমন দেখতে পাওযা যায় না।

রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর গোপাল সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে বলিল, তোমার আদেশই মাথায় তুলে নিলাম জ্যাঠাইমা! মরি এখানে সেও ঢের ভালো কিন্তু এ দুর্ভাগা গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।

১০

মাস-তিনেক পরে একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুষ্করিণীটিকে দুধ-পুকুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে এমনি অভিভূত হইয়া অভদ্রভাবে তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাড়াইয়া রহিল যে, তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কথা মনে হইল না। মেয়েটির বয়স বোধ করি কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে যে?

রমেশের বিস্ময়ের অবধি ছিল না, কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। এক পাশে সরিয়া দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাকে চেনেন?

মেয়েটি কহিল, চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন?

রমেশ কহিল, আজই ভোরবেলা। আমার মামার বাড়ি থেকে মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা আসেননি।

এখানে কোথায় আছেন?

রমেশ কহিল, কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি। কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। যেখানে হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।

সঙ্গে চাকর আছে ত?

না, আমি একাই এসেছি।

বেশ যা হোক, বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দুজনের চোখাচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে বোধ করি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, তবে আমার সঙ্গেই আসুন, বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল, আমি যেতে পারি, কেন না, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। আপনার পরিচয় দিন।

তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পুজোটা সেরে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব, বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল। একি ভীষণ উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ

করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল ; তাহার মুখ, গঠন, প্রতি পদক্ষেপ পর্য্যন্ত রমেশের পরিচিত ; অথচ বহুদিন-রুদ্ধ স্মৃতির কবাট কোনমতেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল না।

আধ-ঘণ্টা পরে পূজা সারিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আসিল রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল ; কিন্তু তেমনিই অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য প্রাকারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই ?

মেয়েটি উত্তর দিল, না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।

কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল, নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হ'ত। আমি রমা।

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া পান দিয়া বিশ্রামের জন্য নিজের হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া রমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সেই শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রমেশের মনে হইল, তাহার এই তেইশ বর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বিদেশে পরাশ্রয়ে কাটিয়াছে। খাওয়াটার মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোন অবস্থাতেই থাকিতে পারে ইহা সে জানিতই না। তাই আজিকার এই অচিন্তনীয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে মাধুর্য্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাহার আহারের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিতান্ত সাধারণ ভোজ্য ও পেয় দিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইয়াছে। এই জন্য তাহার বড় ভাবনা ছিল পাছে তাহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিন্দা হয়। হায় রে পর ! হায় রে তাদের নিন্দা ! খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা যে তাহার নিজের কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ব্ববিধ দ্বিধা-সঙ্কোচ সজোরে ছিনাইয়া লইয়া, এই খাওয়ার জায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ-কথা কেমন করিয়া আজ সে তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে ! আজ ত কোন লজ্জার বাধাই তাহাকে দূরে রাখিতে পারিল না ! এই আহার্য্যের স্বল্পতার ত্রুটি শুধু যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সুমুখে আসিয়া বসিল। আহার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়েও কত বেশী, তাহা আর কেহ যদি না জানিল, যিনি সব জানেন তাঁহার কাছে ত গোপন রহিল না।

দিবানিদ্রা রমেশের অভ্যাস ছিল না। তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে

নববর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল। অর্দ্ধনিমিলীত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা না-আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মৃদুকণ্ঠ তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আজ যখন বাড়ি যাওয়া হবে না, তখন এইখানেই থাকুন।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু যাঁর বাড়ি তাঁকে এখনো ত দেখতে পেলাম না। তিনি না বললে থাকি কি করে?

রমা সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তর করিল, তিনি বলচেন থাকতে। এ বাড়ি আমার।

রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ স্থানে বাড়ি কেন?

রমা বলিল, এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই বটে, কিন্তু এমন সময় সময় হয় যে, পা বাড়াবার জায়গা থাকে না।

রমেশ কহিল, বেশ ত, তেমন সময় নাই এলে?

রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তারকনাথ ঠাকুরের উপর বোধ করি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা বলিল, তেমন ভক্তি আর কই? কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত!

রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে আপনি কি খান?

রমেশ হাসিয়া কহিল, যা জোটে তাই খাই। আমার খেতে বসবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

রমা কহিল, এত বৈরাগ্য কেন?

ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল, না। এ শুধু আলস্য।

কিন্তু পরের কাজে ত আপনার আলস্য দেখিনে?

রমেশ কহিল, তার কারণ আছে। পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হয়। নিজের কাজেও হয়ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয়।

রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন, কিন্তু যাদের নেই?

রমেশ বলিল, তাদের কথা জানিনে রমা। কেন না, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেবারও কোন ধরাবাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা না-থাকার হিসেব তিনিই জানেন যিনি ইহ-পরকালের ভার নিয়েচেন।

রমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু পরকালের চিন্তা করবার বয়স ত আপনার হয়নি। আপনি আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।

রমেশ হাসিয়া বলিল, তার মানে তোমার আরও হয়নি। ভগবান তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক, কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে আজই যে আমার শেষ দিন নয়, এ কথা কখনও মনে করিনে।

তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল, তাহা বোধ করি বৃথা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আপনাকে সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে ত দেখলুম না। মন্দিরের মধ্যে কি আছে না-আছে, তা না হয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে বসে গণ্ডূষ করাটাও কি ভুলে যাচ্ছেন?

রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল, ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করিনে। কিন্তু এ-কথা কেন?

রমা বলিল, পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশী কিনা, তাই জিজ্ঞেসা করচি।

রমেশ ইহার জবাব দিল না। তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। রমা আস্তে আস্তে বলিল, দেখুন আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোন দিন কামনা করে না। বলিয়া আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি মরবার জন্যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি তা সত্যি নয় বটে, কিন্তু বেশীদিন বেঁচে থাকবার কথা মনে হলেও আমাদের ভয় হয়। কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও ত সে কথা খাটে না! আপনাকে জোর করে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা, কিন্তু সংসারে ঢুকে যখন পরের জন্যে মাথাব্যথা হওয়াটা নিজেরই নিতান্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হবে, তখন আমার এই কথাটি স্মরণ করবেন।

প্রত্যুত্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল, —আমি তোমাকে স্মরণ করেই বলচি, আজ আমার এ কথা কোনমতেই মনে হচ্চে না। আমি তোমার ত কেউ নই রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী বলে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার ত মনে হয় পরের দুঃখ কষ্ট দেখলে তারা পাগল হয়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা বসে চুপ করে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েচ। এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোন দিন খাওয়ায়নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।

কথা শুনিয়া রমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল ; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল, এ ভুলতে আপনার বেশী দিন লাগবে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ বলেই মনে পড়বে।

রমেশ কোন উত্তর করিল না।

রমা কহিল, দেশে গিয়ে যে নিন্দে করবেন না, এই আমার ভাগ্য।

রমেশ আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না রমা, নিন্দেও করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতির বাইরে।

রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জ্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

১১

দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্ণবেলায় একটু ধরণ করিয়াছে। চণ্ডী-মণ্ডপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারীর হিসাবপত্র দেখিতেছিল ; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটবাবু, এ-যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষা করতে হবে।

রমেশ অবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কি ?

চাষারা কহিল, একশ' বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। একশ' বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্ব্বধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তরধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দুশ' টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষীরা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া

তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন ; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে ত আর চলবে না, এখনি সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।

বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কোন্ বাঁধটা ?

রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর কটা আছে বড়দা ? না কাটলে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন।

বেণী কহিল, সেই সঙ্গে দু-তিন শ' টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি ? এ টাকাটা দেবে কে ? চাষারা, না তুমি ?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরীব, তারা দিতে ত পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেব সে ত বুঝতে পারিনে !

বেণী জবাব দিল, তা হলে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে ত আমি বুঝতে পারিনে।

হালদারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, খুড়ো, এমনি করে ভায়া আমার জমিদারী রাখবেন ! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দরোয়ান নেই ? তার পায়ের নাগরা-জুতো নেই ? যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা কর গে, জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে। বলিয়া বেণী হালদারের সঙ্গে একযোগে হিঃ হিঃ করিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিলেন।

রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল, ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দুশ' টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বেণী হাতটা উল্টাইয়া বলিলেন, হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও ত দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্যে দু-দুশ' টাকা উড়িয়ে দিতে হবে ?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কি ?

যেন ভারি হাসির কথা ! বেণী একবার এপাশ একবার ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, থুথু ফেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিল, খাবে কি ? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে চল, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধটুকরা উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে-চেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে

খেয়ে-দেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কি? ধার কর্জ্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল, আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম, তার মত হ'লে আপনার একার অমতে কিছু হবে না।

বেণীর মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন, বেশ, গিয়ে দেখ গে তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া, তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি ত ছেলেমানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে করে তবে ছেড়েছিল। কি বল খুড়ো?

খুড়োর মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না। বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না, নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসীর সেই প্রথম দিনের নিষেধ-বাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। দু'জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেচ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল, সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে? তা ছাড়া বড়দার মত নেই।

নেই জানি। তাঁর একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, জল বার করে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ কহিল, অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তা হলে অনুমতি দিলে?

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই।

বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

রমা মুখ তুলিয়াই বোধ করি রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল, তা ছাড়া, বিষয় আমার ভাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ কহিল, না, অর্দ্ধেক তোমার।

রমা বলিল, শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে, তাই অর্দ্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা, এ ক'টা টাকা? তোমার অবস্থা এ-দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্ছি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিও না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবে জবাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

তাহার মৃদুস্বরে বিদ্রূপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি! চিরকাল ভেবেচি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে, কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি নীচ, অতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কি আমি?

রমেশ কহিল, তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েচ বলেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে একথা বলতে পারেননি, পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর মুখে যা বেধেচে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশী ক্ষতিপূরণ করতে পারি—কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশী। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত, তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমার দুর্ব্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কি করব, তাও এই সঙ্গে

জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনই জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা করগে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে, কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না।

রমেশ প্রশ্ন করিল, কেন?

রমা কহিল, কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

তাহার মুখ যে কিরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ্য করিতে পারিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, একটু ভাবলেই তা টের পাবে। কিন্তু তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই। যাই হোক, বাগ্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চললুম।

মাসী উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ-সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই জল-কাদায় সন্ধ্যার পর কোথায় যাস্ রমা?

একবার বড়দার ওখানে যাব মাসী।

দাসী কহিল, পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। ছোটবাবু এমনি রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েচেন যে, সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরীব দুঃখী সাপের হাত থেকে বেহাই পেয়ে বেঁচেচে।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা গলায় অনুনয় করিতেছেন, কথা শোন্ আকবর, থানায় চল্। সাত সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল-বংশের ছেলে নই আমি। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা, তুমি একবার বল না, চুপ করে রইলে কেন?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, সাবাস! হা—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই ত বলচি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার হিন্দুস্থানী চাকরটার?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস্ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

আকবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই 'বাপ্' করে বসে পড়ল, বড়বাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা, সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে এতবড় লাঠিয়াল, একথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাক্‌রান, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সম্‌ঝে দেখ্‌রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক'য় সমুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদাল মারচে, ওদের মুণ্ডু কটা ফাঁক করে দিয়ে যাই!

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে—

তাহারা তিন বাপ-বেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়বাবু, চোখে দেখ্‌লি জানতি পারতে ছোটবাবু কি?

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

বেণী কহিল, না হয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেণ্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভাল করে আর একবার বুঝিয়ে বল না। এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, দিদিঠাকরান, ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোক মোরে সর্দ্দার কয় না? দিদিঠাকরান, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফৈরিদি হ'ব কোন কালামুয়ে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকরান, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না। ওঠরে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না। বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার অনুনয়, বিনয়, ভৎর্সনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড় অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়েও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল, ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়াছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

১২

ছেলেবেলায় একদিন রমেশ রমাকে ভালবাসিয়াছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষী ভালো-বাসা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যে কত গভীর সেদিন তারকেশ্বরে ইহা সে প্রথম অনুভব করিয়াছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশি করিয়াছিল যেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রমার সমস্ত সম্বন্ধ সে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তারপরে সেই নিদারুণ রাত্রির ঘটনার দিন হইতে রমার দিকটাই একেবারে রমেশের কাছে মহা-মরুর ন্যায় শূন্য ধূ ধূ করিতেছিল। কিন্তু সে যে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, শোয়া-বসা, এমন কি, চিন্তা-অধ্যয়ন পর্য্যন্ত এমন বিস্বাদ করিয়া দিবে, তাহা রমেশ কল্পনাও করেন নাই। তাহাতে গৃহ-বিচ্ছেদ এবং সর্ব্বব্যাপী অনাত্মীয়তায় প্রাণ যখন তাহার এক মুহূর্ত্ত আর গ্রামের মধ্যে তিষ্ঠিতে চাহিতেছিল না, তখন নিম্নলিখিত ঘটনায় সে আর একবার সোজা হইয়া বসিল।

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারী। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া রমেশের কাছে উপস্থিত হইল, এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিও তাহারা তাঁহাদেরই প্রজা, তথাচ তাহাদের ছেলেপিলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাস্টার মহাশয়রা কোনমতেই তাহাদের ছেলেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এমন অন্যায় অত্যাচার ত কখনও শুনিনি। তোমাদের ছেলেদের আজই নিয়ে এসো, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্ত্তি করে দেব।

তাহারা জানাইল, যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিঁদুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না, কিন্তু এক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ, ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের স্কুল করিতে ইচ্ছা করে এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়। কলহ-বিবাদে রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল। ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কুঁয়াপুরের হিন্দুপ্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি কথায় বিবাদ করে না, করিলেও তাহারা প্রতি হাত এক নম্বর রুজু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না।

বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচার-ফলই সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যেভাবেই হোক, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র-অভদ্র কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোন দিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অবস্থা পাশাপাশি তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসা দ্বেষের কারণ। অথচ মুসলমানমাত্রেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই, এবং হইতেও পারে না। আর জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমনকি ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পল্লীগ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহ বিবাদের লাঘব করিয়া সখ্য ও প্রীতি সংস্থাপনে প্রযত্ন করাও পণ্ডশ্রম। সুতরাং এই কয়টা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্য যে বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সেজন্য তাহার অত্যন্ত অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল, ইহারা এমনি খাওয়াখাওয়ি করিয়াই চিরদিন কাটাইয়াছে এবং এমনি করিয়াই চিরদিন কাটাইতে বাধ্য। ইহাদের ভালো কোন দিন কোনমতেই হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা পাকা করিয়া লওয়া ত চাই!

নানা কারণে অনেক দিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে সেদিকে যায় নাই। আজ ভোরে উঠিয়া সে একেবারে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা তিনি নিজেও জানিতেন না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়াই দেখিল, জ্যাঠাইমা এত প্রত্যূষেই স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের মেঝেয় বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম হইলেন না। বইখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত সকালেই যে রে?

রমেশ কহিল, অনেক দিন তোমাকে দেখতে পাইনি জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা স্কুল করচি।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, শুনেচি। কিন্তু আমাদের স্কুলে আর পড়াতে যাস্‌নে কেন বল্‌ ত?

রমেশ কহিল, সেই কথাই বলতে এসেচি জ্যাঠাইমা। এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রম। যারা কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, অভিমান অহঙ্কার যাদের এত বেশী, তাদের মধ্যে খেটে মরায় লাভ কিছুই নেই, শুধু মাঝ থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরং যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় সত্যিকারের মঙ্গল হবে, আমি সেইখানেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা কহিলেন, এ কথা ত নতুন নয় রমেশ। পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে কেউ নিজের ওপর নিয়েচে চিরদিনই তার শত্রু-সংখ্যা বেড়ে উঠেচে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায় তুইও তাদের দলে গিয়ে যদি মিশিস্ তা হলে ত চলবে না বাবা! এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েচেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস্?

রমেশ হাসিয়া কহিল, ঐ ছাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কানে উঠেচে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনি। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনে।

জ্যাঠাইমা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিসনে কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবিনে?

রমেশ কহিল, ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা। জাতিভেদ আছে তা মানি, কিন্তু একে ভাল বলে মানিনে।

কেন?

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন সে তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই? সমাজে যাকে ছোটজাত করে রাখা হয়েচে, সে যে বড়কে হিংসা করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে—সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করবার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সংসারিক নিয়ম আছে, আমরা তাকেই স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্চি। এই যে মানুষ গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলাফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হলে ভয় পেয়ে যেতে। মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টের পেতে। দেখতে পেতে কেমন করে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসচে এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেচে। তবু ত হিন্দুর হুঁশ হয় না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, তোর এত কথা শুনে এখনো ত আমার হুঁশ হচ্ছে না রমেশ। যারা তোদের মানুষ গুণে বেড়ায়, তারা যদি গুণে বলতে পারে, এতগুলো ছোটজাত শুধুমাত্র ছোট থাকবার ভয়েই জাত দিয়েচে, তা হলে হয়ত আমার হুঁশ হতেও পারে। হিন্দু যে কমে আসচে সে কথা মানি, কিন্তু তার অন্য কারণ আছে। সেটাও সমাজের ত্রুটি নিশ্চয়, কিন্তু ছোটজাতের জাত দেওয়া-দেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট বলে কোন হিন্দুই কোনদিন জাত দেয় না।

রমেশ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাই ত অনুমান করেন জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, অনুমানের বিরুদ্ধে ত তর্ক চলে না বাবা। কেউ যদি এমন

খবর দিতে পারে, অমুখ গাঁয়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্তেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হলেও না হয় পণ্ডিতদের কথায় কান দিতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।

রমেশ তথাপি তর্ক করিয়া কহিল, কিন্তু যারা ছোটজাত তারা যে অন্যান্য বড় জাতকে হিংসা করে চল্‌বে, এ ত আমার কাছে ঠিক কথা বলেই মনে হয় জ্যাঠাইমা!

রমেশের তীব্র উত্তেজনায় বিশ্বেশ্বরী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ঠিক কথা নয় বাবা, একটুকুও ঠিক কথা নয়। এ তোদের শহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড়, সে জন্যে কারো এতটুকু মাথাব্যথা নেই। ছোটভাই যেমন ছোট বলে বড়ভাইকে হিংসা করে না, দু-একবছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্ত্তও কায়েতের সমান হবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না! বড়ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোটভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমন কায়েতও বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙালীর যা মেরুদণ্ড—সেই পল্লী-গ্রামে নয়।

রমেশ মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ও-গাঁয়ে ত এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন করে ত চেপে ধরে না। সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্য্যন্ত যায়নি, সে ত তুমি জান!

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আছে বৈ কি বাবা! প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েচিস্‌ শুধু সেই পথে। তাইত তোকে কেবলি বলি, তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাস্‌নে।

প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, তুই বলবি মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তাদের সজীব ধর্ম্মই

তাদের সব দিকে শুধরে রেখেচে। একটা কথা বলি রমেশ, পিয়রপুরে খবর নিলে শুনতে পাবি, জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে করে রেখেছে। সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না বলে। কিন্তু আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তাঁর বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে। এ-সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্য, এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কিন্তু পল্লী-সমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক হইয়া গেল, অন্যদিকে তাহার মন ইহাকেই স্থির-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী তাহা যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ফলটাকেও উপায় বলে ভুল করিস্ নে বাবা! যে জন্যে তোর মন থেকে সংশয় ঘুচতে চাইচে না, সেই জাতের ছোট-বড় নিয়ে মারামারি করাটা উন্নতির একটা লক্ষণ, কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হলেই নয়, মনে করে যদি তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে যাস্, এদিক-ওদিক দুদিক নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কি না যদি যাচাই করতে চাস্ রমেশ, শহরের কাছাকাছি দু-চারখানা গ্রাম ঘুরে এসে তাদের সঙ্গে তোর এই কুঁয়াপুরকে মিলিয়ে দেখিস্—আপনি টের পাবি!

কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী দু-একখানা গ্রামের সহিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চেহারাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পর্দ্দা উঠিয়া গেল এবং গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া সে বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্ব্বানুবৃত্তিরূপে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাস্ নে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে, তারা যদি তোর মতই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।

রমেশের রমার কথা মনে পড়িল। তাই আবার অভিমানের সুরে কহিল, দূরে সরে যেতে আমারও আর দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী এই সুরটা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু হেতু বুঝিলেন না। কহিলেন, না রমেশ, সে কিছুতেই হতে পারবে না! যদি এসেচিস্, যদি কাজ শুরু করেচিস্, মাঝ-পথে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু ত আমার একার নয়?

জ্যাঠাইমা উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, তোর একার বৈ কি বাবা, শুধু তোরই মা! দেখতে পাস্‌নে, মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোন দিনই কিছু দাবী করেননি। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু তুই আসবামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি।

রমেশ আর তর্ক করিল না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে বিশ্বেশ্বরীর পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্তব্যের একান্ত নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্ব্বদিকে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইতে দেখিল রমার ছোট ভাই যতীন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় আরক্ত মুখে ডাকিতেছে, ছোড়দা।

রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাকচ যতীন?

আপনাকে।

আমাকে? আমাকে ছোড়দা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

দিদি।

দিদি? তিনি কি কিছু বলতে তোমায় পাঠিয়েছেন?

যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে করে তোর ছোড়দার বাড়িতে নিয়ে চল্—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল।

রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল, আজ আমার এ কি সৌভাগ্য! কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে, নিজে কষ্ট করে এলে কেন? এসো, ঘরে এসো।

রমা এবার ইতস্ততঃ করিল তারপর যতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, আজ একটা জিনিস ভিক্ষে চাইতে আপনার বাড়িতে এসেচি—বলুন, দেবেন? বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বরা অকস্মাৎ যেন উন্মাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিয়া একেবারে ভাঙিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তাহার মনের মধ্যে যে সকল সঙ্কল্প আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপরূপ দীপ্তিতে নাচিয়া ফিরিতেছিল—সমস্তই একেবারে নিবিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তথাপি প্রশ্ন করিল, কি চাই বল?

তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল, আগে কথা দিন।

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, তা পারিনে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই যে ভেঙে দিয়েচ রমা!

রমা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমি!

রমেশ বলিল, তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কারুর ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলব! ইচ্ছা হয় বিশ্বাস ক'রো, না হয় ক'রো না। কিন্তু জিনিসটা যদি না একেবারে মরে নিঃশেষ হয়ে যেত, হয়ত কোনদিনই একথা তোমাকে শোনাতে পারতাম না, বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া পুনরায় কহিল, আজ না কি আর কোন-পক্ষেরই লেশমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, তাই আজ জানাচ্চি, তোমাকে অদেয় আমার সেদিন পর্য্যন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জান?

রমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু সমস্ত অন্তঃকরণটা তাহার কেমন একটা লজ্জাকর আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, কিন্তু শুনে রাগ ক'রো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেয়ো না। মনে ক'রো, এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র।

রমা মনে মনে প্রাণপণে বাধা দিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মাথা তাহার এমনি ঝুঁকিয়া পড়িল যে, কিছুতেই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। রমেশ তেমনি শান্ত, মৃদু ও নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমাকে ভালবাসতাম রমা। আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালোবাসা বোধ কার কেউ কখনো বাসেনি; ছেলেবেলায় মার মুখে শুনতাম আমাদের বিয়ে হবে। তারপর যেদিন সমস্ত আশা ভেঙে গেল, সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার তা মনে পড়ে।

কথাগুলো জলন্ত সীসার মত রমার দুই কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল এবং একান্ত অপরিচিত অনুভূতির অসহ্য তীব্র বেদনায় তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু নিষেধ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত নিরুপায় পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রমা রমেশের বিষাক্ত-মধুর কথাগুলো একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

রমেশ কহিতে লাগিল, তুমি ভাবচ, তোমাকে এ সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে তখনো চুপ করে ছিলাম। কিন্তু সে চুপ করে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না, কহিল, তবে আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচ্চেন কেন?

রমেশ কহিল, অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদের কথা হচ্চে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই! যাই হোক, শোন। সেদিন আমার কেন জানিনে, অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন আমাকে ভালোবাসতে আজও তা একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় বসে আমাব সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব। তার পরে সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি বাইরে এত গোলমাল কিসেব?

বাবু—

গোপাল সরকারেব ত্রস্ত-ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরেব বাহিরে আসিতেই সে কহিল, বাবু, পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেচে।

কেন?

গোপালের ভয়ে ঠোঁট কাঁপিতেছিল, কোনমতে কহিল, পরশু রাত্তিরে রাধানগরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, আর এক মুহূর্ত্ত থেকো না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও; পুলিশ খানাতল্লাশি করতে ছাড়বে না৷

রমা নীলবর্ণ-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার কোন ভয় নেই ত?

রমেশ কহিল, বলতে পারিনে। কতদূর কি দাঁড়িয়েচে সে ত এখনো জানিনে।

একবার রমাব ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সেদিন তাহার নিজের অভিযোগ করা—তার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি যাব না।

রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্ত্তকাল অবাক থাকিয়া বলিল, ছি—এখানে থাকতে নেই রমা, শীগ্‌গির বেরিয়ে যাও, বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া যতীনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া এই দুটি ভাই-বোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

১৩

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতির আসামীর সঙ্গে ভজুয়া হাজতে। সেদিন থানাতল্লাশিতে রমেশের বাড়িতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং ভৈরব আচার্য্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে-রাত্রে ভজুয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়ের পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, তথাপি তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই!

বেণী আসিয়া কহিলেন, রমা, অনেক চাল ভেবে তবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে কি শত্রুকে সহজে জব্দ করা যায়! সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি হাতে করে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল, সে কথা যদি না তুমি থানায় লিখিয়ে রাখতে আজ কি তা হলে ঐ ব্যাটাকে এমন কায়দায় পাওয়া যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি আরও দুকথা বাড়িয়ে-গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস্ বোন—আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলিনে।

রমা এমনি ম্লান হইয়া উঠিল যে বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল, না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর্ তাই যদি হয় তাতেই বা কি! জমিদারী করতে গেলে কিছুতেই হটলে ত চলে না।

রমা কোন কথা কহিল না।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু তাকে ত সহজে ধরা চলে না! তবে সেও এবার কম চাল চালল না দিদি! এই যে নূতন একটা ইস্কুল করেচে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই তো মোছলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তা হলে জমিদারী থাকা না-থাকা সমান হবে, তা এখন থেকে বলে রাখচি।

জমিদারীর ভাল-মন্দ সম্বন্ধে রমা বরাবর বেণীর পরামর্শ মতই চলে; ইহাতে দুজনের কোন মতভেদ পর্য্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তর্ক করিল। কহিল, রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত এতে কম নয়!

বেণীর নিজেরও এ সম্বন্ধে খটকা অল্প ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহাই কহিল, কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়—আমরা দুজনে জব্দ হলেই ও খুশি। দেখচ না এসে পর্য্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? চারিদিকে ছোটলোকদের মধ্যে ছোটবাবু, ছোটবাবু, একটা রব উঠে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ, আমরা দু-ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশী দিন এ চলবে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া করে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ পর্য্যন্ত শেষ হতে হবে তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য্য

হইয়াই লক্ষ্য করিল, সংবাদটা শুনাইয়া তাহার কাছে যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনা আশা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। বরঞ্চ মনে হইল, সে হঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেয়েছেন?

বেণী কহিলেন, ঠিক জানিনে। কিন্তু জানতে পারবে। ভজুয়ার মকদ্দমায় সব কথাই উঠবে।

রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে উঠিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সে-ই যে সকলের অগ্রণী, এই সংবাদটা আর রমেশের অগোচর রহিবে না। খানিক পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়দা?

বেণী কহিল, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, শুনচি ওর দেখাদেখি আরও পাঁচ-ছটা গ্রামে স্কুল করবার, রাস্তা তৈরি করবার আয়োজন হচ্চে! আজকাল ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি করচে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা দুটো ইস্কুল আছে বলেই ওদের এত উন্নতি। রমেশ প্রচার করে দিয়েচে, সেখানে নূতন স্কুল হবে, সেইখানেই ও দু-শ' করে টাকা দেবে। ওর দাদামশায়ের যত টাকা পেয়েচে সমস্তই ও এইতে ব্যয় করবে। মোচলমানরা ত ওকে এটা পীর পয়গম্বর বলে ঠিক ক'রে বসে আছে।

রমার নিজের বুকের ভিতর এই কথাটা একবার বিদ্যুতের মত আলো করিয়া খেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না। সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচাযি এবার ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি করে তার মেয়ের বিয়ে দেয়, সে আমি একবার ভাল করে দেখব! আরও একটা ফন্দি আছে, দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে! তার পর দেশে ডাকাতি ত লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত, তার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশী বেগ পেতে হবে না। সেই যে প্রথম দিনটিতেই তুমি বলেছিলে রমা, শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না, সে যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে তা আমিও মনে করিনি।

রমা কোন কথাই কহিল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী এমন বর্ণে বর্ণে সত্য

হওয়ার বার্ত্তা পাইয়াও যে নারীর মুখ অহঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, বরঞ্চ নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে যে তাহার কি অবস্থা, সে কথা বুঝিবার শক্তি বেণীর নাই। তা না থাকুক, কিন্তু জিনিসটা এতই স্পষ্ট যে কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা ছিল না—তাহারও এড়াইল না। মনে মনে একটু বিস্ময়াপন্ন হইয়াই বেণী রান্নাঘরে যাইয়া মাসীর সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, রমা হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আচ্ছা বড়দা, রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদের নিজেদের ভারী কলঙ্কের কথা নয়?

বেণী অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন, কেন?

রমা কহিল, আমাদের আত্মীয়, আমরা যদি না বাঁচাই, সমস্ত লোক আমাদেরই ত ছি-ছি করবে।

বেণী জবাব দিল, যে যেমন কাজ করবে সে তার ফল ভুগবে, আমাদের কি?

রমা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু রমেশদা সত্যিই ত আর চুরি-ডাকাতি করে বেড়ান না, বরং পরের ভালর জন্যেই নিজের সর্ব্বস্ব দিচ্চেন, সে কথা ত কারো কাছে চাপা থাকবে না। তার পর আমাদের নিজেদেরও ত গাঁয়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে।

বেণী হি-হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, তোর হ'ল কি বল্ ত বোন?

রমা এই লোকটার সঙ্গে রমেশের মুখখানা মনে মনে একবার দেখিয়া লইয়া আর যেন সোজা করিয়া মাথা তুলিতেই পারিল না। কহিল, গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে বলবেই, তুমি বলবে, আড়ালে রাজার মাকেও ডান বলে, কিন্তু ভগবান ত আছেন! নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না।

বেণী কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিল, হা রে আমার কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে? শীতলাঠাকুরের ঘরটা পড়ে যাচ্ছে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল, যারা তোমাদের পাঠিয়েচে তাদের বল গে, বাজে খরচ করবার টাকা আমার নেই। শোন কথা! এটা তার কাছে বাজে খরচ? আর কাজের খরচ হচ্ছে মোচলমানদের ইস্কুল করে দেওয়া। তা ছাড়া বামুনের ছেলে—সন্ধ্যে-আহ্নিক কিছু করে না। শুনি মোচলমানের হাতে জল পর্য্যন্ত খায়। দু'পাতা ইংরাজী পড়ে আর কি তার জাত-জন্ম আছে দিদি—কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা, সমস্তই তোলা আছে। সে একদিন সবাই দেখতে পাবে।

রমা আর বাদানুবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল বটে, কিন্তু রমেশের অনাচার

এবং ঠাকুর-দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়া মনটা তাহার আবার তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। বেণী নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া মেঝের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেদিন তাহার একাদশী। খাবার হাঙ্গামা নাই মনে করিয়া আজ যেন সে স্বস্তিবোধ করিল।

১৪

বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়াভীতি বাঙলার পল্লী জননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না। তিনি দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কি না। এই তিন দিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হউক কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর, মাসের পর মাস মানুষকে রোগভোগ করিতে দেয়, ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। কয়েকদিন পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে, কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া এবং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে, এ-সকল তাহার নিজের কৃত নহে, বাপ-পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা এবং উদ্যম ব্যয় করিতে অপারগ। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে, অথচ আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু সুস্থ হইলেই এইরূপ একটা গ্রাম সে নিজের চোখে গিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিবে এবং তাহার পরে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে। কারণ, তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল—এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল-নিকাশের স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই, যাহা এমনিই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াও চেষ্টা করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে লোক দেখিতে পাইবে।

অন্ততঃ তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পিরপুরের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইনজিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন একটা মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু!

অকস্মাৎ কান্নার সুরে আহ্বান শুনিয়া রমেশ মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ভৈরব আচার্য্য ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার সাত-আট বৎসরের একটি কন্যা সঙ্গে আসিয়াছিল; বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক যে যেখানে ছিল, দোর-গড়ায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কেমন যেন এক-রকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্ব্বনাশ হইল, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে, কিছু যেন ঠাওর পাইল না। গোপাল সরকার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া টানিতেই ভৈরব উঠিয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া গোপালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এই লোকটা অতি অল্পতেই মেয়েদের মত কাঁদিয়া ফেলে স্মরণ করিয়া রমেশ ক্রমশঃ যখন অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় গোপালের বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে ভৈরব অবশেষে চোখ মুছিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল এবং এই মহাশোকের হেতু বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইল। বিবরণ শুনিয়া রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এতবড় অত্যাচার কোথাও কোনকালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সে কল্পনা করিতেও পারিল না। ব্যাপারটা এই—ভৈরবদের সাক্ষ্যে ভজুয়া নিষ্কৃতি পাইলে তাহাকে পুলিশের সন্দেহদৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্ত্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সনৎ মুখুয্যে ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগারশ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং তাহার বাস্তুটা ক্রোক করিয়া নীলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। যথারীতি সমন বাহির হইয়াছে; কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্ব্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্ব্বলের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারে প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইনমত সমস্ত মিথ্যা ঋণ বিচারালয়ে

গচ্ছিত না করিয়া কথাটি কহিবার জো নাই। মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে, তাহা জমা দিয়া এই মহা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে! সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে, অথচ সমস্তই যে বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কাজ তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই এবং এই অত্যাচারের যত বড় দুর্গতি ভৈরবের অদৃষ্টে ঘটুক, গ্রামের সকলেই চুপি চুপি জল্পনা করিয়া ফিরিবে, কিন্তু একটি লোকও মাথা উঁচু করিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিবে না, কারণ তাহারা কাহারো সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না এবং পরের কথায় কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না। সে যাই হোক, রমেশ কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসঙ্কোচ অত্যাচার করিবার সাহস ইহারা কোথায় পায় এবং কেমন করিয়া পায় এবং কেমন করিয়া দেশের আইনকেই ইহারা কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং অর্থবল এবং কূটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহতি দেয়, মৃতসমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহার দুষ্কৃতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই ইহারা সহস্র অন্যায় করিয়াও সত্যধর্ম্মবিহীন মৃত পল্লী-সমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিরুপদ্রবে এবং যথেচ্ছাচারে বাস করে।

আজ তাহার জ্যাঠাইমার কথাগুলো বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন সেই যে তিনি মর্ম্মান্তিক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, রমেশ, চুলোয় যাক গে তোদের জাত-বিচারের ভাল-মন্দ ঝগড়াঝাঁটি, বাবা, শুধু আলো জ্বেলে দে রে, শুধু আলো জ্বেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল, একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা। তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোনটা কালো, কোনটা ধলো। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি ফিরেই এসেছিস্ বাবা, তবে চলে আর যাস্‌নে। তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস্ বলেই তোদের পল্লী-জননীর এই দুর্দ্দশা। সত্যই ত। সে চলিয়া গেলে ত ইহার প্রতিকারের লেশমাত্র উপায় থাকিত না।

রমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, হায় রে আমাদের গর্ব্বের ধন—বাঙলার শুদ্ধ, শান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ পল্লী-সমাজ! একদিন হয়ত যখন ইহার প্রাণ ছিল, তখন দুষ্টের শাসন করিয়া আশ্রিত নর-নারীকে সংসারযাত্রার পথে নির্বিঘ্নে বহন করিয়া চলিবারও ইহার শক্তি ছিল।

কিন্তু আজ ইহা মৃত, তথাপি অন্ধ পল্লীবাসীরা এই গুরুভার বিকৃত শবদেহটাকে পরিত্যাগ না করিয়া মিথ্যা মমতায় রাত্রিদিন মাথায় বহিয়া বহিয়া এমন দিনের পর-দিন ক্লান্ত অবসন্ন ও নির্জ্জীব হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে না। যে বৃক্ষ

আর্ত্তকে রক্ষা করে না, শুধু বিপন্ন করে, তাহাকেই সমাজ বলিয়া কল্পনা করার মহাপাপ তাহাদিগকে নিয়ত রসাতলের পথেই টানিয়া নামাইতেছে।

রমেশ আরও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সহসা যেন ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল, আপনি সমস্ত বিষয় নিজে ভাল করে জেনে টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন এবং যেমন করে হোক পুনর্বিচারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে আসবেন। এমন ভয়ংকর অত্যাচার করবার সাহস তাদের আর যেন কোন দিন না হয়।

চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকার ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। রমেশ পুনর্ব্বার যখন নিজের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিল এবং সে যে তামাশা করিতেছে না তা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ন্যায় রমেশের দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া, চেঁচাইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রমেশের অপেক্ষা অল্প বলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সেদিন একটা কঠিন কাজ হইত। কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সকলেই বুঝিল বেণী এবং গোবিন্দ এবার সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না। ছোটবাবু যে তাঁহার চিরশত্রুকে হাতে পাইবার জন্যই এত টাকা হাতছাড়া করিয়াছে, তাহা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা কাহারও কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না যে, দুর্ব্বল ভৈরবের পরিবর্ত্তে ভগবান তাহারই মাথার উপর এই গভীর দুষ্কৃতির গুরুভার তুলিয়া দিলেন যে তাহা স্বচ্ছন্দে বহিতে পারিবে।

তারপর মাসখানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রমেশ এই একটা মাস তাহার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া এমনই উৎসাহের সহিত নানাস্থানে মাপ-জোপ করিয়া ফিরিতেছিল যে, আগামী কালই যে ভৈরবের মোকদ্দমা তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ সে-কথা মনে পড়িয়া গেল রোশনচৌকির সানায়ের সুরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্য্যের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন। অথচ সে ত কিছুই জানে না। শুনিতে পাইল, ভৈরব আয়োজন মন্দ করে নাই। গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু রমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কি না সে খবর বাড়িতে কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাহাই নয়, তাহার স্মরণ হইল, এত বড় একটা মামলা ভৈরবের মাথার উপর আসন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে আসে নাই! ব্যাপার কি? কিন্তু এমন কথা তাহার মনে উদয় হইয়াও হইল না যে, সংসারের সমস্ত লোকের মধ্যে

ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারে। তাই নিজের এই অদ্ভুত আশঙ্কায় নিজেই লজ্জিত হইয়া রমেশ তখনই একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া একেবারে সোজা আচার্য্য-বাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, বেড়ার ধারে দুই-তিনটা গ্রামের কুকুর জড় হইয়া এঁটো কলাপাত লইয়া বিবাদ করিতেছে এবং অনতিদূরে রোশনচৌকি-ওয়ালারা আগুন জ্বালাইয়া তামাক খাইতেছে এবং বাদ্যভাণ্ড উত্তপ্ত করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল উঠানে শতছিদ্রযুক্ত সামিয়ানা খাটানো এবং সমস্ত গ্রামের সম্বল পাঁচ-ছয়টা কেরোসিনের বহু পুরাতন বাতি মুখুয্যে ও ঘোষালবাটী হইতে চাহিয়া আনিয়া জ্বালানো হইয়াছে। তাহারা স্বল্প-আলোক এবং অপর্য্যাপ্ত ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খাওয়ানো সমাধা হইয়া গিয়াছিল—বেশী লোক আর ছিল না। পাড়ার মুরুব্বিরা তখন যাই-যাই করিতেছিলেন এবং ধর্ম্মদাস হরিহর রায়কে আরও একটুখানি বসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী একটুখানি সরিয়া বসিয়া কে একজন চাষার ছেলের সহিত নিরিবিলি আলাপে রত ছিলেন। এমনি সময়ে রমেশ দুঃস্বপ্নের মত একেবারে প্রাঙ্গণের বুকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেন এক মুহূর্ত্তে মসীবর্ণ হইয়া গেল, শত্রুপক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই বাটীতেই এমন ভাবে যোগ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি, একটা কথা পর্য্যন্ত কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। খানিক পরে সে বাটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে—বলি গোবিন্দদা, বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝখানে যেন ভূত দেখিতে পাইল এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া বাটীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুষ্কমুখে একাকী যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাহার মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পিছনে ডাক শুনিল, বাবা রমেশ।

ফিরিয়া দেখিল দীনু হন হন করিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, চল বাবা, বাড়ি চল।

রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র।

চলিতে চলিতে দীনু বলিতে লাগিল, তুমি ওর যে উপকার করেচ বাবা, সে ওর বাপ-মা করত না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু উপায় ত নেই। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমাদের সকলেরই ঘর করতে হয়; তাই তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে—বুঝলে না বাবা—ভৈরবকেও নেহাত দোষ দেওয়া যায় না—তোমরা সব আজকালকার শহরের ছেলে—জাত-টাত তেমন ত কিছু মানতে চাও না—তাতেই বুঝলে না বাবা—দুদিন পরে, ওর ছোটমেয়েটিও প্রায় বারো বছরের হ'ল ত—পার করতে হবে ত বাবা? আমাদের সমাজের কথা সবই জান বাবা—বুঝলে না বাবা—

রমেশ অধীরভাবে কহিল, আজ্ঞে হাঁ, বুঝেচি।

রমেশের বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দীনু খুশী হইয়া কহিলেন, বুঝবে বৈ কি বাবা, তোমরা ত আর অবুঝ নও। ও-ব্রাহ্মণকেই বা দোষ দিই কি করে—আমাদের বুড়োমানুষের পরকালের চিন্তাটা—

আজ্ঞে হাঁ, সে ত ঠিক কথা, বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোক তাহাকে একঘরে করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। নিজের ঘরের মধ্যে আসিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। আজ এইটা তাহার সবচেয়ে বেশী বাজিল যে, বেণী ও গোবিন্দকেই ভৈরব আজ সমাদরে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং গ্রামের লোক সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও ভৈরবের এই ব্যবহারটা শুধু মাপ করে নাই, সমাজের খাতিরে রমেশকে সে যে আহ্বান পর্য্যন্ত করে নাই, তাহার এই কাজটাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছে।

হা ভগবান! সে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ কৃতঘ্ন জাতের, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান তুমিই ক্ষমা করতে পারবে?

১৫

এমনি একটা আশঙ্কা যে রমেশের মাথায় একেবারেই আসে নাই তাহা নহে। তথাপি পরদিন সন্ধ্যার সময়ে গোপাল সরকার সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্যসত্যই জানাইল যে, ভৈরব আচার্য্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিয়াছে অর্থাৎ সে মকদ্দমায় হাজির হয় নাই এবং তাহা এক-তরফা হইয়া ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়া তাহাদের প্রদত্ত জমা টাকাটা বেণী প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন এক মুহূর্ত্তেই রমেশের ক্রোধের শিখা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন ইহাদের জাল ও জুয়াচুরি দমন করিতে যে মিথ্যা ঋণ সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল, মহাপাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার দ্বারাই নিজের মাথা বাঁচাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই কৃতঘ্নতা কন্যাকার অপমানকেও বহু ঊর্দ্ধে ছাপাইয়া আজ রমেশের মাথার ভিতরে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রমেশ যেমন ছিল তেমনি খাড়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। আত্মসংবরণের কথাটা তাহার মনেও হইল না। প্রভুর রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি কোথাও যাচ্চেন?

আসচি, বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভৈরবের বহির্বাটীতে ঢুকিয়া দেখিল

কেহ নাই। ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আচার্য্য-গৃহিণী সন্ধ্যাদীপ-হাতে প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চমূলে আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ রমেশকে সুমুখে দেখিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া গেলেন। সে কখনও আসে না, আজ কেন আসিয়াছে তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিল।

রমেশ তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল, আচায্যিমশাই কই?

গৃহিণী অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু বুঝা গেল তিনি ঘরে নাই। রমেশের গায়ে একটা জামা অবধি ছিল না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তাহার মুখও ভাল দেখা যাইতেছিল না। এমন সময়ে ভৈরবের বড়মেয়ে লক্ষ্মী ছেলে-কোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা?

তাহার জননী পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না।

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, বাবা, কে একটা লোক উঠানে এসে দাঁড়িয়েচে, কথা কয় না।

কে রে? বলিয়া সাড়া দিয়া তাহার পিতা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াতেও সেই দীর্ঘ ঋজু দেহ চিনিতে তাহার বাকী রহিল না।

রমেশ কঠোরস্বরে ডাকিল— নেমে আসুন, বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল, কেন এমন কাজ করলেন?

ভৈরব কাঁদিয়া উঠিল, মেরে ফেললে রে লক্ষ্মী, বেণীবাবুকে খবর দে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িসুদ্ধ ছেলেমেয়ে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সন্ধ্যার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বহুকণ্ঠের গগনভেদী কান্নার রোলে সমস্ত পাড়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া কহিল, চুপ! বলুন, কেন এ কাজ করলেন?

ভৈরব উত্তর দেবার চেষ্টামাত্র না করিয়া একভাবে চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিল এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা-হেঁচড়া করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং তামাশা দেখিতে আরও বহু লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিতে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রোধান্ধ রমেশ সে দিকেই লক্ষ্য করিল না। শত চক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে উন্মত্তের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরঞ্জিত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই একবাড়ি লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল

না যে, হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়। গোবিন্দ বাড়ি ঢুকিয়াই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। বেণী উঁকি মারিয়াই সরিতেছিলেন, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বড়বাবু বড়বাবু—

বড়বাবু কিন্তু কর্ণপাতও করিল না, চোখের নিমিষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল, পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, হয়েচে—এবার ছেড়ে দাও।

রমেশ তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, কেন?

রমা দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই।

রমেশ প্রাঙ্গণপূর্ণ লোকের পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, বাড়ি যাও।

রমেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল। কিন্তু সে চলিয়া গেলে রমার প্রতি তাহার এই নিরতিশয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি একরকম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এবং এমন জিনিসটার এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা পাড়ার লোকের কাহারও যেন মনঃপুত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙ্গুলী আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা আঙুল তুলিয়া মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধমরা করে দিয়ে গেল, এর কি করবে সেই পরামর্শ করো।

ভৈরব দুই-হাঁটু বুকের কাছে জড় করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল, নিরুপায়ভাবে বেণীর মুখপানে চাহিল। রমা তখনও যায় নাই। বেণীর অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নেই বড়দা? তা ছাড়া হয়েচেই বা কি যে এই নিয়ে হৈ-চৈ করতে হবে।

বেণী ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বল কি রমা!

ভৈরবের বড় মেয়ে তখনও একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সে দলিতা ফণিনীর মত একবার গর্জ্জাইয়া উঠিল, তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে গেলে কি করতে বল ত?

তাহার গর্জ্জনে রমা প্রথমটা চমকিয়া গেল। সে যে পিতার মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞ নয়—তা না হয় নাই হইল, কিন্তু তাহার তীব্রতার ভিতর হইতে এমন একটা কটু শ্লেষের ঝাঁজ আসিয়া রমার গায়ে লাগিল যে সে পরমুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাৎ

লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা ক'রো না, কিন্তু আমি কারও হয়েই কোনও কথা বলিনি, ভালর জন্যেই বলেছিলাম।

লক্ষ্মী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ঝগড়ায় অপটু নহে। সে তাড়িয়া আসিয়া বলিল, বটে। ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের মেয়ে বলে কেউ ভয়ে কথা কয় না—নইলে কে না শুনেচে? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিত।

বেণী লক্ষ্মীকে একটা তাড়া দিয়া বলিল, তুই থাম না লক্ষ্মী। কাজ কি ও-সব কথায়?

লক্ষ্মী কহিল, কাজ নেই কেন? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হ'ল, তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন? বাবা যদি মারা যেতেন?

রমা নিমিষের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল মাত্র। বেণীর কৃত্রিম ক্রোধের স্বর তাহাকে আবার প্রজ্বলিত করিয়া দিল। সে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিল, লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা, আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারত।

লক্ষ্মীও জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ওঃ তাইতেই বুঝি তুমি মরেচ রমাদিদি?

রমা আর জবাব দিল না। তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বেণীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল ত বড়দা? বলিয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া বেণীর বুকের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিল।

বেণী ক্ষুব্ধভাবে বলিল, কি করে জানব বোন। লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

লোকে কি বলে?

বেণী পরম তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, বললেই বা রমা, লোকের কথাতে ত আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, বলুক না।

তাহার এই কপট সহানুভূতি রমা টের পাইল। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চামড়া নেই! কিন্তু লোককে একথা বলাচ্চে কে? তুমি?

আমি?

রমা ভিতরের দুর্নিবার ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্ম্মই ত তোমার বাকী নেই—চুরি, জুয়াচুরি, জাল, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকি থাকে কেন?

বেণী হতবুদ্ধি হইয়া হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না।

রমা কহিল, মেয়েমানুষের এত বড় সর্ব্বনাশ যে আর নেই, সে বোঝবার তোমার সাধ্য নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?

বেণী ভীত হইয়া বলিল, আমার লাভ কি হবে! লোকে যদি তোমাকে রমেশের বাড়ি থেকে ভোরবেলা বার হতে দেখে—আমি করব কি?

রমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, এত লোকেব সামনে আমি আর বলতে চাইনে। কিন্তু তুমি মনে ক'রো না বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাইনি! কিন্তু এ নিশ্চয় জেনো—আমি মরবার আগে তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাব না।

আচার্য্যগৃহিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন; সরিয়া আসিয়া রমার একটা বাহু ধরিয়া ঘোমটার ভিতব হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, পাগল হয়েচ মা, এখানে তোমাকে না জানে কে? নিজের কন্যার উদ্দেশে বলিলেন, লক্ষ্মী, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের নামে এ অপবাদ দিস্‌নে রে, ধর্ম্ম সইবে না। আজ ইনি তোদের যে উপকার করেচেন, তোরা মানুষের মেয়ে হলে তা টের পেতিস, বলিয়া টানিয়া রমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। আচার্য্যগৃহিণীর স্বামীর উদ্দেশে এই কঠোর শ্লেষ এবং নিরপেক্ষ সত্যবাদিতায় উপস্থিত সকলেই যেন কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া পড়িল।

এই ঘটনার কার্য্য-কারণ যত বড় এবং যাই হোক, নিজের কদাকর অসংযমে রমেশের শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এমনি সঙ্কুচিত হইয়া রহিল যে, সে বাটীর বাহির হইতেই পারিল না। তথাপি এত লোকের মধ্য হইতে রমা যে স্বেচ্ছায় তাহার লজ্জার অংশ লইতে আসিয়াছিল, এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত লজ্জার কালোমেঘের গায়ে দিগন্তলুপ্ত অতি ঈষৎ বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল! তাই তাহার গ্লানির মধ্যেও পরিতৃপ্তির আনন্দ ছিল। এই দুঃখ ও সুখের বেদনা লইয়া সে যখন আরও কিছুদিন তাহার নির্জ্জন গৃহের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিতেছিল, যখন তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাহিরে যে আর একজনের মাথার উপর নিরবচ্ছিন্ন লজ্জা ও অপমানের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না।. আজ বৈকালে পিরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। এ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূর্ব্বে করিয়া আসিয়াছিল। সেইমত তাহারা আজ একত্র হইয়া ছোটবাবুর জন্যই অপেক্ষা

করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে যাইবার জন্য উঠিতে হইল। কেন তাহা বলিতেছি।

রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এক ফোঁটা জমি-জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলে কিম্বা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে-কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ মহাজনেরা প্রায় হিন্দু। রমেশ শহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া যাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়াছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এই সকল দুর্ভাগাদের মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সে কোমর বাঁধিয়া লাগিল। কিন্তু দুই-একটা কাজ করিয়াই ধাক্কা খাইয়া দেখিল যে, এই সকল দরিদ্রদিগকে সে যতটা অসহায় এবং কৃপাপাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র, নিরুপায়, অল্পবুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু বজ্জাতি-বুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয়। মিথ্যা বলিতে ইহারা অধোবদন হয় না এবং ফাঁকি দিতে জানে। প্রতিবেশীর স্ত্রী-কন্যার সম্বন্ধে সৌন্দর্য-চর্চ্চার শখও মন্দ নাই। পুরুষের বিবাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার অথচ নানা বয়সের বিধবায় প্রতি গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। তাই নৈতিক স্বাস্থ্যও অতিশয় দূষিত। সমাজ ইহাদিগের আছে- তাহার শাসনও কম নয়, কিন্তু পুলিশের সহিত চোরের যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ইহারা ঠিক সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে। অথচ সর্ব্বসমেত ইহারা এমন পীড়িত, এত দুর্ব্বল, এমন নিঃস্ব যে, রাগ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যা হয়, রমেশের অন্তরটা ঠিক তেমনি করিতেছিল বলিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় সে পিরপুরের নূতন ইস্কুল-ঘরে পঞ্চায়েত আহ্বান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ হইল সন্ধ্যার ঝাপ্সা ঘোর কাটিয়া গিয়া দশমীর জ্যোৎস্নায় জানালার বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের এদিক ওদিক ভরিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও যাই-যাই

করিয়া বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময়ে রমা আসিয়া তাহার দোরগোড়ায় দাঁড়াইল! সে স্থানটায় আলো ছিল না, রমেশ বাটীর দাসী মনে করিয়া কহিল, কি চাও?

আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?

রমেশ চমকিয়া উঠিল—এ কি রমা? এমন সময় যে!

যে হেতু তাহাকে সন্ধ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু যে জন্য সে আসিয়াছিল, সে অনেক কথা। অথচ কি করিয়া যে আরম্ভ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমা স্থির হইয়া রহিল। রমেশও কথা কহিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমা প্রশ্ন করিল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?

ভাল নয়। আবার রোজ রাত্রেই জ্বর হচ্ছে।

তা হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ত ভাল হয়।

রমেশ হাসিয়া কহিল, ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি করে?

তাহার হাসি দেখিয়া রমা বিরক্ত হইল। কহিল, আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কি কাজ আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?

রমেশ পূর্ব্বের মত হাসিয়া জবাব দিল, নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলিনে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে, যা এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু সে ত তুমি বুঝবে না রমা।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকারমশাইকে বলে দিয়ে যান, আমি তাঁর কাজকর্ম্ম দেখবো।

রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি আমার কাজকর্ম্ম দেখবে? কিন্তু—

কিন্তু কি?

কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব কি?

রমা অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ কহিল, ইতরে পারে না, কিন্তু আপনি পারবেন।

তাহার দৃঢ় কণ্ঠের এই অভাবনীয় উক্তিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, ভাববার সময় নেই, আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাইলে বিপদ যে কি ঘটিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ভাল, তাই যদি যাই তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করনি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক

করতে এসেচ! সে-সব কাণ্ড এত পুরানো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। বরং খুলে বল, আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চলে যেতে হয়ত রাজী হতেও পারি, বলিয়া সে যে-উত্তরের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহা পাইল না।

কত বড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহাও জানা গেল না; রমেশের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরূপ বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্যগোচর হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল, আচ্ছা খুলেই বলচি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ শুষ্ক হইয়া কহিল, এই? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা একটুখানি থামিয়া কহিল, না দিলে দুদিন পরে আমার মহা-মায়ার পূজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না—আমার বার-ব্রত—এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা স্মরণমাত্র রমা শিহরিয়া উঠিল।

রমেশের আর না শুনিলেও চলিত, কিন্তু থাকিতে পারিল না। কহিল, তার পরে?

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, তারও পরে? না তুমি যাও—আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট ক'রো না; তুমি যাও—যাও এ দেশ থেকে।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে যেখানে যে কোন অবস্থায় হোক রমাকে দেখিলেই রমেশের বুকের রক্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে শত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজের অন্তরকে সহস্র কটূক্তি করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। হৃদয়ের এই নীরব বিরুদ্ধতায় সে দুঃখ পাইত, লজ্জা অনুভব করিত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া আজ এইমাত্র নিজের গৃহের মধ্যে সেই রমাকে অকস্মাৎ একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়া কল্যকার কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয়-চাঞ্চল্য একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। রমার শেষ কথায় এতদিন পরে আজ সেই হৃদয় স্থির হইল। রমার ভয়-ব্যাকুল নির্ব্বন্ধতার অখণ্ড স্বার্থপরতার চেহারা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহার অন্ধ হৃদয়েরও আজ চোখ খুলিয়া গেল।

রমেশ গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কারণ, আমার পালাবার হেতুটা যত বড়ই তোমার কাছে হোক, আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, আমাকে এখনই বার হতে হবে।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, আজ কি কোনমতেই যাওয়া হতে পারে না?

না। তোমার দাসী গেল কোথায়?

কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি কথা! এখানে একা এলে কোন্ সাহসে? একজন দাসী পর্য্যন্ত সঙ্গে করে আনোনি!

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, তাতেই বা কি হ'তো? সেও ত আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না!

তা না পারুক, লোকের মিথ্যা দুর্নাম থেকে ত বাঁচাতে পারত। রাত্রি কম হয়নি রাণী!

সেই বহুদিনের বিস্মৃত নাম! রমা সহসা বলিতে গেল, দুর্নামের বাকী নেই রমেশদা, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া শুধু কহিল, তাতেও ফল হ'ত না রমেশদা। অন্ধকার রাত্রি নয়—আমি বেশ যেতে পারব, বলিয়া আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

১৬

প্রতি বৎসর রমা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত। এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভূষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমন হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত যে, রাত্রি এক-প্রহর পর্য্যন্ত ভাঁড়ে-পাতায় এঁটোতে কাঁটাতে বাড়িতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, পিরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজ-সরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমীপূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে। আকাশে সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু মুখুয্যেবাড়ির মস্ত উঠান জন-কয়েক ভদ্রলোক ব্যতীত একেবারে শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাড়ির ভিতরে অন্নের স্তূপ ক্রমে জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঞ্জনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়িতে পা দিল না।

ইস্! এত আহার্য্য-পেয় নষ্ট করে দিচ্চে দেশের ছোটলোকদের দল? এত বড় স্পর্দ্ধা! বেণী হুঁকা হাতে একবার ভিতরে, একবার বাহিরে হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—বেটাদের শেখাবো—চাল কেটে তুলে দেবো—এমন করবো, তেমন করবো, ইত্যাদি। গোবিন্দ, ধর্ম্মদাস, হালদার প্রভৃতি এরা রুষ্টমুখে অবিশ্রান্ত

ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কোন শালার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান একমত হইয়াছে, এও ত বড় আশ্চর্য্য! এদিকে অন্দরে মাসী ত একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছেন। সেও এক মহামারী ব্যাপার। এই তুমুল হাঙ্গামার মধ্যে শুধু একজন নীরব হইয়া আছে—সে নিজে রমা। একটি কথাও সে কাহারো বিরুদ্ধে কহে নাই, কাহাকেও দোষ দেয় নাই, একটা আক্ষেপ বা অভিযোগের কণামাত্রও এখন পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। একি সেই রমা? সে যে অতিশয় পীড়িত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিজে স্বীকার করে না—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। রোগে রূপ নষ্ট করে—সে যাক। কিন্তু সে অভিমান নাই, সে রাগ নাই, সে জিদ নাই। ম্লান চোখ দুটি যেন ব্যথায় ও করুণায় ভরা। একটু লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন ঐ দুটি সজল আবরণের নীচে রোদনের সমুদ্র চাপা দেওয়া আছে—মুক্তি পাইলে বিশ্ব-সংসার ভাসাইয়া দিতে পারে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া রমা প্রতিমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শুভানুধ্যায়ীর দল একেবারে তারস্বরে ছোটলোকের চৌদ্দ-পুরুষের নাম ধরিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল। রমা শুনিয়া নিঃশব্দে একটুখানি হাসিল। বোঁটা হইতে টানিয়া ছিঁড়িলে মানুষের হাতের মধ্যে ফুল যেমন করিয়া হাসে—ঠিক তেমনি। তাহাতে রাগ-দ্বেষ, আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি সার্থক, কি নিরর্থক তাহাই বা কে জানে।

বেণী রাগিয়া কহিল, না না, এ হাসির কথা নয়, এ বড় সর্ব্বনেশে কথা। একবার যখন জানবো এর মূলে কে,—বলিয়া দুই হাতের নখ এক করিয়া কহিল; তখন এই এমনি করে ছিঁড়ে ফেলব।

রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল, হারামজাদা ব্যাটারা এ বুঝিস নে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্, সেই রমেশ নিজে যে জেলে ঘানি টানচে! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে?

রমা কোন কথা কহিল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেড়-মাস হইল রমেশ অবৈধ প্রবেশ করিয়া, ভৈরবকে ছুরি মারার অপরাধে জেল খাটিতেছে। মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই—নূতন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব কি করিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না সে বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সংশয় আছে। থানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরনের অপরাধ সে পূর্ব্বেও করিয়াছে এবং আরও অনেক প্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের

সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিশ যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেণী সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সে কহিয়াছিল, রমেশ বাড়ি ঢুকিয়া আচার্য্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল, তাহা সে জানে। কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কি না জানে না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কি না, তাহাও স্মরণ হয় না।

কিন্তু এই কি সত্য? জেলার বিচারালয়ে হলফ করিয়া রমা এই সত্য বলিয়া আসিল; কিন্তু যে বিচারালয়ে হলফ করার প্রথা নাই, সেখানে সে কি জবাব দিবে! তাহার অপেক্ষা কে অধিক নিঃসংশয়ে জানিত, ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার অস্ত্র থাকা ত দূরের কথা একটা তৃণ পর্য্যন্ত ছিল না। সে আদালতে ও-কথা ত কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিবে না—সে কি স্মরণ করিতে পারে এবং কি পারে না! কিন্তু এখানকার আদালতে সত্য বলিবার যে তাহার এতটুকু পথ ছিল না! বেণী প্রভৃতির হাত-ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই। সুতরাং সত্যের মূল্যে তাহাকে যে মিথ্যা অপবাদের গাঢ় কালি নিজের মুখময় মাখিয়া এই সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন ত অনেককেই করিতে হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তা ছাড়া এত বড় গুরুদণ্ডের কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। বড় জোর দুশ'-একশ' জরিমানা হইবে ইহাই জানিত। বরঞ্চ বার বার সতর্ক করা সত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হোক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক্। কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একেবারে ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সেই সময়ে রমা নিজে রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। পরের মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল এবং কিছুতেই তাহাকে জেরা করিতে দেয় নাই এবং জেলের হুকুম হইয়া গেলে গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কহিয়াছিল, না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সারাজীবন কারারুদ্ধ করবার হুকুম দিলেও আমি আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। বোধ করি, জেল এর চেয়ে ভাল।

ভালই ত। তাহাদের চিরানুগত ভৈরব আচার্য্য মিথ্যা নালিশ করিয়া যখন তাহার ঋণ শোধ করিল এবং রমা সাক্ষ্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্মরণ করিতে পারিল না তাহার হাতে ছুরি ছিল কি না, তখন আপিল করিয়া মুক্তি চাহিবে সে কিসের জন্য! তাহার সেই দুর্জ্জয় অভিমান বিরাট পাষাণখণ্ডের মত রমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে—কোথাও তাহাকে সে নড়াইয়া রাখিবার স্থান পাইতেছে না। সে

কি গুরুভার! সে মিথ্যা বলিয়া আসে নাই, এ কৈফিয়ত তাহার অন্তর্যামী ত কোনমতেই মঞ্জুর করিল না! মিথ্যা বলে নাই বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশও করে নাই। সত্য-গোপনের অপরাধ যে এত বড়, সে যে এমন করিয়া তাহাকে অহরহ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, এ যদি সে একবারও জানিতে পারিত। রহিয়া রহিয়া তাহার কেবলই মনে পড়ে ভৈরবের যে অপরাধে রমেশ আত্মহারা হইয়াছিল, সে অপরাধ কত বড়! অথচ তাহার একটিমাত্র কথায় সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছাকে এমন করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া কে কবে তাহাকে এত সম্মানিত করিয়াছিল! নিজের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া আজকাল একটা সত্যের সে যেন দেখা পাইতেছিল। যে সমাজের ভয়ে সে এত বড় গর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্রুর হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে? গোবিন্দের এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা কে না জানে? বেণীর সহিত তাহার সংস্রবের কথা গ্রামের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অথচ সমাজের আশ্রয়ে সে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আছে এবং সেই বেণীই সমাজ-পতি। তাহারই সামাজিক শৃঙ্খল সর্ব্বাঙ্গে শতপাকে জড়াইয়া রাখাই চরম সার্থকতা! ইহাই হিঁদুয়ানী! কিন্তু যে ভৈরব এত অনর্থের মূল, রমা নিজের দিকে চাহিয়া তাহার উপরেও আর রাগ করিতে পারিল না। মেয়ে তাহার বারো বছরের হইয়াছে—অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে না পারিলে একঘরে হইতে হইবে এবং বাড়িসুদ্ধ লোকের জাত যাইবে। এ প্রবাদের আশঙ্কামাত্রেই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত-পা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সে নিজে তাহার এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে সমাজের ভয় কাটাইতে পারে নাই—গরীব ভৈরব কাটাইবে কি করিয়া! বেণীর বিরুদ্ধতা করা তাহার পক্ষে কি ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার এ কথা ত কোনমতেই সে অস্বীকার করিতে পারে না।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরা বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকাডাকি, অনুনয়-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেণীবাবুর সামনে হাজির করিয়া দিল। বেণী গরম হইয়া কহিল, এত দেমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা করে মাথা গজিয়েচে রে!

সনাতন কহিল, দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদের থাকে না, ত আমাদের মত গরীবের!

কি বললি রে! বলিয়া হাঁক দিয়া বেণী ক্রোধে নির্ব্বাক হইয়া গেল, ইহারই সর্ব্বস্ব যেদিন বেণীর হাতে বাঁধা ছিল, তখনই এই সনাতন দুবেলা আসিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া যাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা!

গোবিন্দ রসান দিয়া কহিলেন, তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা ! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনি, বলি কেন বল্ ত রে ?

বুড়ো একটুখানি হাসিয়া কহিল, আর বুকের পাটা ! যা করবার সে ত আপনারা আমার করেচেন। সে যাক্, কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্ত্তই আর বামুন-বাড়িতে পাত পাতবে না। এত পাপ যে মা বসুমতী কেমন করে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি, বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরুন, পিরপুরের মোচলমান ছোঁড়ারা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে তা ঐ মা দুর্গাই জানে। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে, বলিয়া সে বেণীর দিকে চাহিল। চক্ষের নিমেষে বেণীর ক্রুদ্ধ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

সনাতন কহিতে লাগিল, ঠাকুরের সুমুখে মিথ্যে বলচিনে বড়বাবু, একটু সামলে-সুমলে থাকবেন। রাত-বিরেতে বার হবেন না—কে কোথায় ওত পেতে বসে থাকবে বলা যায় না ত !

বেণী কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না ! তাহার মত ভীতু লোক বোধ করি সংসারে ছিল না।

এতক্ষণে রমা কথা কহিল। স্নেহার্দ্র-করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের এত সব রাগ ?

সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মিথ্যে বলে আর নরকে যাব কেন দিদিঠাকরুন, তাই বটে ! মোচলমানদের রাগটাই সবচেয়ে বেশী। তারা ছোটবাবুকে হিঁদুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন আপনারা—জাফর আলি, আঙুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেচে। শুনি মসজিদে তাঁর নাম করে নাকি নেমাজ-পড়া পর্য্যন্ত হয়।

রমার শুষ্ক ম্লান মুখখানি অব্যক্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বেণী অকস্মাৎ সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই তোকে দেবো, দু-বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস্ ত তাই পাবি, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্বি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ বেণীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আর ক'টা দিন বা বাঁচব বড়বাবু ! লোভে প'ড়ে যদি এ কাজ করি, মরলে আমাকে

তোলা চুলোয় যাক, পা দিয়ে কেউ ছোঁবে না! সে দিনকাল আর নেই বড়বাবু, সে দিনকাল আর নেই! ছোটবাবু সব উল্টে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ কহিল, বামুনের কথা তা হলে রাখবিনে বল্?

সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল, না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু সেদিন পিরপুরের নতুন ইস্কুল-ঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছ-কতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি ত আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। যা ক'রে তুমি বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি দিদি ঠাক্রুন, তুমিই বল দেখি?

রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল। সনাতন উৎসাহিত হইয়া মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল, বিশেষ করে ছোঁড়াদের দল। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে এই দুটো গাঁয়ের যত ছোকরা সন্ধ্যের পর সবাই গিয়ে জোটে জাফর আলির বাড়িতে। তারা ত চারিদিকে স্পষ্ট বলে বেড়াচ্চে, জমিদার ত ছোটবাবু। আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব—ভয় কারুকে করব না! আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে আমরাও যা তারাও তাই।

বেণী আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, সনাতন, আমার ওপরেই তাদের এত রাগ কেন বলতে পারিস্?

সনাতন কহিল, রাগ ক'রো না বড়বাবু, কিন্তু আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকী নেই।

বেণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোটলোক সনাতনের মুখে এমন কথাটা শুনিয়াও সে রাগ করিল না, কারণ, রাগ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না—তাহার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতেছিল।

গোবিন্দ কহিল, তা হলে জাফরের বাড়িতেই আড্ডা বল্? সেখানে তারা কি করে বলতে পারিস্?

সনাতন তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিল। শেষে কহিল, কি করে জানিনে, কিন্তু ভাল চাও ত সে মতলব ক'রো না ঠাকুর! তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েছে—এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে যেও না ঠাকুর!

সনাতন চলিয়া গেল, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও কথা কহিবার প্রবৃত্তি রহিল না। রমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতে বেণী বলিয়া উঠিলেন, ব্যাপার শুনলে রমা?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল, কহিল, শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি যদি না যাবে সেখানে,

না তাকে ছাড়িয়ে দেবে, এ সব কিছু হ'ত না। তুমি ত হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়, বলিয়া বেণী ভয়ে ক্রোধে জ্বালায় মুখখানা কি এরকম করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু এতবড় নির্লজ্জ অভিযোগ সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল। বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া গোটা-দুই আলো এবং পাঁচ-ছয়জন লোক সঙ্গে করিয়া আশে-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ত্রস্ত ভীতপদে প্রস্থান করিল।

১৭

বিশ্বেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আজ কেমন আছিস মা রমা?

রমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী তার শিয়রে আসিয়া বসিলেন এবং মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আজ তিনমাসকাল রমা শয্যাগত। বুক জুড়িয়া কাসি এবং ম্যালেরিয়ার বিষে সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ প্রাণপণে ইহার বৃথা চিকিৎসা করিয়া মরিতেছে। সে বুড়া ত জানে না কিসের অবিশ্রাম আক্রমণে তাহার সমস্ত স্নায়ু-শিরা অহর্নিশি পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে। শুধু বিশ্বেশ্বরীর মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। রমাকে তিনি কন্যার মতই স্নেহ করিতেন, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না; তাই সে অত্যন্ত স্নেহই রমার সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছিল। অপরে যখন ভুল বুঝিয়া, ভুল আশা করিয়া, ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাঁহার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিতেছিলেন রমার চোখ দুটি গভীর কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র। যেন বহু দূরের কিছু-একটা অত্যন্ত কাছে করিয়া দেখিবার একাগ্র বাসনায় এরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন, রমা?

কেন জ্যাঠাইমা ?

আমি ত তোর মায়ের মত রমা—

রমা বাধা দিয়া বলিল, মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমি ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, তবে সত্যি করে বল্ দেখি মা, তোর কি হয়েছে ?

অসুখ করেচে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল।

তখন গভীর স্নেহে তাহার রুক্ষ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, সে ত এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা! যা এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে এ সময়ে মায়ের কাছে লুকোসনে রমা! লুকোলে ত অসুখ সারবে না মা ?

জানালার বাইরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই এবং মৃদু-মন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, ভাল আছে। মাথায় ঘা সারতে এখনও বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে পারবে।

রমার মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন, দুঃখ ক'রো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে, বলিয়া তিনি রমার মুখে বিস্ময়ের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন, ভাবচ, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বলচি ? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা বেশী পেয়েচি, কি আনন্দ বেশী পেয়েচি তা আমি বলতে পারিনে। কেন না, আমি জানি যারা অধর্ম্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশী থাকে, তা হলে সংসার ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোন আত্মীয়-বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তখন কি কেউ ছিল না ?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, থাকবে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু সে ত খামোকা মেরে বসেনি, নিজে জেলে যাবে ব'লে ঠিক করে তবে তেল বেচতে এসেছিল। তার নিজের রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাঁকের একঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—আর আঘাত করলে না। তা ছাড়া

সে বলে গেছে এর পরেও বেণী সাবধান না হলে সে নিজে আর কখনো ফিরুক, না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, তার মানে আরও লোক পিছনে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ছোটলোকদের এত সাহস ত কোনদিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ সাহস তারা পেল?

বিশ্বেশ্বরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে কি তুই নিজে জানিস্‌নে মা, কে দেশের এই ছোটলোকদের বুক এমন করে ভরে দিয়ে গেছে? আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা! তাকে জোর করে নেবালেও সে আশে-পাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়। সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুশি সেখানে যাক, বেণীর কথা মনে করে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। কিন্তু বলা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরী যে জোর করিয়াই একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, তাহা রমা টের পাইল। তাই তাঁহার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বরী পুনশ্চ কহিলেন, রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে পাল্‌কিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি কারুকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পর্য্যন্ত পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি মা যে এক সন্তান বলে ধর্ম্মের শাসন ত মায়ের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করচিনে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই যদি হয়, তবে রমেশদা কোন পাপে এ দুঃখ ভোগ করচেন? আমরা যা করে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেচি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, না মা, তা নেই। নেই বলেই বেণী আজ হাসপাতালে। আর তোমার—, বলিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। যে কথা তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা জোর করিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি জানিস মা, কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি ক'রে করে, তা সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্য্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারল না, কেন একজনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

রমা নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া নীরবে নিশ্বাস ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী বলিতে লাগিলেন, এর থেকে আমারও চোখ ফুটছে রমা, ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না। গোড়ায় অনেকগুলো ছোট-বড় সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে আমাকে বলতে এসেছিল, জ্যাঠাইমা, আমার কাজ নেই

এদের ভাল করে, আমি যেখান থেকে চলে এসেছি সেইখানে চলে যাই। তখন আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, না রমেশ, কাজ যদি শুরু করেছিস্ বাবা, তবে ছেড়ে দিয়ে পালাসনে। আমার কথা সে ত কখনও ঠেলতে পারে না; তাই যেদিন তার জেলের হুকুম শুনতে পেলাম, সেদিন মনে হ'ল ঠিক যেন আমিই তাকে ধরে-বেঁধে এই শাস্তি দিলাম। কিন্তু তার পরে বেণীকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেদিন প্রথম টের পেলাম—না না, তারও জেল খাটবার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া ত জানিনি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সে কাজ এমন কঠিন। আগে যে মিলতে হয় সকলের সঙ্গে, ভালতে মন্দতে এক না হতে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা ত মনে ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে দাঁড়াল যে, শেষ পর্য্যন্ত কেউ তার নাগাল পেলে না। কিন্তু সে ত আমার চোখে পড়ল না মা, আমি তাকে যেতেও দিলাম না, রাখতেও পারলাম না।

রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তাহা অনুমান করিয়া কহিলেন, না রমা, অনুতাপ আমি সেজন্য করিনে। কিন্তু তুইও শুনে রাগ করিসনে মা, এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোদেব অধর্ম্ম যত বড়ই হোক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড়-গলা করেই বলে যাচ্ছি।

রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু এতে তিনি কেন নেবে যাবেন জ্যাঠাইমা? আমাদের অন্যায় অধর্ম্মের ফলে যত বড় যাতনাই তাঁকে ভোগ করতে হোক, আমাদের দুষ্কৃতি আমাদেরই নরকের অন্ধকূপে ঠেলে দেবে, তাঁকে স্পর্শ করবে কেন?

বিশ্বেশ্বরী ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, করবে বৈ কি মা। নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি নাই করে, এমন কি উল্টে অপকারই করে, তাতেই বা কি এসে যায় মা, যদি না তার কৃতঘ্নতায় দাতাকে নাবিয়ে আনে! তুই বলচিস্ মা, কিন্তু তোদের কুঁয়াপুর রমেশকে কি আর তেমনটি পাবে? সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দান করে বেড়াত, ভৈরব তার সেই ডান হাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে।

তারপর একটু থামিয়া নিজেই বলিলেন, কিন্তু কে জানে! হয়ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্য্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না তখন এই ভাঙা হাতটাই বোধ করি এবার তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে, বলিয়া তিনি গভীর একটা নিশ্বাস মোচন করিলেন।

তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধীরে ধীরে বড়

করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা জ্যাঠাইমা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ডভোগ করানর শাস্তি কি?

বিশ্বেশ্বরী জানালার বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্য্যস্ত চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নিমীলিত দুই চোখের প্রান্ত বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া কহিলেন, কিন্তু তোমার ত হাত ছিল না মা। মেয়েমানুষের এত বড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষেরা তোমার ওপর এই অত্যাচার করেচে, সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদের। তোমাকে ত এর একটি কিছুই বইতে হবে না মা? বলিয়া তিনি তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার একটুমাত্র আশ্বাসেই রমার রুদ্ধ অশ্রু এইবার প্রস্রবণের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, কিন্তু তাঁরা যে তাঁর শত্রু। তাঁরা বলেন, শত্রুকে যেমন করে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। কিন্তু আমার ত সে কৈফিয়ত নেই জ্যাঠাইমা।

তোমারই বা কেন নেই মা? প্রশ্ন করিয়া তিনি দৃষ্টি আনত করিতেই অকস্মাৎ তাঁহার চোখের উপর যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। যে সংশয় মুখ ঢাকিয়া একদিন তাঁর মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিয়া বেড়াইত, সে যেন তাহার মুখোস ফেলিয়া দিয়া একেবারে সোজা হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল। আজ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্বেশ্বরী বেদনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রমার হৃদয়ের ব্যথা আর তাঁহার অগোচর রহিল না।

রমা চোখ বুজিয়া ছিল বিশ্বেশ্বরীর মুখের ভাব দেখিতে পাইল না। ডাকিল, জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা চকিত হইয়া তাহার মাথাটা একটুখানি নাড়িয়া দিয়া সাড়া দিলেন।

রমা কহিল, একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব জ্যাঠাইমা। পির-পুরের জাফর আলির বাড়িতে সন্ধ্যার পর গ্রামের ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদার কথামত সৎ আলোচনাই করত, বদমাইসের দল বলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মতলব চলছিল—আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিয়েচি। কারণ পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষা রাখত না।

শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী শিহরিয়া উঠিলেন—বলিস্ কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের এই উৎপাত বেণী মিছে করে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা কহিল, আমার মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া নীরবে রমার ললাট চুম্বন করিলেন। বলিলেন, তার

মা হয়ে এ যদি না আমি মাপ করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্ব্বাদ করি, এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার এই একটা সান্ত্বনা জ্যাঠাইমা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের চাষাভুষারা এবার ঘুম-ভেঙে উঠে বসেচে—তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালোবাসার আনন্দে তিনি আমার অপরাধ কি ভুল্‌তে পারবেন না জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী কথা বলিতে পারিলেন না। শুধু তাঁহার চোখ হইতে এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া রমার কপালের উপর পড়িল। তারপর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রমা ডাকিল, জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, কেন মা?

রমা কহিল, শুধু একটা জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম।

বিশ্বেশ্বরী আবার নত হইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

রমা কহিল, সেই জোরে আমি একটা দাবী তোমার কাছে রেখে যাব। আমি যখন আর থাক্‌ব না, তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হ'য়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমিও পেয়েচি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী উপুড় হইয়া পড়িয়া বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, চল না আমরা কোন তীর্থে গিয়ে থাকি। যেখানে বেণী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ তুল্‌লেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেখানেই যাই। আমি সব বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিন তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলে পুড়ে সেখানে গেলে ত চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল, আমিও তেমনি ক'রেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।

১৮

কারা-প্রাচীরের বাহিরে যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, বোধ করি উন্মত্ত বিকারেও ইহা রমেশের আশা করা সম্ভবপর ছিল না। ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়া সে জেলের বাহিরে পা দিযাই দেখিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। স্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদর জড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান। তাঁহার পশ্চাতে উভয়-বিদ্যালয়ের মাস্টার পণ্ডিত ও ছাত্রের দল, কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেণী সজোরে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় কহিল, রমেশ, ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান, এবার তা টের পেয়েছি। যদু মুখয্যের মেয়ে যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত করে এমন শত্রুতা করবে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে ভালমতোই দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ, বাইরে এই ছটামাস আমি যে তুষের আগুনে জলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। হেডমাস্টার পাড়ুই মহাশয় একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রমেশের পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। তাহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম করিবার ঘটায় সমস্ত পথটা যেন চষিয়া ফেলিতে লাগিল। বেণীর কান্না আর মানা মানিল না। অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে কহিল, দাদার ওপর অভিমান রাখিস্ নে ভাই, বাড়ি চল্। মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন।

ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল, রমেশ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিল। বেণী সম্মুখের আসনে স্থান গ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া ফেলিলেন। ঘা শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন জাজ্বল্যমান। বেণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উল্টাইয়া কহিলেন, কাকে আর দোষ দেব ভাই, আমার নিজের কর্ম্মফল—আমারই পাপের শাস্তি! কিন্তু সে আর শুনে কি হবে? বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাস ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল, কিছু একটা হইয়াছেই। তাই সে কথা শুনিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু বেণী যে জন্য এই ভূমিকাটি করিল, তাহা ফাঁসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে কাটার পরে, সে আবার একটা নিশ্বাসের দ্বারা রমেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমার এই একটা জন্মগত দোষ যে কিছুতেই

মনে এক মুখে আর করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়, কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হ'ল না।

রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বেণী কণ্ঠস্বর আরও মৃদু ও গম্ভীর করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমার দোষের মধ্যে সেদিন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, এই সর্ব্বনাশ আমাদের করলি! জেল হয়েছে শুনলে যে মা একেবারে প্রাণ-বিসর্জ্জন করবেন! আমরা ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করি—যা করি, কিন্তু তবু ত সে আমার ভাই! তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি, মাকে মারলি! কিন্তু নির্দ্দোষীর ভগবান আছেন। বলিয়া সে গাড়ির বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার যেন নালিশ জানাইল।

রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু মন দিয়া শুনিতে লাগিল। বেণী একটু থামিয়া কহিল, রমেশ, রমার সে উগ্রমূর্ত্তি মনে হলে এখনো হৃৎকম্প হয়, দাঁতে দাঁতে ঘষে বল্‌লে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি? পার্‌লে ছেড়ে দিত বুঝি? মেয়েমানুষের এত দর্প সহ্য হ'ল না রমেশ! আমিও রেগে বলে ফেললাম, আচ্ছা ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রমেশ বেণীর কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা সে জানে না। কিন্তু ঠিক এই কথাটিই সে দেশে পা দিয়াই রমার মাসীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকীর্ণ হইয়া উঠিল।

বেণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, খুন করা তাহার অভ্যাস আছে ত। আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি, বরঞ্চ তুমিই উল্টে শিখিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমাকে দেখ্‌চ ত? এই ক্ষীণজীবী—বলিয়া বেণী একটু চিন্তা করিয়া লইয়া দুষ্ট কলুর ছেলের কল্পিত বিবরণ নিজের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনার ভাষায় ধীরে ধীরে গ্রথিত করিয়া বিবৃত করিল।

রমেশ রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পর?

বেণী মলিনমুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তার পরে কি আর মনে আছে ভাই! কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে, কিছুই জানিনে। দশ দিন পরে জ্ঞান হয়ে দেখলাম হাসপাতালে পড়ে আছি। এ-যাত্রা যে রক্ষে পেয়েচি সে কেবল মায়ের পুণ্যে—এমন মা কি আর আছে রমেশ।

রমেশ একটা কথাও কহিতে পারিল না, কাঠের মূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু কেবল তাহার দশ অঙ্গুলি জড় হইয়া বজ্র-কঠিন মুঠায় পরিণত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার পরিমাণ করিবারও কাহারও সাধ্য রহিল না। বেণী যে কত মন্দ তাহা সে জানিত। তাহার অসাধ্য যে কিছুই নাই ইহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সংসারে কোন মানুষই যে এত অসত্য এমন অসঙ্কোচে এরূপ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই রমার সমস্ত অপরাধই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামময় যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাত্রি পর্য্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু গ্লানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা উবিয়া গেল। তাহার অবর্ত্তমানে গ্রামের মধ্যে যে খুব বড় একটা সামাজিক স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই কয়টা মাসের মধ্যেই এত বড় পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা ভাবিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেণীর প্রতিকূলতায় যে শক্তি পদে পদে প্রতিহত হইয়া কাজ করিতে পারিতেছিল না, অথচ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই এখন তাহার অনুকূলতায় দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বেণীকে সে আজ আরও একটু ভাল করিয়া চিনিল। এই লোকটাকে এরূপ অনিষ্টকারী জানিয়াও সমস্ত গ্রামের লোক যে তাহার কতদূর বাধ্য, তাহা আজ সে যেমন দেখিতে পাইল এমন কোন দিন নয়। ইহারই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রমেশ মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু তাই নয় রমেশের উপর অন্যায় অত্যাচারের জন্য গ্রামের সকলেই মর্ম্মাহত, সে কথা একে একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমবেত সহানুভূতি লাভ করিয়া এবং বেণীকে সপক্ষে পাইয়া, আনন্দ উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্ব্বে যে-সকল কাজ আরম্ভ করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিতে যাইতে হইয়াছিল, আবার পূর্ণোদ্যমে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সঙ্কল্প করিয়া রমেশ কিছুদিনের জন্য নিজেও এই সকল আমোদ-আহ্লাদে গা ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বত্র ছোট-বড় সকল বাড়িতে সকলের কাছে সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতেছিল—তাহা রমার প্রসঙ্গ। সে পীড়িত তাহা পথে শুনিয়াছিল; কিন্তু সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল, শুধু একা রমাই যে তাহার সমস্ত

দুঃখের মূল তাহা সবাই জানে। সুতরাং এইখানে বেণী যে মিথ্যা কথা কহে নাই তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে বেণী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল। পিতৃপুরুষের একটা বড় বিষয়ের অংশ বিভাগ লইয়া বহুদিন হইতে রমার সহিত তাঁহার প্রচ্ছন্ন মনোবিবাদ ছিল, এই সুযোগে সেটা হস্তগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য।

বেণী বাহিরে যাই বলুক, সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত। এখন সে শয্যাগত, মামলা-মোকদ্দমা করিতে পারিবে না, উপরন্তু তাহাদের মুসলমান প্রজারাও রমেশের কথা ঠেলিতে পারিবে না। পরে যাই হোক, আপাততঃ বে-দখল করিবার এমন অবসর আর মিলিবে না বলিয়া সে একেবারে জিদ ধরিয়া বসিল। রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া অস্বীকার করিতেই বেণী বহু প্রকারের যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষে কহিলেন, হবে না কেন? বাগে পেয়ে সে কবে তোমাকে রেয়াৎ করেচে যে, তার অসুখের কথা তুমি ভাবতে যাচ্ছ? তোমাকে যখন সে জেলে দিয়েছিল, তখন তোমার অসুখই বা কোন কম ছিল ভাই!

কথাটা সত্য। রমেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। তবু কেন যে তাহার মন কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা করিতে চাহিল না—বেণীর সহস্র কটু উত্তেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায় পীড়িত অবস্থা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গেল, তাহার সুস্পষ্ট হেতু সে নিজেও খুঁজিয়া পাইল না। রমেশ চুপ করিয়া রহিল। বেণী কাজ হইতেছে জানিলে ধৈর্য্য ধরিতে জানে। সে তখনকার মত আর পীড়াপীড়ি না করিয়া চলিয়া গেল।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরীর কোন দিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা সে পূর্ব্বেও জানিত, কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া সে অনাসক্তিটা যেন বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেণীর সমভিব্যাহারে যেদিন সে-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন বিশ্বেশ্বরী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সজল-কণ্ঠে বারংবার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি যেন একটা তাহাতে ছিল, যাহাতে সে ব্যথাই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথায় কথায় শুনিল বিশ্বেশ্বরী কাশী-বাস সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিতেছেন, আর ফিরিবেন না, শুনিয়া সে চমকিয়া গেল। কৈ সে ত কিছুই জানে না। নানা কাজে পাঁচ-ছদিনের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু যেদিন হইয়াছিল সেদিন ত তিনি কোন কথা বলেন নাই। যদিচ সে জানিত, তিনি নিজে হইতে আপনার বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোনদিন ভালবাসেন না, কিন্তু আজিকার সংবাদটার সহিত সেদিনের স্মৃতিটা পাশাপাশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাঁহার এই একান্ত বৈরাগ্যের

অর্থ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যাঠাইমা সত্যই বিদায় লইতেছেন। এ যে কি, তাঁহার অবিদ্যমানতা যে কি অভাব, মনে করিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন নটা-দশটা। ঘরে ঢুকিতে গিয়া দাসী জানাইল তিনি মুখুয্যে-বাড়ি গেছেন।

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এমন সময় যে?

এ দাসীটি বহুদিনের পুরানো। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, মার আবার সময়-অসময়। তা ছাড়া, আজ তাঁদের ছোটবাবুর পৈতে কিনা।

যতীনের উপনয়ন?

রমেশ আরও আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কৈ এ কথা ত কেউ জানে না?

দাসী কহিল, তাঁরা কাউকে বলেননি। বললেও ত কেউ গিয়ে খাবে না—রমাদিদিকে কর্ত্তারা সব একঘরে করে রেখেচেন কিনা।

রমেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দাসী সলজ্জে ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিল, কি জানি ছোটবাবু—রমাদিদির কি সব বিশ্রী অখ্যাতি বেরিয়েচে কি না—আমরা গরীব-দুঃখী মানুষ, সে সব জানিনে ছোটবাবু—বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। এ যে বেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল। কিন্তু ক্রোধ কি জন্য এবং কিসের প্রতিহিংসা কামনা করিয়া সে কোন্ বিশেষ কদর্য্য ধারায় রমার অখ্যাতিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এ সকল ঠিকমত অনুমান করাও তাহার দ্বারা সম্ভবপর ছিল না!

১৯

সেইদিন অপরাহ্ণে একটা অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ মতিলাল সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাপু?

বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল, মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন্ কম? আর হাকিম হুজুর যা কিছু তা আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকেই ত হয়ে থাকেন! কাল যদি আপনি সরকারী চাকরি নিয়ে হাকিম

হয়ে বসে বিচার করে দেন, সেই বিচার ত আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে। তখন ত মানুব না বল্‌লে চলবে না।

কথা শুনিয়া রমেশের বুক গর্ব্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কৈলাস কহিল, আপনাকে আমরা দুজনেই দু'কথা বুঝিয়ে বলতে পারব, কিন্তু আদালতে সেটি হবে না। তা ছাড়া গাঁটের কড়ি মুঠো ভরে উকিলকে না দিতে পারলে সুবিধে কিছুতেই হয় না বাবু। এখানে একটি পয়সা খরচ নেই, উকিলকে খোসামোদ করতে হবে না, পথ হাঁটাহাঁটি করে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি যা হুকুম করবেন, ভাল হোক মন্দ হোক, আমরা তাতেই রাজী হয়ে আপনার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ভগবান সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দুজনে তাই আদালত থেকে ফিরে এসে আপনার চরণেই শরণ নিলাম।

একটা ছোট নালা লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিল-পত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল রমেশের হাতে দিয়া কাল সকালে আসিবে বলিয়া উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সুদূর ভবিষ্যতেও সে কখনো এত বড় আশা মনে ঠাঁই দেয় নাই। তাহার মীমাংসা ইহারা পরে গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু আজ যে ইহারা সরকারী আদালতের বাহিরে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে পথ হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বুক ভরিয়া আনন্দস্রোত ছুটাইয়া দিল। যদিও বেশী কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি তুচ্ছ বিবাদের কথা, কিন্তু এই তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিত্তের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির জন্য ভবিষ্যতে সে কি না করিতে পারিবে তাহার কোথাও কোন হিসাব-নিকাশ, কূল-কিনারা রহিল না। বাহিরে বসন্ত জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেদিক চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অন্য কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিত। কিন্তু আজ জ্বালা করা ত দূরের কথা, কোথাও সে একবিন্দু উত্তাপের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে এমন সার্থক করে তুলবেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হয়ে উঠবে, এ যদি তুমি জানতে রমা, বোধ করি কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না।—কে গা?

আমি রাধা ছোটবাবু! রমাদিদি অতি অবিশ্যি একবার দেখা দিতে বলেচেন।

রমা সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে। রমেশ অবাক হইয়া রহিল। আজ এ কোন্ নষ্টবুদ্ধি-দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাসৃষ্টি কৌতুক করিতেছেন!

দাসী কহিল, একবার দয়া করে যদি ছোটবাবু—

কোথায় তিনি?

ঘরে শুয়ে আছেন। একটু থামিয়া কহিল, কাল ত আর সময় হয়ে উঠবে না; তাই এখন যদি একবার—

আচ্ছা চল যাই, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। দাসীর নির্দ্দেশমত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া একটি চৌকি টানিয়া লইয়া বসিতেই সে শুদ্ধমাত্র যেন মনের জোরেই নিজেকে টানিয়া আনিয়া রমেশের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। ঘরের এককোণে মিটমিটে করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই মৃদু-আলোকে রমেশ অস্পষ্ট আকারে রমার যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতে শারীরিক অবস্থার কিছু জানিতে পারিল না। এই মাত্র পথে আসিতে আসিতে সে যে রকম সঙ্কল্প মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্মুখে বসিয়া তাহার আগাগোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছ রাণী?

রমা তাহার পায়ের গোড়া হইতে একটুখানি সরিয়া বসিয়া কহিল, আমাকে আপনি রমা বলেই ডাকবেন।

রমেশের পিঠে কে যেন একটা চাবুকের ঘা মারিল। সে একমুহূর্ত্তেই কঠিন হইয়া কহিল, বেশ, তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে—এখন কেমন আছ তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। নইলে নাম যাই হোক, সে ধ'রে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।

রমা সমস্ত বুঝিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন আমি ভাল আছি।

তার পরে কহিল, আমি ডেকে পাঠিয়েছি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য্য হয়েচেন, কিন্তু—

রমেশ কথার মাঝখানে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, না হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

কথাটা রমার বুকে যে কত বড় শেলাঘাত করিল তা রমেশ জানিতে পারিল না। সে মৌন-নতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। আমি তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেচি সে ত আমি জানি। কিন্তু তবু আমি নিশ্চয়ই জানতাম, তুমি আসবে আর আমার এই শেষ অনুরোধও অস্বীকার করবে না।

অশ্রুভারে সহসা তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে রমেশ টের পাইল এবং চক্ষের নিমিষে তাহার পূর্ব্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এত আঘাত-

প্রতিঘাতেও সে স্নেহ যে আজিও মরে নাই, শুধু নির্জ্জীব অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়া সে নিজেও আজ বিস্মিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, কি তোমার অনুরোধ?

রমা চকিতের মত মুখ তুলিয়াই আবার অবনত করিল। কহিল, যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্চেন, সেটা আমার নিজের, অর্থাৎ আমার পোনর আনা, তোমাদের এক আনা, সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ পুনর্বার উষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার ভয় নেই, আমি চুরি করতে পূর্ব্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও—তার জন্যে অন্য লোক আছে আমি দান গ্রহণ করিনে।

পূর্ব্বে হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, মুখুয্যেদের দান গ্রহণ করায় ঘোষালদের অপমান হয় না। আজ কিন্তু একথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল, জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্য নেবে না সেও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেচি, এটা তারই জরিমানা ব'লে কেন গ্রহণ কর না।

রমেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা কহিল, আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত ক'রে মানুষ ক'রো। বড় হ'য়ে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

রমেশের চিত্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল! রমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যতীনের দেহে তার পূর্ব্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ করবার যে শক্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে আছে শেখালে হয় ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার কোন উত্তর দিল না—জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরটা এমন একটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, যাহার সহিত কোনদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে রমেশ মুখ ফিরাইয়া কহিল, দেখ, এ সকলের মধ্যে আর আমাকে টেন না। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের পর একটুখানি আলোর শিখা জ্বালতে পেরেচি; তাই আমার কেবল ভয় হয় পাছে একটুতে তা নিবে যায়।

রমা কহিল, আর ভয় নেই রমেশদা, তোমার এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূরে থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা-বিঘ্ন পেয়েচ। আমরা নিজেদের দুর্গতির ভারে তোমাকে নাবিয়ে

এনে এখন ঠিক জায়গাটিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েচি। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচ বলেই তোমার ভয় হচ্চে, আগে হ'লে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাঁই পেত না। তখন তুমি গ্রাম্য সমাজের অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার ম্লান হবে না—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।

সহসা জ্যাঠাইমার নামে রমেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, ঠিক জানো কি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?

রমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, ঠিক জানি। যিনি সব জানেন এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আজ আশীর্ব্বাদ করে আমাকে বিদায় দাও রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারি।

বজ্রগর্ভ মেঘের মত রমেশের বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। রমা কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বল রাখবে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

রমা বলিল, আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন ঝগড়া ক'রো না।

রমেশ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে!

রমা কহিল, মানে যদি কখনও শুনতে পাও, সেদিন শুধু এই কথাটি মনে ক'রো, আমি কেমন ক'রে নিঃশব্দে সহ্য করে চ'লে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। এক দিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, মা, মিথ্যেকে ঘাটাঘাঁটি করে জাগিয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই আছে, তাঁর এই উপদেশটি মনে রেখে আমি সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই কাটিয়ে উঠেচি—এটি তুমিও কোনদিন ভুলো না রমেশদা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা ক্ষণেক পরে কহিল, আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না মনে করে দুঃখ ক'রো না রমেশদা। আমি নিশ্চয়ই জানি, আজ যা কঠিন বলে মনে হ'চ্চে একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে, সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্লেশ নাই। কাল আমি যাচ্চি।

কাল! রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে কাল?

রমা কহিল, জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেইখানেই যাব।

রমেশ কহিল, কিন্তু তিনি ত আর ফিরে আসবেন না শুনচি।

রমা ধীরে ধীরে বলিল, আমিও না। আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্চি।

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা যাও। কিন্তু কেন বিদায় চাইচ সেও কি জানতে পারব না?

রমা মৌন রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল, কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চলে গেলে সে তুমিই জানো। কিন্তু আমিও কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্য্যামীই জানেন।

রমার দুই চোখ বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই অত্যন্ত মৃদু-আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম্মের উৎসাহ যেন এক নিমেষে এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট ছায়াময় হইয়া গেছে।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ-বাড়িতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বিশ্বেশ্বরী যাত্রা করিয়া পালকিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে মুখ লইয়া অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী ডান হাত বাড়াইয়া রমেশের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা! তাতে কাজ নেই। তার পরে বলিলেন, এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালাচ্চি রমেশ।

রমেশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথায় সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটায় জননীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল এমন আর কোনদিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংসারে তার যে স্থান নেই বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্চি; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানি নে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা-জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা-দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন! এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর

পৃথিবীতে নেই। বলিতে-বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই!

রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরী একটু পরেই কহিলেন, কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস্‌নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনও অবিশ্বাস করিসনে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর কেউ নেই।

রমেশ বলিতে গেল, কিন্তু জ্যাঠাইমা—

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই রমেশ। তুই যা শুনেচিস্‌ সব মিথ্যে, যা জেনেচিস্‌ সব ভুল। কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ যেন সমস্ত অন্যায়, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ক'রে চিরদিন এমনি প্রবল হয়ে বয়ে যেতে পারে, এই তোর ওপর শেষ অনুরোধ। এইজন্যই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করে গেছে। প্রাণ দিতে বসেচে রে রমেশ, তবু কথা কয়নি।

গতরাত্রে রমার নিজের মুখের দুই-একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্জ্জয় রোদনের বেগ যেন ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া ফেলিল, তাকে ব'লো জ্যাঠাইমা, তাই হবে। বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোনমতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ-বৌ

বিরাজ-বৌ

১

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাম্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্ত্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি ছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনই একটা অখ্যাতিও ছিল। কিন্তু ছোটভাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে খর্ব্বকায় এবং কৃশ। মানুষ মরিয়াছে শুনিলেই তাহার সন্ধ্যার পর গা কেমন করিত। দাদার মত অমন মূর্খও নয়, গোঁয়ারতুমির ধার দিয়াও সে চলিত না। সকালবেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলীর আদালতের পশ্চিম দিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জ্জি লিখিয়া যা উপার্জ্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ি ফিরিয়া সেগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলিত। রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা স্বহস্তে বন্ধ করিত এবং স্ত্রীকে দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করাইয়া লইয়া তবে ঘুমাইত।

আজ সকালে নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার অনূঢ়া ভগিনী হরিমতি নিঃশব্দে আসিয়া পিঠের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া, আন্দাজ করিয়া এক হাত তাহার বোনের মাথার উপর রাখিয়া, সস্নেহে কহিল, সকালবেলাই কান্না কেন দিদি?

হরিমতি মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাখাইয়া দিতে দিতে জানাইল যে, বৌদি গাল টিপিয়া দিয়াছে এবং 'কাণী' বলিয়া গাল দিয়াছে।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তোমাকে 'কাণী' বলে? অমন দুটি চোখ থাকতে যে কাণা বলে, সেই কাণী। কিন্তু গাল টিপে দেয় কেন?

হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিছিমিছি।

মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি, বলিয়া বোনের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, বিরাজ-বৌ?

বড়বধূর নাম বিরাজ। তাহার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সকলে বিরাজ-বৌ বলিয়া ডাকিত। এখন তাহার বয়স উনিশ-কুড়ি। শাশুড়ীর মরণের পর হইতে সে গৃহিণী। বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। চার-পাঁচ বছর পূর্ব্বে

তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সেই অবধি সে নিঃসন্তান। রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল, স্বামীর ডাকে বাহিরে আসিয়া ভাইবোনকে একসঙ্গে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, পোড়ারমুখি আবার নালিশ করতে গিয়েছিলি ?

নীলাম্বর বলিল, কেন যাবে না ? তুমি 'কাণী' বলেছ ; সেটা তোমার মিছে কথা , কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন ?

বিরাজ কহিল, অত বড মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে, চোখে-মুখে জল দেওয়া নেই, কাপড ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। ওকে মারা উচিত।

নীলাম্বর বলিল, না। ঝিকে গয়লা-বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি দিদি, হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন ? ও কাজটা ত তোমার নয়।

হরিমতি দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনে করেছি দুধ দোযা হয়ে গেছে।

আব কোন দিন মনে ক'রো! বলিযা বিরাজ রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তুমিও একদিন ওর বয়সে মায়ের পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোব খুলে দিয়ে মনে করেছিলে, খাঁচার পাখি উডতে পারে না। মনে পডে।

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, পডে , কিন্তু ও বযসে নয়—আরও ছোট ছিলাম। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, চল না দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি, আম পাকল কি না।

তাই চল দিদি।

যদু চাকর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, নারায়ণ ঠাকুরদা বসে আছেন।

নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, এর মধ্যেই এসে বসে আছেন ?

রান্নাঘরের ভিতব হইতে বিরাজ এ কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া চেঁচাইযা বলিল, যেতে বলে দে বুড়োকে। স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, সকালবেলাই যদি ও-সব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কি সব হচ্ছে আজ-কাল!

নীলাম্বর জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভগিনীর হাত ধরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায়া সরস্বতী নদীর মৃদু স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্বাঙ্গ শৈবালে পরিপূর্ণ, শুধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশে-পাশে শৈবালমুক্ত অগভীর তলদেশের বিভক্ত শুক্তিগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের মত সূর্য্যালোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীরে

একখণ্ড কালো পাথর সমীপস্থ সমাধিস্তূপের প্রাচীর-গাত্র হইতে কোন এক অতীত দিনের বর্ষার খরস্রোতে স্খলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। এই বাড়ির বধূরা প্রতি সন্ধ্যায় তাহারই একাংশে মৃতাত্মার উদ্দেশে দীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। সে পাথর-খানির একধারে আসিয়া নীলাম্বর ছোটবোনটির হাত ধরিয়া বসিল। নদীর উভয় তীরেই বড় বড় আমবাগান এবং বাঁশঝাড়। দুই-একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ বট নদীর উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাখা মেলিয়া দিয়াছে। ইহাদের শাখায় কতকাল কত পাখি নিরুদ্বেগে বাসা বাঁধিয়াছে, কত শাবক বড করিয়াছে, কত ফল খাইয়াছে, কত গান গাহিয়াছে, তাহারই ছায়ায় বসিয়া, ভাই-বোন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, বৌদি কেন তোমাকে বোষ্টমঠাকুর ব'লে ডাকে?

নীলাম্বর গলায় তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি বোষ্টম ব'লে ডাকে?

হরিমতি অবিশ্বাস করিয়া বলিল, যাঃ—তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে। আচ্ছা, ভিক্ষে কেন করে দাদা?

নেই ব'লেই করে।

হরিমতি মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু নেই তাদের? তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই—কিচ্ছুটি নেই?

নীলাম্বর সস্নেহে হাত দিয়া বোনটির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া বলিল, কিচ্ছুটি নেই দিদি, কিচ্ছুটি নেই—বোষ্টম হ'লে কিচ্ছুটি থাকতে নেই।

হরিমতি বলিল, তবে সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না?

নীলাম্বর বলিল, তোর দাদাই কি কিছু তাদের দিয়েছে রে?

কেন দাও না দাদা, আমাদের ত এত আছে?

নীলাম্বর সহাস্যে বলিল, তবুও তোর দাদা দিতে পারে না; কিন্তু তুই যখন রাজার বৌ হবি দিদি, তখন দিস্।

হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, যাঃ।

নীলাম্বর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। মা-বাপ মরা এই ছোটবোনটিকে সে যে কত ভালবাসিত তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড়-বৌ-ব্যাটার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করেন। সেইদিন হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্ত্তন গাহিয়াছে, গাঁজা খাইয়াছে; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্ত্তের জন্য অবহেলা করে নাই।

এমন করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই হরিমতি মায়ের মত অসঙ্কোচে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদূরে পুরাতন ঝির গলা শোনা গেল—পুঁটি, বৌমা ডাকছেন, দুধ খাবে এস।

হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, দাদা, তুমি ব'লে দাও না, এখন দুধ খাব না।

কেন খাবে না দিদি?

হরিমতি বলিল, এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু যে গাল টিপে দেবে, সে ত বুঝবে না!

দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, পুঁটি!

নীলাম্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, যা, তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন, আমি ব'সে আছি।

হরিমতি অপ্রসন্ন-মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুরবেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বলে দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে না, সে খাবে না—শেষকালে কি না, মাছ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে!

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল, এই ত এত তরকারি হয়েচে!

এত কত! ঐ থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষমানুষে খেতে পারে? এ শহর নয় যে, সব জিনিস পাওয়া যাবে; পাড়াগাঁ, এখানে সম্বলের মধ্যে ঐ পুকুরের মাছ—তাও কি না তুমি ছেড়ে দিলে! পুঁটি, কোথায় গেলি? বাতাস করবি আয়—না, সে হবে না—আজ যদি একটি ভাত পড়ে থাকে ত তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব!

নীলাম্বর হাসিমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

বিরাজ রাগিয়া বলিল, কি হাস, আমার গা জ্বালা করে! দিন দিন তোমার খাওয়া কমে আসছে—সে খবর রাখ? গলায় হাড় বেরোবার জো হচ্চে, সে দিকে চেয়ে দেখ?

নীলাম্বর বলিল, দেখচি, ও তোমার মনের ভুল।

বিরাজ কহিল, মনের ভুল? তুমি গুনে একটি ভাত কম খেলে আমি বলে দিতে পারি, রত্তি-পরিমাণ রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধ'রে দিতে পারি তা জান? যা ত পুঁটি, পাখা রেখে রান্নাঘর থেকে তোর দাদার দুধ নিয়ে আয়।

হরিমতি একধারে দাঁড়াইয়া বাতাস শুরু করিয়াছিল, পাখা রাখিয়া দুগ্ধ আনিতে গেল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, ধর্ম্মকর্ম্ম করবার ঢের সময় আছে আজ ও-বাড়ির পিসীমা এসেছিলেন, শুনে বললেন, এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, গায়ের জোর কমে যায়—না না, সে হবে না, শেষকালে কি হ'তে কি হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে আমি দেব না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার হ যে তুই বেশী ক'রে খাস্ তা হ'লেই হবে।

বিরাজ রাগিয়া গিয়া বলিল, হাড়ি-কেওড়ার মত আবার তুইতোকারি!

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মনে থাকে না রে ছেলেবেলার অভ্যাস যেতে চায় না—কত তোর কান ম'লে দিয়েছি মনে আছে?

বিরাজ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে আবার নেই? ছোটটি পেয়ে আমার উপর কম অত্যাচার করেচ তুমি! বাবাকে লুকিয়ে, মাকে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে তুমি কত তামাক সাজিয়েছ! কত শয়তান লোক তুমি!

নীলাম্বর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, আজও সেই সব মনে আছে, কিন্তু তখন থেকেই তোকে ভালবাসতাম।

বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল, জানি, চুপ কর, পুঁটি আসচে।

হরিমতি দুধের বাটি পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। বিরাজ উঠিয়া গিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া স্বামীর সন্নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আমাকে পাখাটা দে পুঁটি—যা তুই খেলগে যা।

পুঁটি চলিয়া গেলে, বিরাজ বাতাস করিতে করিতে বলিল, সত্যি বলচি—অত ছোটবেলায় বিয়ে হওয়া ভাল নয়।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, কেন নয়? আমি ত বলি মেয়েদের খুব ছোটবেলায় বিয়ে হওয়াই ভাল।

বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমার কথা আলাদা, কেন না আমি তোমার হাতে পড়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার দুষ্টু বজ্জাত জা-ননদ ছিল না—আমি দশ বছর থেকেই গিন্নী। কিন্তু আর পাঁচজনের ঘরেও দেখছি ত, ঐ যে ছোটবেলা থেকে বকা-ঝকা, মার-ধোর শুরু হয়ে যায়—শেষে বড় হলেও সে দোষ ঘোচে না বকা-ঝকা থামে না। সেই জন্যেই ত আমি আমার পুঁটির বিয়ের নামটি করিনে, নইলে পরশুও রাজেশ্বরীতলার ঘোষালদের বাড়ি থেকে ঘটকী এসেছিল, সর্ব্বাঙ্গে গয়না—হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না—আরও দু-বছর থাক্।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুই কি পণ নিয়ে মেয়ে বেচবি না কি রে?

বিরাজ বলিল, কেন নেব না? আমার একটা ছেলে থাকলে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আনতে হ'ত না? আমাকে তোমরা তিনশ টাকা দিয়ে কিনে আনান?

ঠাকুরপোর বিয়েতে পাঁচশ টাকা দিতে হয়নি? না না, তুমি আমার ও-সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম, আমি তাই করব।

নীলাম্বর অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা—এ খবর কে তোকে দিলে? আমরা পণ দিই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিইনে—আমি পুঁটিকে দান করব।

বিরাজ স্বামীর মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, তাই ক'রো—এখন খাও—ছুতো ক'রে যেন উঠে যেও না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি ছুতো ক'রে উঠে যাই?

বিরাজ কহিল, না—একদিনও না। ও দোষটি তোমার শত্তুরেও দিতে পারবে না। এজন্যে কতদিন যে আমাকে উপোস ক'রে কাটাতে হয়েছে, সে ছোটবৌ জানে। ও কি? খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

বিরাজ ব্যস্ত হইয়া পাখাটা ফেলিয়া দিয়া দুধের বাটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মাথা খাও, উঠ না—ও পুঁটি শীগ্‌গির যা—ছোটবৌর কাছ থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে আয়—না না, ঘাড় নাড়লে হবে না—তোমার কখ্‌খন পেট ভরেনি—মাইরি বলচি, আমি তা হ'লে ভাত খাব না—কাল রাত্তির একটা পর্য্যন্ত জেগে সন্দেশ তৈরি করেচি।

হরিমতি একটা রেকাবিতে সবগুলা সন্দেশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া পাতের কাছে রাখিয়া দিল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বল, এতগুলো সন্দেশ এখন খেতে পারি?

বিরাজ মিষ্টান্নের পরিমাণ দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে খাও—পারবে।

তবু খেতে হবে।

বিরাজ কহিল, হাঁ। হয় মাছ ছাড়তে পাবে না, না হয় এ-জিনিসটা একটু বেশী ক'রে খেতেই হবে।

নীলাম্বর রেকাবটি টানিয়া লইয়া বলিল, তোর এই খাবার জুলুমের ভয়ে ইচ্ছে করে, বনে গিয়ে বসে থাকি।

পুঁটি বলিয়া উঠিল, আমাকেও দাদা—

বিরাজ ধমক দিয়া উঠিল, চুপ কর পোড়ারমুখি, খাবিনে ত বাঁচবি কি ক'রে? এই নালিশ করা বেরুবে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

২

মাস-দেড়েক পরে, পাঁচদিন জ্বর-ভোগের পর আজ সকাল হইতে নীলাম্বরের জ্বর ছিল না। বিরাজ বাসি কাপড় ছাড়াইয়া, স্বহস্তে কাচা কাপড় পরাইয়া দিয়া, মেঝেয় বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। নীলাম্বর জানালার বাহিরে একটা নারিকেল বৃক্ষের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। ছোট বোন হরিমতি কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিল। অনতিকাল পরেই স্নান করিয়া বিরাজ সিক্ত-চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিল। সমস্ত ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ও কি?

বিরাজ বলিল, যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পূজো পাঠিয়ে দিই গে, বলিয়া শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দিয়া স্বামীর কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, না, জ্বর নেই। জানিনে এ বছর মার মনে কি আছে। ঘরে ঘরে কি কাণ্ড যে শুরু হয়েছে—আজ সকালে শুনলাম, আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্ব্বাঙ্গে মার অনুগ্রহ হয়েছে—দেহে তিল রাখবার স্থান নেই।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মতির কোন ছেলের বসন্ত দেখা দিয়েছে?

বড় ছেলের। মা শীতলা, গাঁ ঠাণ্ডা কর মা!—আহা ঐ ছেলেই ওর রোজগারী। গেল শনিবারে শেষ রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ তোমার গায়ে হাত পড়ায় দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ভয়ে বুকের রক্ত কাঠ হয়ে গেল। উঠে ব'সে অনেকক্ষণ কাঁদলুম, তার পর মানত করলুম, মা শীতলা, ভাল যদি কর মা, তবেই ত তোমার পূজো দিয়ে আবার খাব-দাব, না হ'লে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তাই উপোস করে আছ নাকি?

পুঁটি কহিল, হাঁ দাদা, কিছু খায় না বৌদি—কেবল সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খেয়ে আছে—কারও কথা শোনে না।

নীলাম্বর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, এইগুলো তোমার পাগ্‌লামি নয়?

বিরাজ আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, পাগলামি নয়? আসল পাগলামি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে ত বুঝতে স্বামী কি বস্তু?—তখন বুঝতে, এমন দিনে তার জ্বর হ'লে বুকের ভিতরে কি করতে থাকে! বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া বলিল, পুঁটি, ঝি পূজো নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে যাস্ ত শীগ্‌গির করে নেয়ে নি গে।

পুঁটি আহ্লাদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাব বৌদি।

তবে দেরি করিস্‌নে, যা ঠাকুরের কাছে, তোর দাদার জন্যে বেশ ক'রে বর চেয়ে নিস্‌।

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে ও পারবে, বরং তোমার চেয়ে ওই ভাল পারবে।

বিরাজ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। বলিল, তা মনে ক'রো না। ভাই বল আর বাপ-মাই বল, মেয়েমানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ-মা গেলে দুঃখ-কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্ব্বস্ব যায়। এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি, তা দুর্ভাবনার চাপে একবার মনে হয়নি যে, উপোস ক'রে আছি—কিন্তু কৈ, ডাক ত তোমার কোন বোনকে দেখি কেমন—

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আবার!

বিরাজ বলিল, তবে বল কেন? পাগলামি করেচি কি—কি করেচি সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেচেন, তিনিই জানেন। আমি তা হ'লে একটি দিনও বাঁচতুম না, সিঁথের এ সিঁদুর তোলবার আগে সিঁথে পাথর দিয়ে ছেচে ফেলতুম। শুভযাত্রা ক'রে লোকে মুখ দেখবে না, শুভকর্ম্মে লোক ডেকে জিজ্ঞেস করবে না, এ দুটো শুধু হাত লোকের কাছে বের করতে পারব না, লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পারব না, ছি-ছি, সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা? সেকালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল, সে ছিল ঠিক কাজ। পুরুষমানুষে তখন মেয়েমানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতো, এখন বোঝে না।

নীলাম্বর কহিল, যা না, তুই বুঝিয়ে দি গে।

বিরাজ বলিল, তা পারি! আর শুধু আমিই কেন, তোমাকে পেয়ে যে কেউ তোমাকে হারাবে, সেই বুঝিয়ে দিতে পারবে—আমি একলা নয়। যাক, কি সব ব'কে যাচ্ছি, বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর একবার স্বামীর বুকের উত্তাপ, কপালের উত্তাপ হাত দিয়া অনুভব করিয়া বলিল, গায়ে কোথাও ব্যথা নেই ত?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

বিরাজ বলিল, তবে আর কোন ভয় নেই। আজ আমার ক্ষিদে পেয়েছে—যাই, এইবার দুটো রাঁধবার যোগাড় করি গে—সত্যি বলচি তোমাকে, আজ কেউ যদি আমার একখানা হাত কেটে দেয়, তা হ'লেও বোধ করি রাগ হয় না।

যদু চাকর বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, মা, কবিরাজমশাইকে এখন ডেকে আনতে হবে কি?

নীলাম্বর কহিল, না না, আর আবশ্যক নেই।

যদু তথাপি গৃহিণীর অনুমতির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, না, যা ডেকে নিয়ে আয়, একবার ভাল ক'রে দেখে যান।

দিন-তিনেক পরে আরোগ্যলাভ করিয়া নীলাম্বর বাহিরের চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়াছিল, মতি মোড়ল আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—দাদাঠাকুর, তুমি একবার না দেখলে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না। একবার পায়ের ধুলো দাও দেব্‌তা, তা হ'লে যদি এ-যাত্রা সে বেঁচে—আর সে বলিতে পারিল না—আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

নীলাম্বর জিজ্ঞসা করিল, গায়ে কি খুব বেশি বেরিয়েছে মতি?

মতি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল, সে আর কি বলব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েছেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুদ্দা, কিছুই ত জানিনি, কি করতে হয়—একবার চল, বলিয়া সে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া কোমলস্বরে বলিল, কিছু ভয় নেই মতি, তুই যা, আমি পরে যাব!

তাহার কান্নাকাটির কাছে সে নিজের অসুখের কথা বলিতে পারিল না। বিশেষ, সকল রকম রোগের সেবা করিয়া এ বিষয়ে তাহার এত অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, আশেপাশের গ্রামের মধ্যে কাহারও শক্ত অসুখ-বিসুখে তাহাকে একবার না দেখাইয়া, তাহার মুখের আশ্বাস-বাক্য না শুনিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা কিছুতেই ভরসা পাইত না। নীলাম্বর এ কথা নিজেও জানিত। ডাক্তার-কবিরাজের ঔষধের চেয়ে, দেশের অশিক্ষিত লোকের দল, তাহার পায়ের ধুলা, তাহার হাতের জলপড়াকে অধিক শ্রদ্ধা করে, ইহা সে বুঝিত বলিয়াই কাহাকেও কোনদিন ফিরাইয়া দিতে পারিত না। মতি মোড়ল আর একবার কাঁদিয়া, আর একবার পায়ের ধুলার দাবী জানাইয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল, নীলাম্বর উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার দেহ তখনও ঈষৎ দুর্ব্বল ছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। সে ভাবিতে লাগিল, বাড়ির বাহির হইবে কি করিয়া? বিরাজকে সে অত্যন্ত ভয় করিত, তাহার কাছে এ-কথা সে মুখে আনিবে কি করিয়া?

ঠিক এই সময়ে ভিতরের উঠান হইতে হরিমতির সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক আসিল, দাদা, বৌদি ঘরে এসে শুতে বলচে।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

মিনিট-খানেক পরেই হরিমতি নিজে আসিয়া হাজির হইল। বলল, শুনতে পাওনি দাদা?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিমতি কহিল, সেই চারটি খেয়ে পর্য্যন্ত বসে আছ, বৌদি বলচে, আর ব'সে থাকতে হবে না, একটু শোও গে।

নীলাম্বর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি করচে রে পুঁটি?

হরিমতি কহিল, এইবার ভাত খেতে বসেচে।

নীলাম্বর আদর করিয়া বলিল, লক্ষ্মী দিদি আমার, একটি কাজ করবি?

পুঁটি মাথা নাড়িয়া বলিল, করব।

নীলাম্বর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া কহিল, আস্তে আস্তে চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি।

চাদর আর ছাতি?

নীলাম্বর কহিল, হুঁ।

হরিমতি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ্ রে! বৌদি ঠিক এই দিকে মুখ ক'রে খেতে বসেছে যে!

নীলাম্বর শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, পারবিনে আনতে?

হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া দুই-তিনবার মাথা নাড়িয়া বলিল, না দাদা; দেখে ফেলবে; তুমি শোবে চল।

বেলা তখন প্রায় দুইটা, বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিকে চাহিয়া সে শুধু মাথায় পথে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না, হতাশ হইয়া ছোটবোনের হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি কিছুক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। নীলাম্বর চুপ করিয়া মনে মনে নানারূপ আবৃত্তি করিয়া দেখিতে লাগিল, কথাটা ঠিক কি রকম করিয়া পাড়িতে পারিলে খুব সম্ভব বিরাজের করুণার উদ্রেক করিবে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজ ঘরের শীতল মসৃণ সিমেণ্টের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া মগ্ন হইয়া মামা ও মামীকে চারপাতা-জোড়া পত্র লিখিতেছিল। কি করিয়া এ বাড়িতে শুদ্ধমাত্র মা শীতলার কৃপায় মরা বাঁচিয়াছে, কি করিয়া যে এ-যাত্রা সিঁথির সিঁদুর ও হাতের নোয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, লিখিয়া লিখিয়া ক্রমাগত লিখিয়াও সে কাহিনী শেষ হইতেছিল না, এমন সময় খাটের উপর হইতে নীলাম্বর হঠাৎ ডাকিয়া বলিল, একটি কথা রাখবে বিরাজ?

বিরাজ দোয়াতের মধ্যে কলমটা ছাড়িয়া দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কি কথা?

যদি রাখ ত বলি!

বিরাজ কহিল, রাখবার মত হ'লেই রাখবো—কি কথা?

নীলাম্বর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, ব'লে লাভ নেই বিরাজ, তুমি কথা আমার রাখ্‌তে পারবে না।

বিরাজ আর প্রশ্ন করিল না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পত্রটা শেষ করিবার জন্য আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু চিঠিতে মন দিতে পারিল না। ভিতরে ভিতরে কৌতূহলটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা বল, আমি কথা রাখ্‌ব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্তত করিল, তাহার পরে বলিল, দুপুর-বেলা মতি মোড়ল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। তাদের বিশ্বাস, আমার পায়ের ধুলো না পড়লে তার ছিমন্ত বাঁচবে না। আমাকে একবার যেতে হবে।

তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে?

কি করব বিরাজ, কথা দিয়েছি, আমাকে একবার যেতেই হবে।

কথা দিলে কেন?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ কঠিনভাবে বলিল, তুমি কি মনে কর, তোমাব প্রাণটা তোমাব একলার, ওতে কারও কিছু বলবার নেই? তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার?

নীলাম্বর কথাটা লঘু করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিবাব চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীর মুখেব পানে চাহিয়া তার হাসি আসিল না। কোনমতে বলিয়া ফেলিল, কিন্তু তার কান্না দেখলে—

বিরাজ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ঠিক ত! তার কান্না দেখলে—কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি! বলিয়া চারপাতা জোড়া চিঠিখানা তুলিয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, উঃ, পুরুষ-মানুষেরা কি! চার দিন চার রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটালুম—ও হাতে হাতে তার প্রতিফল দিতে চলল। ঘরে ঘরে জ্বর, ঘরে ঘরে বসন্ত—এই রোগা দেহ নিয়ে ও রোগী ঘাটতে চলল—আচ্ছা যাও, আমার ভগবান আছেন। বলিয়া আর একবার বালিশে বুক দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

নীলাম্বরের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে বলিল, সে ভরসা কি তোদের আছে বিরাজ, যে কথায় কথায় ভগবানের দোহাই পাড়িস্!

বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ক্রোধের স্বরে বলিল, না, ভগবানের উপর ভরসা শুধু তোমাদের একচেটে, আমাদের নয়। আমরা কীর্ত্তন গাইনে, তুলসীর মালা পরিনে, মড়া পোড়াইনে, তাই আমাদের নয়, একলা তোমাদের।

নীলাম্বর তাহার রাগ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, রাগ করিস্‌নে বিরাজ, সত্যিই তাই। তুই একা নয়—তোরা সবাই ওই! ভগবানের ওপর ভরসা ক'রে থাকতে যতটা জোরের দরকার ততটা জোর মেয়েমানুষের দেহে থাকে না—তাতে তোর দোষ কি?

বিরাজ আরও রাগিয়া বলিল, না, দোষ কেন, ওটা মেয়েমানুষের গুণ। কিন্তু গায়ের জোরের যদি এত দরকার ত বাঘ-ভালুকের গায়ে ত আরও জোর আছে।

আর জোর থাক্ ভাল, না থাক্ ভাল, এই রোগা দেহ নিয়ে তোমাকে আমি আজ বার হ'তে দেব না—তা তুমি যত তর্কই কর না কেন।

নীলাম্বর আর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বিরাজও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, বেলা গেল—যাই, বলিয়া উঠিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে দীপ জ্বালিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসিয়া দেখিল, স্বামী শয্যায় নাই। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, পুঁটি, তোর দাদা কইরে? যা বাইরে দেখে আয় ত।

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, মিনিট-পাঁচেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোথাও নেই—নদীর ধারেও না।

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ। তার পরে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল!

৩

বছর-তিনেক পরের কথা বলিতেছি! মাস-দুই পূর্ব্বে হরিমতি শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে, ছোট ভাই পীতাম্বর এক বাটীতে থাকিয়াও পৃথগন্ন হইয়াছে। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় সন্ধ্যার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সেখানে নীলাম্বর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিরাজ নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

কি?

বিরাজ বলিল, কি খেলে মরণ হয়, ব'লে দিতে পার?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, হয় ব'লে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল, কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছ?

শুকিয়ে যাচ্ছি কে বললে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিল, তারপরে বলিল, হাঁ গা, কেউ বলে দেবে তার পর আমি জানব, এ কি সত্য তোমার মনের কথা?

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল। নিজের কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, না রে, তা নয়। তবে তোর না কি বড় ভুল হয় তাই জিজ্ঞেস কচ্চি, এ কি আর কেউ বলেচে, না নিজেই ঠিক করেচিস্?

বিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। বলিল, কত

বললুম তোমাকে, পুঁটির আমার অমন জায়গায় বিয়ে দিও না—কিছুতেই কথা শুনলে না। নগদ যা ছিল গেল, আমার গায়ের গয়নাগুলো গেল, যদু মোড়লের দরুন ডাঙ্গাটা বাঁধা পড়ল, দুখানা বাগান বিক্রি করলে, তার উপর এই দু'সন অজন্মা। বল আমাকে কি ক'রে তুমি জামায়ের পড়ার খরচ মাসে মাসে যোগাবে? একটা কিছু হলেই পুঁটিকে খোঁটা সইতে হবে—সে আমার অভিমানী মেয়ে, কিছুতেই তোমার নিন্দে শুনতে পারবে না—শেষে কি হ'তে কি হবে, ভগবান জানেন—কেন তুমি এমন কাজ করলে?

নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তা ছাড়া পুঁটির ভাল করতে গিয়ে দিনরাত ভেবে ভেবে শেষে তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, দু-পাঁচ বিঘে জমি বিক্রি করে শ-পাঁচেক টাকা যোগাড় করে গলায় কাপড় দিয়ে জামায়ের বাপকে বল গে, এই নিয়ে আমাদের রেহাই দিন মশাই, আমরা গরীব, আর পারব না। এতে ভাল-মন্দ পুঁটির অদৃষ্টে যা হয় হোক।

তথাপি নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পারবে না বলতে?

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারি, কিন্তু সবই যদি বিক্রি করে ফেলি বিরাজ, আমাদের হবে কি?

বিরাজ বলিল, হবে আবার কি! বিষয় বাঁধা দিয়ে, মহাজনের সুদ আর মুখনাড়া সহ্য করার চেয়ে এ ঢের ভাল। আমার একটা ছেলেপিলে নেই যে তার জন্যে ভাবনা—আমরা দু'টো প্রাণী—যেমন করে হোক চলে যাবেই। নিতান্ত না চলে, তুমি বোষ্টমঠাকুর ত আছই, আমি না হয় বোষ্টমী হয়ে পড়ব—দুজনে কাশী-বৃন্দাবন ক'রে বেড়াব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুই কি করবি, মন্দিরা বাজাবি?

হাঁ বাজাব। নেহাত না পারি তোমার ঝুলি ব'য়ে বেড়াতে পারব ত? তোমার মুখের কৃষ্ণ নাম শুনে পশু-পক্ষী স্থির হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের দুটো প্রাণীর খাওয়া চলবে না? চল, ঘরে চল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছিনে।

ঘরে আসিয়া বিরাজ স্বামীর মুখের কাছে প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, না, সাহস হয় না। এমন বোষ্টমকে আর পাঁচজন বোষ্টমীর সামনে প্রাণ ধরে বার করতে পারব না—তার চেয়ে এখানে শুকিয়ে মরি সে ভাল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, ওরে সেখানে শুধু বোষ্টমীই থাকে না, বোষ্টমও থাকে।

বিরাজ বলিল, তা থাক্। একজন দুজন কেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ থাকু,

বলিয়া প্রদীপটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা শুনি, সংসারে সতী অসতী দুই-ই আছে—অসতী মেয়ে-মানুষ যখন চোখে দেখিনি—আমার বড় সাধ হয় দেখতে, তারা কি রকম! ঠিক আমাদের মত, না আর কোন রকম! তারা কি করে, কি ভাবে, কি খায়, কেমন ক'রে শুয়ে ঘুমোয়—এ-সব আমার দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, তুমি দেখেচ?

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি!

দেখেচ? আচ্ছা এই আমি যেমন ব'সে কথা কইচি, তারা কি এমনি করে ব'সে যার তার সঙ্গে কথা কয়?

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তা বলতে পারিনে—আমি ততটা দেখিনি।

বিরাজ ক্ষণকাল নির্নিমেষ চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া তাহার সর্ব্বশরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া বলিল, ও কি রে?

বিরাজ বলিল, উঃ—কি তারা! দুর্গা! দুর্গা! সন্ধ্যেবেলা কি কথা উঠে পড়ল—কৈ সন্ধ্যে করলে না?

নীলাম্বর বলিল, এই উঠি।

হাঁ যাও, হাত-পা ধুয়ে এস, আমি এই ঘরেই আসন পেতে ঠাঁই করে দিচ্ছি।

দিন পাঁচ-ছয় পরে রাত্রি দশটার সময় নীলাম্বর বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া ধূমপান করিতেছিল। বিরাজ সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া শুইবার পূর্ব্বে মেঝেয় বসিয়া নিজের জন্য খুব বড় করিয়া একটা পান সাজিতে সাজিতে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা শাস্তরের কথা কি সমস্ত সত্যি?

নীলাম্বর নলটা একপাশে রাখিয়া স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, শাস্ত্রের কথা সত্যি নয় ত কি মিথ্যে?

বিরাজ বলিল, না মিথ্যে বলচিনে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে?

নীলাম্বর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আমি পণ্ডিত নয় বিরাজ, সব কথা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়, যা সত্যি, তা সেকালেও সত্যি, একালেও সত্যি।

বিরাজ বলিল, আচ্ছা মনে কর সাবিত্রী-সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে যে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, এ কি সত্যি হ'তে পারে?

নীলাম্বর বলিল, কেন পারে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয়ই পারেন।

তা হ'লে আমিও ত পারি?

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই কি তাঁর মত সতী নাকি? তাঁরা হলেন দেবতা।

বিরাজ পানের বাটাটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, হলেনই বা দেবতা!

সতীত্বে আমিই বা তার চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে, কিন্তু মনে-জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, এ কথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে একতিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হ'ন আর যেই হ'ন।

নীলাম্বর জবাব দিল না, তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বিরাজ প্রদীপ সুমুখে আনিয়া পান সাজিতেছিল, তাহার মুখের উপর সমস্ত আলোটাই পড়িয়াছিল, সেই আলোকে নীলাম্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি এক রকমের আশ্চর্য্য জ্যোতি বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। নীলাম্বর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল, তা হ'লে তুমিও পারবে বোধ হয়।

বিরাজ উঠিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, এই আশীর্ব্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যথার্থ সতী হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি—তারপর, এই পায়ে মাথা রেখে যেন মরি—যেন এই সিঁদুর এই নোয়া নিয়েই চিতায় শুতে পাই।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হয়েচে রে বিরাজ, আজ?

বিরাজের দুই চোখে জল টল্ টল্ করিতেছিল, তৎসত্ত্বেও তাহার ওষ্ঠাধরে অতি মৃদু মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, আর একদিন শুনো, আজ নয়। আজ শুধু আশীর্ব্বাদ কর, মরণকালে যেন এই দুই পায়ের ধূলো পাই, যেন তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার মুখের পানে চেয়ে মরতে পারি।

সে আর বলিতে পারিল না। এইবারে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

নীলাম্বর ভয় পাইয়া তাহাকে জোর করিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, কি হয়েছে রে আজ? কেউ কিছু বলেছে কি?

বিরাজ স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। জবাব দিল না।

বিরাজ গোপনে চক্ষু মুছিল, কিন্তু মুখ তুলিল না, মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো।

নীলাম্বর আজ পীড়াপীড়ি করিল না, তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল! সে ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়া কিছু জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংসারে আর পূর্ব্বের সচ্ছলতা ছিল না। উপর্য্যুপরি দুই সন অজন্মা। গোলায় ধান নাই, পুকুরে জল নাই, মাছ নাই, কলা-বাগান শুকাইয়া উঠিতেছে, লেবু বাগানের কাঁচা লেবু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার উপর উত্তমর্ণেরা আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছিল এবং পুঁটির শ্বশুরও ছেলের পড়াশুনার খরচের জন্যে মিঠে-কড়া চিঠি পাঠাইতেছিলেন। এত কথা বিরাজ জানিত না। অনেক অপ্রীতিকর সংবাদই নীলাম্বর প্রাণপণে গোপন করিয়া

রাখিয়াছিল। এখন সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এই সমস্ত কথাই কেহ বিরাজকে শুনাইয়া গিয়াছে।

সহসা বিরাজ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল, কহিল, একটি কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবে?

নীলাম্বর মনে মনে অধিকতর শঙ্কিত হইয়া বলিল, কি কথা?

বিরাজের সমস্ত সৌন্দর্য্যের বড় সৌন্দর্য্য ছিল তার মুখের হাসি। সে সেই হাসি আর একবার হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কালো-কুচ্ছিত নই ত?

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

যদি কালো-কুচ্ছিত হতুম, তাহ'লে আমাকে কি এত ভালবাসতে?

এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া যদিও সে কিছু বিস্মিত হইল, তথাপি একটা গুরুতর ভার তার বুকের উপর হইতে যেন সহসা গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

সে খুশী হইয়া হাসিয়া বলিল, ছেলেবেলা থেকে একটি পরমাসুন্দরীকেই ভালবেসে এসেচি—কি করে বলব এখন, সে কালো-কুচ্ছিত হলে কি করতুম?

বিরাজ দুই বাহু দ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আরও সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল, আমি বলব কি করতে? তা হলেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাসতে?

তথাপি নীলাম্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তুমি ভাবছ, কি করে জানলুম—না?

এবার নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, ঠিক তাই ভাবছি—কি করে জানলে?

বিরাজ গলা ছাড়িয়া দিয়া বুকের একধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার মন ব'লে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি, তুমি নিজেকে তত চেন না। তাই জানি, আমাকে তুমি এমনই ভালবাসতে। যা অন্যায়, যাতে পাপ হয়, এমন কাজ তুমি কখনও করতে পার না—স্ত্রীকে ভাল না বাসা অন্যায়, তাই আমি জানি, যদি আমি কানা-খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদর পেতুম।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া সহসা হাত বাড়াইয়া আন্দাজ করিয়া স্বামীর চোখের কোণে অঙ্গুলি দিয়া বলিল, জল কেন?

নীলাম্বর তাহার হাতটি সযত্নে সরাইয়া দিয়া ভারি গলায় বলিল, জানলে কি ক'রে?

বিরাজ বলিল, ভুলে যাও কেন যে, আমার ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে! ভুলে যাও কেন যে, তোমাকে পেয়ে তবে আমি আমাকে পেয়েছি। নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে, আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি।

নীলাম্বর কথা কহিল না। আবার তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, ভেব না, মা মরণকালে তোমার হাতে পুঁটিকে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পুঁটির ভাল হবে বলে যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ—স্বর্গ থেকে মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। তুমি শুধু এখন সুস্থ হও, ঋণমুক্ত হও—যদি সর্ব্বস্ব যায় তাও যাক

নীলাম্বর চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে কহিলে, তুই জানিস্‌নে বিরাজ, আমি কি করেছি—আমি তোর—

বিরাজ বলিতে দিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, সব জানি আমি। আর জানি, না জানি, ভেবে ভেবে তোমাকে আমি রোগা হ'তে দিতে পারব না, সেটা নিশ্চয় জানি। না, সে হবে না—যার যা পাওনা দিয়ে দাও, দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, তার পরে মাথার উপর ভগবান আছেন, পায়ের নীচে আমি আছি।

নীলাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

৪

আরও ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। হরিমাতর বিবাহের পূর্ব্বেই ছোট ভাই বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল। নীলাম্বরের নিজের ভাগে যাহা পাড়য়াছিল তাহার কিয়দংশ সেই সময়েই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—বলা বাহুল্য, পীতাম্বর এক কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করে নাই। অবশিষ্ট জমি-জমা যাহা ছিল, তাহাই একটির পর একটি বন্ধক দিয়া নীলাম্বর বিবাহের শর্ত্ত পালন করিয়া ভগিনীপাতর পড়ার খরচ যোগাইতে লাগিল এবং সংসার চালাইতে লাগিল। এইরূপে দিন দিন নিজেকে ক্রমাগত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু মমতাবশে কোনমতেই পৈতৃক-সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ বৈকালে ও-পাড়ার ভোলানাথ মুখুয্যে আসিয়া বাকী সুদের জন্য কয়েকটা কথা কড়া করিয়াই বলিয়া গিয়াছিল, আড়ালে দাঁড়াইয়া বিরাজ তাহা সমস্তই শুনিল এবং নীলাম্বর ঘরে আসিতেই, সে রান্নাঘর হইতে নিঃশব্দে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে চাহিয়া নীলাম্বর মনে মনে প্রমাদ গনিল। ক্ষোভে অপমানে বিরাজের বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল; কিন্তু সে ভাব সে সংযত করিয়া হাত দিয়া খাট দেখাইয়া দিয়া প্রশান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, ঐখানে ব'স।

নীলাম্বর শয্যার উপর বসিতেই সে নীচে পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, হয় আমাকে ঋণমুক্ত কর, না হয় আজ তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করব।

নীলাম্বর বুঝিল, যে সমস্ত শুনিয়াছে, তাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, ছিঃ বিরাজ, সামান্যতেই আত্মহারা হ'সনে।

বিরাজ মুখের উপর হইতে তাহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, এতেও মানুষ আত্মহারা না হয় ত কিসে হয় বল শুনি ?

নীলাম্বর কি জবাব দেবে, হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, চুপ ক'রে রইলে কেন ? জবাব দাও ?

নীলাম্বর মৃদু-কণ্ঠে বলিল, জবাব দেবার কিছুই নেই বিরাজ, কিন্তু—

বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিছুতে হবে না। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে লোকে তোমাকে অপমান করে যাবে, কানে শুনে আমি সহ্য করে থাকব—এ ভরসা মনে ঠাঁই দিও না। হয় তার উপায় কর, না হয় আমি আত্মঘাতী হব।

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে কহিল, একদিনেই কি উপায় করব বিরাজ ?

বেশ, দুদিন পরে কি উপায় করবে, তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।

নীলাম্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, একটা অসম্ভব আশা ক'রে নিজেকে ভুল বুঝিয়ো না—আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না। যত দিন যাবে, ততই বেশী জড়িয়ে পড়বে, দোহাই তোমার, আমি ভিক্ষে চাইচি, তোমার দুটি পায়ে ধরচি, এই বেলা যা হয় একটা পথ কর। বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভুলু মুখুয্যের কথাগুলো তাহার বুকের ভিতরে শূল হানিতে লাগিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, অধীর হলে কি হবে বিরাজ ? একটা বছর যদি ষোল-আনা ফসল পাই, বার-আনা বিষয় উদ্ধার করে নিতে পারব ; কিন্তু বিক্রি করে ফেললে আর ত হবে না, সেটা ভেবে দেখ।

বিরাজ আর্দ্রস্বরে বলিল, দেখেচি ; আসচে বছরেই যে ষোল-আনা ফসল পাবে, তারই বা ঠিকানা কি ? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সইতে পারিনে।

নীলাম্বর নিজে তাহা বেশ জানিত, তাই কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ পুনরায় কহিল, শুধু এই কি আমার সমস্ত দুঃখ ? দিবারাত্রি ভেবে ভেবে তুমি আমার চোখের সামনে শুকিয়ে উঠচ, এমন সোনার মূর্ত্তি কালি হয়ে যাচ্চে ! আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে তুমিই বল, এও সহ্য করবার ক্ষমতা কি আমার আছে ? আর কতদিন যোগীনের পড়ার খরচ যোগাতে হবে ?

আরও একটা বছর। তা হ'লেই সে ডাক্তার হতে পারবে।

বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, পুঁটিকে মানুষ করেচি, সে আমার

রাজরাণী হ'ক, কিন্তু সে হতে আমার এতটা দুঃখ ঘটবে জানলে, ছেলেবেলায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতুম। এমন ক'রে নিজের মাথায় বাজ হানতুম না। হা ভগবান! বড়লোক তারা, কোন কষ্ট, কোন অভাব নেই, তবুও জোঁকের মত আমার বুকের রক্ত শুষে নিতে তাদের একটুকুও দয়া-মায়া হচ্চে না! বলিয়া একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিরাজ মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চারিদিকে অভাব, চারিদিকে আকাল, গরীব-দুঃখীরা ত এর মধ্যে কেউ উপোষ, কেউ একবেলা খেতে শুরু করেচে, এমন দুঃসময়েও আমরা পরের ছেলে মানুষ করব কেন? পুঁটির শ্বশুরের অভাব নেই, সে বড়লোক, সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে, আমরা পড়াব কেন? যা হয়েচে তা হয়েচে, তুমি আর ধার করতে পাবে না।

নীলাম্বর অতিকষ্টে শুষ্ক হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে টানিয়া আনিয়া বলিল, সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেচি যে! তার কি হবে?

বিরাজ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কিছু হবে না। শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন। আর আমি ত তোমার অর্দ্ধেক, যদি কিছু এতে পাপ হয় আমি আমার নিজের মাথায় নিয়ে জন্ম জন্ম নরকে ডুবে থাকব; তোমার কিছু ভয় নেই, তুমি আর ঋণ ক'রো না।

ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর অন্তরের নিদারুণ দুঃখের লেশমাত্রও তাহার অগোচর ছিল না, কিন্তু সে আর সহিতে পারিতেছিল না। যথার্থ-ই স্বামী তাহার সর্ব্বস্ব ছিল। সেই স্বামীর অহর্নিশ চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক অবসন্ন মুখের পানে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিতেছিল। এতক্ষণ কোনমতে সে কান্না চাপিয়া কথা কহিতেছিল, আর পারিল না। সবেগে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত বিরাজের মাথার উপরে রাখিয়া নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ কান্নার পরে তাহার দুঃখের দুঃসহ তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া আসিলে, সে তেমনি মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ছেলেবেলা থেকে যতদূর আমার মনে পড়ে, কোন দিন তোমার মুখ শুক্‌নো দেখিনি, কোন দিন তোমার মুখ ভার করতে দেখিনি, এখন তোমার পানে চাইলেই আমার বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলতে থাকে! তুমি নিজের পানে না চাও, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ! সত্যই কি শেষকালে আমাকে পথের ভিখারী করবে? সে কি তুমিই সইতে পারবে?

নীলাম্বর তথাপি উত্তর দিতে পারিল না, অন্যমনস্কের মত তাহার চুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে পুরানো ঝি সুন্দরী ডাকিয়া বলিল, বৌমা, উনুন জ্বেলে দেব কি?

বিরাজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী পুনরায় কহিল, উহুন জেলে দেব?

বিরাজ অস্পষ্টস্বরে বলিল, দে, তোদের জন্যে রাঁধতে হবে, আমি আর কিছু খাব না।

ঝি বড় গলায় নীলাম্বরকে শুনাইয়া বলিল, তুমি কি মা, তবে রাত্তিরে খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে! না খেয়ে খেয়ে যে একেবারে আধখানি হয়ে গেলে?

বিরাজ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরের দিকে লইয়া গেল।

জ্বলন্ত উহুনের আলো বিরাজের মুখের উপর পড়িয়াছিল। অদূরে বসিয়া সুন্দরী হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ বলিল, সত্যি কথা মা, তোমার মত রূপ আমি মানুষের কখনও দেখিনি, এত রূপ রাজা-রাজড়ার ঘরেও নেই।

বিরাজ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল, তুই রাজা-রাজড়ার ঘরের খবর রাখিস্?

সুন্দরীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপসী বলিয়া তাহারও এক সময়ে খ্যাতি ছিল, সে খ্যাতি আজিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

সে বলিল, কবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কবে বিধবা হইয়াছিল, কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু সধবার সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। তাহাদের গ্রাম কৃষ্ণপুরে এ সুখ্যাতিও তাহার ছিল। এখন হাসিয়া বলিল, রাজা-রাজড়ার ঘরের কতকটা খবর রাখি বৈ কি মা! না হ'লে সেদিন তাকে ঝাঁটা-পেটা করতুম!

এবার বিরাজ রীতিমত রাগ করিল, বলিল, তুই যখন তখন ঐ কথাই বলিস্ কেন সুন্দরী? তাদের যা খুশি বলেচে, তাতে বা ঝাঁটা-পেটা করবি কেন? আর আমাকেই বা না হ'ক শোনাবি কেন? উনি রাগী মানুষ, শুনলে কি বলবেন বল্ ত?

সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বাবু শুনবেন কেন মা? এও কি একটা কথার মত কথা?

কথার মত কথা নয়, সে কথা তুই আমাকে বুঝিয়ে বলবি? তা ছাড়া যা হয়ে-বয়ে চুকে শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তোলবার দরকারই বা কি?

সুন্দরী খপ করিয়া করিয়া বলিল, কোথায় চুকে-বুকে শেষ হয়েছে মা? কালও যে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে—

বিরাজ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, তুই গেলি কেন? তুই আমার কাছে চাকরি করবি, আর যে ডাকবে তার কাছে ছুটে যাবি? তুই নিজে না সেদিন বললি, তাঁরা সব কলকাতায় চ'লে গেছেন?

সুন্দরী বলিল, সত্যি কথাই বলেছিলুম মা। মাস-দুই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন, আবার দেখছি সব এসেছেন। আর যাবার কথা যদি বললে মা, পিয়াদা ডাকতে

এলো, না বলি কি ক'রে? তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার, আমরা দুঃখী প্রজা—হুকুম অমান্য করি কি ভরসায়?

বিরাজ ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার নাকি?

সুন্দরী সহাস্যে বলিল, হাঁ মা, এ মহলটা তাঁরাই কিনেচেন,—বাবু তাঁবু খাটিয়ে আছেন—তা সত্যি মা, রাজপুত্তুর ত রাজপুত্তুর! কিবা মুখ-চোখের—

বিরাজ সহসা থামাইয়া দিয়া বলিল, থাম থাম, চুপ কর্। ও-সব কথা তোকে জিজ্ঞেস করিনি—কি তোকে বললে, তাই বল।

সুন্দরী এবারে মনে মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, কি কথা আর হবে মা, কেবল তোমারই কথা।

হুঁ, বলিয়া বিরাজ চুপ করিয়া রহিল।

এইবার কথাটা বুঝাইয়া বলি। বছর-দুই পূর্ব্বে এই মহলটা কলিকাতার এক জমিদারের হস্তগত হয়, তাঁহার ছোটছেলে রাজেন্দ্রকুমার অতিশয় অসচ্চরিত্র এবং দুর্দ্দান্ত। পিতা তাহাকে কাজকর্ম্মে কতকটা শিক্ষিত ও সংযত করিতে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই কাছাকাছি কোন একটা মহালে প্রেরণ করিতে চাহেন। গত বৎসর সে এইখানে আসে। রীতিমত কাছারি-বাটী না থাকায়, সে সপ্তগ্রামের পরপারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা আমবাগানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে কাজকর্ম্ম শিখিবার ধার দিয়া চলে নাই। পাখি শিকার করিতে ভালবাসিত, হুইস্কির ফ্লাস্ক পিঠে বাঁধিয়া বন্দুক ও চার-পাঁচটা কুকুর লইয়া, সমস্ত দিন নদীর ধারে বনে বনে পাখি মারিয়া বেড়াইত। এই অবস্থায় মাস ছয়েক পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলির স্বর্ণাভামণ্ডিত সিক্তবসনা বিরাজের উপর তাহার চক্ষু পড়ে। বিরাজের এই ঘাটটি চারিদিকে বড় বড় গাছে আবৃত থাকায় কোন দিক হইতে দেখা যাইত না, বিরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ-কলস তুলিয়া লইয়া উপর দিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিচিত লোকটির সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। রাজেন্দ্র পাখির সন্ধান করিতে করিতে এদিকে আসিয়াছিল, অদূরবর্ত্তী সমাধিস্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া সে বিরাজকে দেখিল। মানুষের এত রূপ হয়, সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু আর সে চোখ ফিরাইতে পারিল না। অপলক দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি মগ্ন হইয়া পান করিতে লাগিল। বিরাজ আর্দ্রবসনে কোনমতে লজ্জানিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, রাজেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল। এই অরণ্য-পরিবৃত, ভদ্রসমাজ-পরিত্যক্ত ক্ষুদ্রপাড়াগাঁয়ের মধ্যে এত রূপ কেমন করিয়া

কি করিয়া আসিল! এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ীর পরিচয় সে সন্ধান করিয়া সেই রাত্রেই জানিয়া লইল এবং তখন হইতেই এই একমাত্র চিন্তা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা রহিল না। ইহার পর আরও দুইবার বিরাজের চোখে চোখে পড়িয়াছিল।

বিরাজ বাড়িতে আসিয়া সুন্দরীকে ডাকিয়া বলিল, যা ত সুন্দরী, ঘাটের ধারে কে একটা লোক পরীস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মানা ক'রে দি গে, যেন আর কোনদিন আমাদের বাগানে না ঢোকে।

সুন্দরী মানা করিতে আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিল, বাবু আপনি!

রাজেন্দ্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি?

সুন্দরী বলিল, আজ্ঞে হাঁ বাবু, আপনাকে আর কে না চেনে?

আমি কোথায় থাকি, জান?

সুন্দরী কহিল, জানি।

রাজেন্দ্র বলিল, আজ একবার ওখানে আসতে পার?

সুন্দরী সলজ্জ হাস্যে মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবু?

দরকার আছে, একবার যেও, বলিয়া রাজেন্দ্র বন্দুক কাঁধে তুলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর অনেকবার সুন্দরী গোপনে, নিভৃতে ওপারের জমিদার কাছারিতে গিয়াছে, অনেক কথা কহিয়াছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া এক-আধটু ইঙ্গিতে ভিন্ন কোন কথা বিরাজের সামনে উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। সুন্দরী নির্ব্বোধ ছিল না; সে বিরাজ-বৌকে চিনিত। বাহির হইতে এই বধূটিকে যতই মধুর এবং কোমল দেখাক না কেন, ভিতরের প্রকৃতি যে তাহার উগ্র এবং পাথরের মত কঠিন ছিল, সুন্দরী তাহা ঠিক জানিত। বিরাজের দেহে আরও একটা বস্তু ছিল, সে তাহার অপরিমেয় সাহস। তা সে মানুষই হোক, আর সাপ-খোপ, ভূত-প্রেতই হোক, ভয় কাহাকে বলে তাহা সে একেবারেই জানিত না। সুন্দরী কতকটা সে কারণেও এতদিন আর তাহার মুখ খুলিতে পারে নাই।

বিরাজ উনুনের কাঠটা ঠেলিয়া দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আচ্ছা সুন্দরী, তুই ত অনেক বার সেখানে গিয়েছিস, এসেছিস্, অনেক কথাও কয়েছিস্, কিন্তু আমাকে ত একটি কথাও বলিস্‌নি?

সুন্দরী প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া কহিল, কে তোমাকে বললে মা, আমি অনেক কথা কয়ে এসেছি?

বিরাজ বলিল, কেউ বলেনি, আমি নিজেই জান। আমাদের কপালের পেছনে আর দুটো চোখ-কান আছে। বাল, কাল ক'টাকা বর্কশিশ্ নিয়ে এলি? দশ টাকা?

সুন্দরী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে একটা পাণ্ডুর ছায়া

পড়িল, উনুনের অস্পষ্ট আলোকেও বিরাজ তাহা দেখিল এবং সে যে কথা খুঁজিয়া পাইতেছে না, তাহাও বুঝিল।

ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সুন্দরী, তোর বুকের পাটা এত বড় হবে না যে, তুই আমার কাছে মুখ খুলবি, কিন্তু কেন মিছে আনাগোনা ক'রে টাকা খেয়ে শেষে বড়লোকের কোপে পড়বি? কাল থেকে এ-বাড়িতে আর ঢুকিস্‌নে। তোর হাতের জল পায়ে ঢালতেও আমার ঘেন্না করে। এতদিন তোর সব কথা জানতুম না, দুদিন আগে তাও শুনেছি। কিন্তু যা, আঁচলে যে দশ টাকার নোট বাঁধা আছে, ফিরিয়ে দি গে, দিয়ে দুঃখী মানুষ, দুঃখ-ধান্দা করে খা গে। নিজে বয়সকালে যা করেচিস্‌, সে ত আর ফিরবে না, কিন্তু আর পাঁচজনের সর্ব্বনাশ করতে যাস্‌নে।

সুন্দরী কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার জিভ মুখের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

বিরাজ তাহাও দেখিল। দেখিয়া বলিল, মিথ্যে কথা বলে আর কি হবে? এ-সব কথা আমি কাউকে বলব না। তোর আঁচলে বাঁধা নোট কোথা থেকে এল, সে কথা আমি আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন সব বুঝতে পাচ্চি। যা, আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম—কাল আর আমার বাড়ি ঢুকিসনে।

এ কি কথা! নিদারুণ বিস্ময়ে সুন্দরী বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। এ-বাটীতে তাহার কাজ গেল, এমন অসম্ভব কথা সে মনের মধ্যে ঠিক মত গ্রহণ করিতেও পারিল না। সে অনেক দিনের দাসী। সে বিরাজের বিবাহ দিয়াছে, হরিমতিকে মানুষ করিয়াছে, গৃহিণীর সহিত তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে—সেও যে এ-বাটীর একজন। আজ তাহাকেই বিরাজ-বৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ক্ষোভ এবং অভিমান তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল—এক মুহূর্ত্তে কত রকমের জবাব-দিহি, কত রকমের কথা তাহার জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির করিতে পারিল না—বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

বিরাজ মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু সেও কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হাঁড়ির জল কমিয়া গিয়াছে। অদূরে একটা পিতলের কলসীতে জল ছিল; ঘটি লইয়া তাহার কাছে আসিল, কিন্তু কি ভাবিয়া একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ঘটিটা রাখিয়া দিল—না, তোর হাতের জল ছুঁলে ওঁর অকল্যাণ হবে—তুই ঐ হাত দিয়ে টাকা নিয়েছিস্‌।

সুন্দরী এ তিরস্কারের উত্তরও দিতে পারিল না।

বিরাজ আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া কলসীটা তুলিয়া লইয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারে আমবাগানের ভিতর দিয়া একা নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। বিরাজ চলিয়া গেল, সুন্দরীর একবার মনে হইল, সে পিছনে যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ বন-পথ,

চারিদিকের প্রাচীর, সপ্তগ্রামের জানা-অজানা সমাধিস্তূপ, ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ—সমস্ত দৃশ্যটা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইবামাত্র তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে 'মা গো!' বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

৫

দিন-দুই পরে নীলাম্বর বলিল, সুন্দরীকে দেখছি নে কেন বিরাজ?

বিরাজ বলিল, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর পরিহাস মনে করিয়া বলিল, বেশ করেচ। বল না কি হয়েচে তার?

বিরাজ বলিল, কি আবার হবে, আমি সত্যি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর তথাপি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, তাকে ছাড়িয়ে দেবে কি করে? আর সে যত দোষই করুক, কতদিনের পুরনো লোক, তা জান? কি করেছিল সে?

বিরাজ বলিল, ভাল বুঝেচি তাই ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর বিরক্ত হইয়া বলিল, কিসে ভাল বুঝলে, তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

বিরাজ স্বামীর মনের ভাব বুঝিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি ভাল বুঝেচি—ছাড়িয়ে দিয়েচি, তুমি ভাল বুঝ, ফিরিয়ে আন গে। বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর বুঝিল, বিরাজ রাগিয়াছে, আর কোন কথা কহিল না। সে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দরজার বাহিরে দাড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু ছাড়িয়ে যে দিলে, কাজ করবে কে?

এবার বিরাজ মুখ ফিরাইয়া হাসিল। তাহার পর বলিল, তুমি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তবে দাও, এঁটো বাসনগুলো মেজে ধুয়ে আনি।

বিরাজ হাতের খুন্তিটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া হাত ধুইয়া কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল, যাও তুমি এখান থেকে। একটা তামাশা করবার জো নেই—তা হলেই এমন কথা বলে বসবে যে, কানে শুনলে পাপ হয়।

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, এও কানে শুনলে পাপ হয়? তোর পাপ যে কিসে হয় না, তা ত বুঝিনে বিরাজ!

বিরাজ বলিল, তুমি সব বোঝ। না বুঝলে এত কাজ থাকতে এঁটো বাসনের কথা তুলতে না—যাও, আর বেলা ক'রো না, স্নান করে এসো—আমার রান্না হয়ে গেছে।

নীলাম্বর চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, সত্যি কথা বিরাজ, সংসারের কাজকর্ম করবে কে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া বলিল, কাজ আবার কোথায়? পুঁটি নেই, ঠাকুরপোরা নেই, আমিই ত কাজের অভাবে সারাদিন ব'সে কাটাই। বেশ ত, কাজ যখন আটকাবে তখন তোমাকে জানাব।

নীলাম্বর বলিল, না বিরাজ, সে হবে না, দাসী-চাকরের কাজ আমি তোমায় করতে দিতে পারব না। সুন্দরী কোন দোষ করেনি, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্য তুমি তাকে সরিয়েছ, বল সত্যি কিনা?

বিরাজ বলিল, না সত্যি নয়। সে যথার্থই দোষ করেছে।

কি দোষ?

তা আমি বলব না। যাও ব'সে থেক না, স্নান ক'রে এসো। বলিয়া বিরাজ দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরকে একভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কৈ, গেলে না? এখন বসে আছ যে?

নীলাম্বর মৃদুস্বরে বলিল, যাই—কিন্তু বিরাজ, এ ত আমি সইতে পারব না, তোমাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেব কি ক'রে?

কথাটা শুনিয়া বিরাজ খুশী হইল না। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি করবে শুনি?

সুন্দরীকে না চাও, আর কোন লোক রাখি—তুমি একাই বা থাকবে কি করে?

যেমন ক'রেই থাকি না কেন, আমি আর লোক চাইনে।

নীলাম্বর বলিল, না, সে হবে না। যতদিন সংসারে আছি ততদিন মান-অপমানও আছে, পাড়ার লোক শুনলে কি বলবে?

বিরাজ অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, পাড়ার লোকে শুনলে কি বলবে এইটাই তোমার আসল ভয়। আমি কি ক'রে থাকব, আমার দুঃখ-কষ্ট হবে, এ কেবল তোমার একটা—ছল।

নীলাম্বর ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, ছল?

বিরাজ বলিল, হাঁ ছল। আজকাল আমি সব জেনেছি। আমার মুখের দিকে যদি চাইতে, আমার দুঃখ ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুনতে, তা হ'লে আমার এ অবস্থা হ'ত না।

নীলাম্বর বলিল, তোমার একটা কথাও শুনি নি?

বিরাজ জোর করিয়া বলিল, না, একটাও না। যখন যা বলেচি, তাই কোন-না-কোন ছল ক'রে উড়িয়ে দিয়েচ—তুমি কেবল ভেবেচ নিজের পাপ হবে, মিথ্যা কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে—একবার ভেবেচ কি, আমার কি হবে?

নীলাম্বর বলিল, আমার পাপ কি তোমার পাপ নয়, আমার অপযশে কি তোমার অপযশ হবে না?

এবার বিরাজ রীতিমত ক্রুদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণভাবে বলিল, দেখ, ও-সব ছেলে ভুলানো কথা—ওতে ভোলবার বয়স আমার আর নেই। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, কেবল তুমি নিজের কথা ভাব, আর কিছু ভাব না। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ-কথা মুখ দিয়ে বার করতে হ'ল—আজ নিজের ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্চে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দুটো ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি ক'রে বেড়াতে হবে! তবে একটা কথা এই যে, সে তোমাকে চোখে দেখতেও হবে না, কানে শুনতেও হবে না —কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জাও হবে না, ভাবনা-চিন্তা করবারও দরকার নেই—এই না?

নীলাম্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটির দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ কখনও তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ-কষ্ট হয়েচে ব'লেই রাগ করে বলচ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না, এ তুমি ঠিক জান।

বিরাজ বলিল, তাই আগে জানতুম বটে, কিন্তু কষ্ট যে কি, তা কষ্টে না পড়লে যেমন ঠিক বোঝা যায় না, পুরুষমানুষের মায়া-দয়াও তেমনই, সময় না হলে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার সঙ্গে এই দুপুরবেলায় আমি রাগারাগি করতে চাইনে—যা বলচি তাই কর, যাও নেয়ে এসো।

যাচ্চি, বলিয়াও নীলাম্বর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, আজ ন বছর হ'তে চলল, পুঁটির আমার বিয়ে হয়েচে। তার আগে থেকে আজ পর্য্যন্ত সব কথা সেদিন আমি মনে মনে ভেবে দেখেছিলুম —আমার একটি কথাও তুমি শোননি। যখন যা কিছু বলেচি, সমস্তই একটা একটা করে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ ক'রে গেছ। লোকে বাড়ির দাসী-চাকরেরও একটা কথা রাখে, কিন্তু তুমি তাও আমার রাখনি।

নীলাম্বর কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কত বড় ঘেন্নায় যে আমি ইষ্টদেবতার নাম ক'রে দিব্যি করেচি, তোমাকে আর একটি কথাও বলতে যাব না, সে কথা তুমি শুনতে পেতে না, আজ যদি না কথায় কথা উঠে পড়ত। এখন হয়ত তোমার মনে পড়বে না, কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন আমি মাথার ব্যথায় ঘুমিয়ে পড়ি; তোমাকে দোর খুলে দিতে দেরি হয়েছিল বলে মারতে উঠেছিলে, আমার অসুখের কথা বিশ্বাস করনি। সেইদিন থেকে দিব্যি করেছিলুম, অসুখের কথা আর জানাব না—আজ পর্য্যন্ত সে দিব্যি ভাঙিনি।

নীলাম্বর মুখ তুলিতেই দু'জনের চোখাচোখি হইয়া গেল। সে সহসা উঠিয়া

আসিয়া বিরাজের হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিয়া উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিল, সে হবে না। বিরাজ, কখনও তোমার দেহ ভাল নেই। কি অসুখ হয়েচে বল—বলতেই হবে।

বিরাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ছাড়, লাগছে।

লাগুক, বল কি হয়েছে?

বিরাজ শুষ্কভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কই কিছুই ত হয়নি, বেশ আছি।

নীলাম্বর অবিশ্বাস করিয়া বলিল, না, কিছুতেই তুমি বেশ নাই। না হ'লে কখনও তুমি সেই কত বৎসরের পুরনো কথা তুলে আমার মনে কষ্ট দিতে না—বিশেষ যার জন্যে কতদিন কত মাপ চেয়েছি।

আচ্ছা, আর কোন দিন বলব না, বলিয়া বিরাজ নিজেকে মুক্ত করিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল।

নীলাম্বর তাহার অর্থ বুঝিল; কিন্তু আর কিছু বলিল না। তারপর মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

রাত্রে প্রদীপের আলোকে বসিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতেছিল। নীলাম্বর খাটের উপর শুইয়া নিঃশব্দে তাহাকে দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল, এ-জন্মে তোমার ত কোন দোষ-অপরাধ শত্রুতেও দিতে পারে না, কিন্তু তোমার পূর্ব্বজন্মের পাপ ছিল, না হ'লে কিছুতেই এমন হ'ত না!

বিরাজ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ত না?

নীলাম্বর কহিল, তোমার সমস্ত দেহ-মন ভগবান রাজরাণীর উপযুক্ত করে গড়েছিলেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ একমুহূর্ত্ত উত্তরের আশায় থাকিয়া রুক্ষ স্বরে বলিল, এ খবর কখন তোমাকে ভগবান দিয়ে গেলেন?

নীলাম্বর কহিল, চোখ-কান থাকলে ভগবান সকলকেই খবর দেন।

হুঁ। বলিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতে লাগিল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তখন বলছিলে, আমি কোন কথা তোমার শুনিনে, হয়ত তাই সত্যি, কিন্তু তা কি শুধু একলা আমারই দোষ?

বিরাজ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, বেশ ত, আমার দোষটাই দেখিয়ে দাও?

নীলাম্বর বলিল, তোমার দোষ দেখাতে পারব না; কিন্তু আজ একটা সত্য কথা বলব। তুমি নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা ক'রে দেখ; কিন্তু এটা ত একবার

ভেবে দেখ না, তোমার মত কটা মেয়েমানুষ এমন নিগুর্ণ মূর্খের হাতে পড়ে? এইটেই তোমার পূর্ব্বজন্মের পাপ, নইলে তোমার ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়।

বিরাজ নিঃশব্দে চিঠি লিখিতে লাগিল। বোধ করি সে মনে করিল, ইহার জবাব দিবে না, কিন্তু থাকিতে পারিল না। মুখ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুনলে আমি খুশী হই?

কি সব কথা?

বিরাজ বলিল, এই যেমন রাজরাণী হ'তে পারতুম—শুধু তোমার হাতে প'ড়েই এমন হয়েচি, এই সব। মনে কর, এ শুনলে আমার আহ্লাদ হয়, না, যে বলে, তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে?

নীলাম্বর দেখিল, বিরাজ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে সে আশা করে নাই, তাই মনে মনে সঙ্কুচিত এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, কিন্তু কি বলিয়া প্রসন্ন করিবে, সহসা তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

বিরাজ বলিল, রূপ, রূপ, রূপ শুনে শুনে কান আমার ভোঁতা হয়ে গেল। কিন্তু আর যারা বলে, তাদের না হয় এইটেই সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু তুমি স্বামী, এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে ধ'রে এত বড় হয়েচি, তুমিও কি এর বেশী আমার আর কিছু দেখ না? এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় বস্তু? তুমি কি ব'লে এ কথা মুখে আন? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না, এই দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাই?

নীলাম্বর অত্যন্ত ভয় পাইয়া থতমত খাইয়া বলিতে গেল, না না, তা নয়—

বিরাজ কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই। সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হ'লে ভালবাসতে কিনা—মনে পড়ে?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পড়ে, কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—

বিরাজ বলিল, হাঁ বলেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হলেও ভালবাসতে, কেন না, আমাকে বিয়ে করেছ। গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বউ, আমাকে এ সব কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না? এর পূর্ব্বেও আমাকে তুমি এ কথা বলেচ। বলিতে বলিতে তাহার ক্রোধে অভিমানে চোখে জল আসিয়া পড়িল, এবং জল প্রদীপের আলোকে চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

বিরাজ নিজেই একদিন বলিয়া দিয়াছিল, তিনি হাত ধরিলে আর তার রাগ থাকে না।

নীলাম্বর সেই কথা হঠাৎ স্মরণ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সেই রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে জাগিয়াছিল। এক সময়ে নীলাম্বর সহসা স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ কেন অত রাগ করলে বিরাজ?

বিরাজ জবাব দিল, কেন তুমি ওসব কথা বললে?

নীলাম্বর বলিল, আমি ত মন্দ কথা বলিনি।

বিরাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, অধীরভাবে বলিল, তবু বলবে মন্দ কথা নয়? খুব মন্দ কথা। এই জন্যেই সুন্দরীকে—

সে আর বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, শুধু এই দোষেই তাকে তাড়িয়ে দিলে?

হুঁ, বলিয়া বিরাজ চুপ করিল।

নীলাম্বর আর প্রশ্ন করিল না।

তখন বিরাজ নিজেই বলিল, দেখ, জেরা ক'রো না—আমি কচি খুকি নই—ভাল-মন্দ বুঝি। তাড়াবার মত দোষ করেছে বলেই তাড়িয়েছি। কেন, কি বৃত্তান্ত, এত কথা তুমি পুরুষমানুষ নাই শুনলে।

না, আর শুনতে চাইনে, বলিয়া নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পৃথগন্ন হইবার দুই-চার মাস পরেই ছোট ভাই পীতাম্বর বাটীর মাঝখানে দরমা ও চেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া নিজের অংশ আলাদা করিয়া লইয়াছিল। দাক্ষিণদিকে দরজা ফুটাইয়া এবং তাহার সম্মুখে ছোট বৈঠকখানা-ঘর করিয়া সে সর্ব্বরকমে নিজের বাড়িটিকে বেশ মানান-সই ঝরঝরে করিয়া লইয়া মহা-আরামে জীবন-যাপন করিতেছিল। কোনদিনই প্রায় সে দাদার সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা বলিত না। এখন সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এদিকে বিরাজের প্রায় সমস্তদিন একলাটি কাটাইতে হইত। সুন্দরীর যাওয়ার পর হইতে শুধু যে সমস্ত কাজ-কর্ম্ম তাহাকেই করিতে হইত তাহা নহে, যে সব কাজ পূর্ব্বে দাসীতে করিত, সেইগুলা লোকলজ্জাবশতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাকে সমাধা করিয়া লইবার জন্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত। এমনই একদিন কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ ও-বাড়ি হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি! রাত যে অনেক হয়েচে।

বিরাজ চমকিয়া মুখ তুলিল। যে ডাকিয়াছিল, সে তেমনিই মৃদুস্বরে আবার কহিল, দিদি, আমি মোহিনী?

বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কে, ছোটবৌ! এত রাত্তিরে?

হাঁ দিদি, আমি, একবারটি কাছে এসো।

বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতেই ছোটবৌ চুপি চুপি বলিল, দিদি, বট্‌ঠাকুর ঘুমিয়েছেন?

বিরাজ বলিল, হাঁ।

মোহিনী বলিল, দিদি, একটা কথা আছে, কিন্তু বলতে পাচ্ছিনে, বলিয়া চুপ করিল।

বিরাজ তাহার কণ্ঠের স্বরে বুঝিল, ছোটবৌ কাঁদিতেছে, চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে ছোটবৌ

ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না, বোধ করি সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল এবং নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল।

বিরাজ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, কি ছোটবৌ?

এবার সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিল, বট্‌ঠাকুরের নামে নালিশ হয়েচে, কাল শমন নাকি বার হবে, কি হবে দিদি?

বিরাজ ভয় পাইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, শমন বার হবে, তার আর ভয় কি ছোটবৌ?

ভয় নেই দিদি?

ভয় আর কি? কিন্তু নালিশ করলে কে?

ছোটবৌ বলিল, ভুলু মুখুয্যে।

বিরাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, যাক, আর বলতে হবে না—বুঝেচি। মুখুয্যেমশাই ওঁর কাছে টাকা পাবেন, তাই বোধ করি নালিশ করেছেন। কিন্তু তাতে ভয়ের কথা নেই ছোটবৌ। তারপর উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে ছোটবৌ কহিল, দিদি, কোনদিন তোমার সঙ্গে বেশী কথা কইনি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই—আজ ছোট বোনের একটি কথা রাখবে দিদি?

তাহার কণ্ঠস্বরে বিরাজ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, এখন অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, কেন রাখব না বোন?

তবে একটিবার হাত পাত। বিরাজ হাত পাতিতেই একটি ক্ষুদ্র কোমল হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া তাহার হাতের উপর একছড়া সোনার হার রাখিয়া দিল।

বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন ছোটবৌ?

ছোটবৌ কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, এইটে বিক্রি করে হোক, বাঁধা দিয়ে হোক, ওর টাকা শোধ করে দাও দিদি।

এই আকস্মিক অযাচিত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সহানুভূতিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাজ অভিভূত হইয়া পড়িল—কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু—তললুম দিদি, বলিয়া

ছোটবৌ সরিয়া যায় দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া উঠিল, যেও না ছোটবৌ, শোন।

ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন দিদি?

বিরাজ সেই ফাঁকটা দিয়া তৎক্ষণাৎ অপরদিকে হারটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, ছি, এ-সব করতে নেই।

ছোটবৌ তাহা তুলিয়া লইয়া ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, কেন করতে নেই?

বিরাজ বলিল, ঠাকুরপো শুনলে কি বলবেন?

কিন্তু তিনি ত শুনতে পাবেন না?

আজ না হোক, দুদিন পরে জানতে পারবেন, তখন কি হবে?

ছোটবৌ বলিল, তিনি কোনদিন জানতে পারবেন না দিদি। গত বছর মা মরবার সময় এটি লুকিয়ে আমাকে দিয়ে যান, তখন থেকে কোনদিন পরিনি, কোনদিন বার করিনি— তোমার পায়ে পড়ি দিদি, এটি তুমি নাও।

তাহার কাতর অনুনয়ে বিরাজের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া এই দূর নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর আচরণের সহিত বাটীর দুই সহোদরের আচরণ তুলনা করিয়া দেখিল। তার পর হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আজকের কথা মরণকাল পর্য্যন্ত আমার মনে থাকবে বোন। কিন্তু এ আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া স্বামীকে লুকিয়ে কোন মেয়েমানুষের কোন কাজই করা উচিত নয় ছোটবৌ। তাতে তোমার আমার দুজনেরই পাপ।

ছোটবৌ বলিল, তুমি সব কথা জান না তাই বলচ, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম আমারও ত আছে দিদি—আমিই বা মরণকালে কি জবাব দেব?

বিরাজ আর একবার চোখ মুছিয়া, নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোটবৌ, শুধু তোমাকেই এতদিন চিনতে পারিনি, কিন্তু তোমাকে ত মরণকালে কোন জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ তোমার অন্তর্য্যামী নিজেই লিখে নিয়েছেন। যাও, রাত হ'ল, শোও গে বোন। বলিয়া প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়াই দ্রুত পদে সরিয়া গেল।

কিন্তু সে ঘরেও ঢুকিতে পারিল না। অন্ধকার বারান্দার একধারে আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার নালিশ-মকদ্দমার কথা মনে হইল না, কিন্তু ওই স্বল্পভাষিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজায়ের সকরুণ কথাগুলি মনে করিয়া প্রস্রবণের মত তাহার দুই চোখ বাহিয়া নিরন্তর জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ সব-চেয়ে দুঃখটা তাহার এই বাজিতে লাগিল যে, এতদিন এত কাছে পাইয়াও সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, চিনিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা না করিলেও একটি দিনও তাহার হইয়া কখনও ভাল কথা বলে নাই। সুতীক্ষ্ণ

বাজের আলো একমুহূর্ত্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোটবৌ তেমনি করিয়া তাহার বুকের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কখন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ কাহার হস্তস্পর্শে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, নীলাম্বর আসিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়াছে।

নীলাম্বর সংক্ষেপে বলিল, ঘরে চল, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বিরাজ কোন কথা না বলিয়া স্বামীর দেহ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া নির্জ্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

৬

এক বৎসর কাটিয়াছে। এই বৎসর দুই আনা ফসলও পাওয়া যায় নাই। যে জমিগুলি হইতে প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত, তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখুয্যেমশাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে, ছোটভাই পীতাম্বর গোপনে নিজের নামে কিনিয়া লইয়াছে—তাহাও জানাজানি হইয়াছে। হালের একটা গরু মরিয়াছে। পুকুর রোদে ফাটিতেছে—বিরাজ কোনদিকে চাহিয়া আর কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অথচ অব্যক্ত মন্দ যাতনায় সর্ব্বদেহটা যে রকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে, সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল। আগে সে যখন তখন হাসিত, কথায় কথায় ছল ধরিয়া পরিহাস করিত, কিন্তু এখন বাড়ির মধ্যে এমন একটি লোক নাই যে, সে কথা কহে। অথচ কেহ দেখা করিতে আসিলে, সংবাদ লইতে ইচ্ছা করিলেও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। অভিমানী প্রকৃতি তাহার, পাড়ার লোকের একটা কথাতেও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সংসারের কোন কাজে তাহার যে আর লেশমাত্র উৎসাহ নাই, তাহা তাহার কাজের দিকে চোখ ফিরাইলেই চোখে পড়ে। তাহার ঘরের শয্যা মলিন, কাপড়ের আলনা অগোছাল, জিনিসপত্র অপরিচ্ছন্ন—সে ঝাঁট দিয়া ঘরের কোণে জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে—তুলিয়া ফেলিয়া দিবার মত জোরও সে যেন নিজের দেহের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। এমন করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে নীলাম্বর ছোটবোন হরিমতিকে দুইবার আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা পাঠায় নাই। দিন-পনর হইল একখানা চিঠি

লিখিয়াছিল, হরিমতির শ্বশুর তাহার জবাব পর্য্যন্ত দেয় নাই, কিন্তু বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্য্যন্ত করিবার জো নাই। সে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে। মায়ের মত ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার সমস্ত সংস্রব পর্য্যন্ত আজকাল তাহার কাছে বিষ হইয়া গিয়াছে।

আজ সকালে নীলাম্বর গ্রামের পোস্ট অফিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিমর্ষমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর একটা জবাব পর্য্যন্ত দিল না—এ পূজোতেও বোধ করি বোনটিকে একবার দেখতে পেলাম না।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে একবার মুখ তুলিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া উঠিয়া গেল।

সেইদিন দুপুরবেলা আহারে বসিয়া নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, তার নাম করলেও তুমি জ্বলে ওঠ—সে কি কোন দোষ করেছে?

বিরাজ অদূরেই বসিয়াছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, জ্বলে উঠি কে বললে?

কে আর বলবে, আমি নিজেই টের পাই।

বিরাজ ক্ষণকাল স্বামীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পেলেই ভাল, বলিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল, নীলাম্বর ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা আজকাল এমন হয়ে উঠচ কেন। এ যেন একেবারে বদলে গেছ!

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা মন দিয়া শুনিয়া বলিল, বদ্‌লালেই বদলাতে হয়, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ইহার দুই-তিন দিন পরে অপরাহ্নবেলায় নীলাম্বর বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া গুন্ গুন করিয়া গান গাহিতেছিল, বিরাজ আসিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া বলিল, কি?

বিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জবাব দিল না।

নীলাম্বর মুখ নিচু করিতেই বিরাজ রুক্ষস্বরে বলিল, আর একবার মুখ তোল দেখি।

নীলাম্বর মুখ তুলিল না, জবাবও দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পূর্ব্ববৎ কঠিনভাবে বলিল, এই যে চোখ বেশ রাঙা হয়েছে, আবার ঐগুলো খেতে শুরু করেছ?

নীলাম্বর কথা কহিল না, ভয়ে চোখ নিচু করিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। একে ত চিরদিনই সে তাহাকে ভয় করে, তাহাতে কিছুদিন হইতেই বিরাজ এমনই একরাশি উত্তপ্ত বারুদের মত হইয়া আছে যে কখন কিভাবে জ্বলিয়া উঠিবে তাহা আন্দাজ পর্য্যন্ত করিবার জো ছিল না।

বিরাজও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, সেই ভাল, গাঁজা-গুলি খেয়ে বোম-ভোলা হয়ে বসে থাকবার এই ত সময়, বলিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। সেদিন গেল, তার পরদিন নীলাম্বর আর থাকিতে না পারিয়া সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকালবেলা পীতাম্বরকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর তো একটা জবাব পর্য্যন্ত দিল না—তুই একবার চেষ্টা করে দেখ্ না, যদি বোনটিকে দুটো দিনের তরেও আনতে পারিস্।

পীতাম্বর দাদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি থাকতে আমি আবার কি চেষ্টা করব?

নীলাম্বর তাহার শঠতা বুঝিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু সে ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল, তা হোক, যেমন আমার, তোরও তো তেমনই বোন। না হয় মনে কর্ না, আমি মরে গেছি—এখন তুই শুধু একলা আছিস্।

পীতাম্বর বলিল, যা সত্যি নয়, তা তোমার মত আমি মনে করতে পারিনে। আর তোমাকে চিঠির জবাব দিলে না, আমাকেই বা দেবে কেন?

নীলাম্বর ছোট ভাইয়ের এ কথাটাও সহ্য করিয়া লইয়া বলিল, যা সত্যি নয়, তাই আমি মনে করি? আচ্ছা তাই ভাল, এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই নে, কিন্তু আমার চিঠির জবাব দেয় না এই জন্যে যে, আমি বিয়ের সমস্ত শর্ত্ত পালন করতে পারিনি। কিন্তু সে সব কথার জন্যে তো তোকে ডাকিনি—যা বলচি, পারিস্ কি না, তাই বল্।

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

করলে কি হ'ত?

পীতাম্বর বলিল, ভাল পরামর্শই দিতুম।

নীলাম্বরে মাথার মধ্যে আগুন জলিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধরও কাঁপিতে লাগিল, তবুও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, তা হলে পারবিনে।

পীতাম্বর বলিল, না। আর পুঁটির শ্বশুরও যা, নিজের শ্বশুরও তাই—এঁরা গুরুজন। তিনি যখন পাঠাতে ইচ্ছা করেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারিনে—ও স্বভাব আমার নয়।

তাহার কথা শুনিয়া নীলাম্বরের একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া উহার ঐ মুখ গুড়া করিয়া ফেলে, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, যা, বেরো—যা আমার সামনে থেকে।

পীতাম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, খামকা রাগ কর কেন দাদা? না গেলে তুমি কি আমাকে জোর ক'রে তাড়াতে পার?

নীলাম্বর দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, বুড়ো বয়সে মার খেয়ে যদি না মরতে চাস্, সরে যা আমার সুমুখ থেকে!

তথাপি পীতাম্বর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিল, বাস্। একটি কথাও না—যাও।

গোঁয়ার নীলাম্বরের গায়ের জোর প্রসিদ্ধ ছিল।

পীতাম্বর আর কথা কহিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ছি, সমস্ত জেনে-শুনে কি ভাইয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করতে আছে?

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে জবাব দিল, জানি বলে কি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব? আমার সব সহ্য হয় বিরাজ, ভণ্ডামি সহ্য হয় না।

বিরাজ বলিল, কিন্তু তুমি ত একা নও, আজ হাত ধরে বার করে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবার ভাব কি?

নীলাম্বর বলিল, না। যিনি ভাববার তিনি ভাব্‌বেন, আমি ভেবে মিথ্যা দুঃখ পাই নে।

বিরাজ জবাব দিল, তা ঠিক। যার কাজের মধ্যে খোল বাজান আর মহাভারত পড়া—তার ভাবনা চিন্তে মিছে।

কথাগুলি বিরাজ মধুর করিয়া বলে নাই, নীলাম্বরের কানেও তাহা মধু বর্ষণ করিল না, তথাপি সে সহজভাবে বলিল, ওগুলো আমি সবচেয়ে বড় কাজ বলেই মনে করি। তা ছাড়া, ভাবতে থাকলেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে? বলিয়া সে একবার কপালে হাত দিয়া বলিল, চেয়ে দেখ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা-মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েছে- আমি ত অতি তুচ্ছ।

বিরাজ অন্তরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, বলিল, ও-সব মুখে বলা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নয়। তা ছাড়া তুমিই না হয় গাছতলায় বাস করতে পার, আমি ত পারিনে। মেয়েমানুষের লজ্জাসরম আছে—আমাকে খোশামোদ করে হোক, দাসীবৃত্তি করে হোক, একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস করতেই হবে। ছোট ভাইয়ের মন যুগিয়ে থাকতে না পার, অন্ততঃ হাতাহাতি করে সব দিক মাটি ক'র না। বলিয়া সে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রীতে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর তাহা জানিত, কিন্তু আজ যাহা হইয়া গেল তাহা কলহ নহে—এ মূর্ত্তি তাহার কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বিরাজ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, অমন হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বেলা হয়েচে—যাও, স্নানাহ্নিক করে দুটো খাও—যে কটা দিন পাওয়া যায়, সেই কটা দিনই লাভ। বলিয়া আর একবার সে স্বামীর বুকে শূল বিঁধিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ঘরে দেয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের পট ঝোলান ছিল, সেইদিকে চাহিয়া নীলাম্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল ; কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পায়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

আর বিরাজ ? সেদিন সমস্ত দিন কেবলই তাহার চোখে যখন তখন জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। যাঁহার এতটুকু কষ্ট সে সহিতে পারিত না, তাঁহাকে এত বড় শক্ত কথা নিজের মুখে বলিয়া অবধি তাহার দুঃখ ও আত্মগ্লানির সীমা ছিল না, সমস্ত দিন জলস্পর্শ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিছামিছি এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ফিরিল, তাহার পর সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়াই একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সমস্ত বাড়ি নির্জন, নিস্তব্ধ। নীলাম্বর বাড়ি নাই, সে দুপুরবেলা একটিবার মাত্র পাতের কাছে বসিয়াই উঠিয়া গিয়াছিল, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

বিরাজ কি করিবে কোথায় যাইবে, কাহার কাছে কি বলিবে—আজ কোনদিকে চাহিয়া কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, সে সেইখানে অন্ধকার উঠানের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কেবলই বলিতে লাগিল, অন্তর্যামী ঠাকুর, একটিবার মুখ তুলে চাও। যে লোক কোন দোষ কোন পাপ করতে জানে না, তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর—আর আমি সইতে পারব না।

রাত্রি তখন নটা বাজিয়া গিয়াছিল, নীলাম্বর নিঃশব্দে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পায়ের কাছে বসিল।

নীলাম্বর চাহিয়াও দেখিল না, কথাও কহিল না।

খানিক পরে বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটা হাত রাখিতেই সে পা সরাইয়া লইল। আরও মিনিট-পাঁচেক নিস্তব্ধে কাটিল—বিরাজের লুপ্ত অভিমান ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে বলিল, খাবে চল।

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ বলিল, সমস্ত দিন যে খেলে না, এটা কার ওপর রাগ করে শুনি ?

ইহাতেও নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ বলিল, বল না শুনি ?

নীলাম্বর উদাসভাবে বলিল, শুনে কি হবে ?

বিরাজ বলিল, তবু শুনিই না।

এবার নীলাম্বর অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সুতীক্ষ্ণ শূলের মত উদ্যত করিয়া বলিল, তোর আমি গুরুজন বিরাজ, খেলার জিনিস নয়।

তাহার চোখের চাহনি, গলার শব্দ শুনিয়া বিরাজ সভয়ে চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আর্ত্ত, এমন গম্ভীর কণ্ঠস্বর সে ত কোন দিন শুনে নাই!

৭

মগরার গঞ্জে কয়েকটা পিতলের কজার কারখানা ছিল। এ-পাড়ার চাঁড়ালদের মেয়েরা মাটির ছাঁচ তৈরি করিয়া সেখানে বিক্রি করিয়া আসিত। অসহ্য দুঃখের জ্বালায় বিরাজ তাহাদেরই একটি মেয়েকে ডাকিয়া ছাঁচ তৈরি করিতে শিখিয়া লইয়াছিল। সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী এবং অসাধারণ কর্ম্মপটু, দুদিনেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্যাপারীরা আসিয়া এগুলি নগদ মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়া যাইত। রোজ এমনই করিয়া, সে আট-আনা, দশ-আনা উপার্জ্জন করিতেছিল, অথচ স্বামীর কাছে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাত্রে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই কাজ করিত। আজ রাত্রেও তাহাই করিতে আসিয়াছিল এবং ক্লান্তিবশতঃ কোন এক সময়ে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শয্যায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের হাতে তখনও কাদা-মাখা, আশে-পাশে তৈরি ছাঁচ পড়িয়া আছে এবং তাঁহারই এক ধারে হিমের মধ্যে ভিজা মাটির উপর সে ঘুমাইতেছে। আজ তিনদিন ধরিয়া, স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা ছিল না। তপ্ত অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া বিরাজের ভূলুণ্ঠিত সুপ্ত মাথাটি সাবধানে নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। বিরাজ জানিল না, শুধু একটিবার নড়িয়া চড়িয়া পা দুটি আরও একটু গুটাইয়া লইয়া ভাল করিয়া শুইল। নীলাম্বর বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অপর হাতে অদূরবর্ত্তী স্তিমিত দীপটি আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একদৃষ্টে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কি হইয়াছে! কৈ, এতদিন সে ত চাহিয়া দেখে নাই! বিরাজের চোখের কোণে এমন কালি পড়িয়াছে! ভ্রূর উপর, সুন্দর সুডৌল ললাটে দুশ্চিন্তার এত সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়াছে! একটা অবোধ্য, অব্যক্ত, অপরিসীম বেদনায় তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল এবং অসাবধানে এক ফোঁটা বড় অশ্রু বিরাজের নিমীলিত চোখের পাতার উপর টপ করিয়া পড়িবামাত্রই সে চোখ চাহিয়া দেখিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তার পর দুই হাত প্রসারিত করিয়া স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল। নীলাম্বর সেইভাবে বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাটিল—কেহ কথা কহিল না। তারপর রাত্রি যখন আর বেশী বাকী নাই, পূর্ব্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, তখন নীলাম্বর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল, হিমে থেকো না বিরাজ, ঘরে চল।

চল, বলিয়া বিরাজ উঠিয়া পড়িল এবং স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালবেলা নীলাম্বর বলিল, যা তোর মামার বাড়ি থেকে দিন-কতক ঘুরে আয় বিরাজ, আমিও একবার কলকাতায় যাই।

কলকাতায় গিয়ে কি হবে?

নীলাম্বর কহিল, কত রকম উপার্জ্জনের পথ সেখানে আছে, যা হোক একটা উপায় হবেই—কথা শোন্ বিরাজ, মাস-কয়েক সেখানে গিয়ে থাক্ গে।

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কতদিনে আমাকে ফিরিয়ে আনবে?

নীলাম্বর বলিল, ছমাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনব, তোকে আমি কথা দিচ্ছি।

আচ্ছা; বলিয়া বিরাজ সম্মত হইল।

দিন চার-পাঁচ পরে গরুর গাড়ি আসিল, মামার বাড়ি যাইতে আট-দশ ক্রোশ এই উপায়েই যাইতে হয়। অথচ বিরাজের ব্যবহারে যাত্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইতে লাগিল, তাগিদ দিতে লাগিল।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে বলিয়া বসিল, আজ ত আমি যাব না—আমার অসুখ কচ্চে।

নীলাম্বর অবাক্ হইয়া বলিল, অসুখ কচ্চে কি রে?

বিরাজ বলিল, হাঁ অসুখ কচ্চে,—বড্ড অসুখ কচ্চে, বলিয়া মুখ ভার করিয়া পিতলের কলসীটা কাঁকালে তুলিয়া লইয়া নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। সেদিন গাড়ি ফিরিয়া গেল। রাত্রে অনেক সাধাসাধি অনেক বোঝানোর পর সে দুদিন পরে যাইতে সম্মত হইল। দুদিন পরে আবার গাড়ি আসিল।

নীলাম্বর সংবাদ দিবামাত্রই বিরাজ একেবারে বাঁকিয়া বসিল—না, আমি কথ্খনো যাব না।

নীলাম্বর আরও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, যাবিনে, কেন?

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল—না, আমি যাব না। আমার গয়না কৈ, আমার ভাল কাপড় কৈ, আমি দীন-দুঃখীর মত কিছুতেই যাব না।

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আজ তোর গয়না নাই সত্যি, কিন্তু যখন ছিল, তখন ত একদিন ফিরেও চাস্‌নি?

বিরাজ চুপ করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, তোর ছল আমি বুঝি। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিলই, তবে ভেবেছিলুম, দুঃখ-কষ্টে বুঝি তোর হুঁশ হয়েছে, তা দেখছি কিছুই হয়নি। ভাল, তুইও শুকিয়ে মর্, আমিও মরি। বলিয়া সে বাহিরে গিয়া গাড়ি ফিরাইয়া দিল।

দুপুরবেলায় নীলাম্বর ঘরের ভিতর ঘুমাইতেছিল, পীতাম্বর নিজের কাজে

গিয়াছিল, ছোটবৌ বেড়ার ফাঁক দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, দিদি, অপরাধ নিও না, তোমাকে আর আমি বোঝাব কি, কিন্তু দুদিন ঘুরে এলে না কেন?

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, ওঁকে বন্ধ করে রেখো না দিদি, বিপদের দিনে একটিবার বুক বাঁধ, ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।

বিরাজ আস্তে আস্তে বলিল, আমি ত বুক বেঁধেই আছি ছোটবৌ।

ছোটবৌ একটু জোর দিয়া বলিল, তবে যাও দিদি, ওঁকে পুরুষমানুষের মত উপার্জ্জন করতে দাও—আমি বলচি তোমার প্রতি ভগবান দুদিনে প্রসন্ন হবেন।

বিরাজ একবার মুখ তুলিল, কি কথা বলিতে গেল, তার পর মুখ হেঁট করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, পারবে না যেতে?

এবার বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ঘুম ভেঙ্গে উঠে ওঁর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না। যা পারব না ছোটবৌ, সে কাজ আমাকে ব'লো না, বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ছোটবৌ কাঁদ কাঁদ হইয়া ডাকিয়া বলিল, যেও না দিদি, তোমাকে দিনকতক এখান থেকে যেতেই হবে—না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইল, একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলল, ও বুঝেছি—সুন্দরী এসেছিল বুঝি?

ছোটবৌ মাথা নাড়িয়া বলিল, এসেছিল।

তাই চলে যেতে বলচ?

তাই বলচি দিদি, তুমি যাও এখান থেকে।

বিরাজ আবার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল, তার পরে বলিল, একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব?

ছোটবৌ বলিল, কুকুর পাগল হ'লে তাকে ভয় ত করতেই হয় দিদি! তা ছাড়া, তোমার একার জন্যেও নয়, ভেবে দেখ, এই নিয়ে আরও কত কি অনিষ্ট ঘটতে পারে।

বিরাজ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর উদ্ধতভাবে মুখ তুলিয়া বলিল, না, কোনমতেই যাব না, বলিয়া ছোটবৌকে প্রত্যুত্তরের অবসরমাত্র না দিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু তাহার যেন ভয় করিতে লাগিল। তাহাদের ঘাটের ঠিক পরপারে দুদিন হইতে আড়ম্বর করিয়া একটি স্নানের ঘাট এবং নদীতে জল না থাকা সত্ত্বেও মাছ ধরিবার মঞ্চ প্রস্তুত হইতেছিল। বিরাজ মনে মনে বুঝিল, এ সব কেন।

নীলাম্বরও একদিন স্নান করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওপারে ঘাট বাঁধলে কারা বিরাজ?

বিরাজ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি জানি? বলিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া নীলাম্বর অবাক হইয়া গেল। কিন্তু সেইদিন হইতে বিরাজ যখন তখন জল আনিতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। হয় অতি প্রত্যূষে, না হয় একটুখানি রাত্রি হইলে তবে সে নদীতে যাইত, এ ছাড়া সহস্র কাজ আটকাইলেও সে ও-মুখো হইত না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, তাহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ এই অত্যাচার ও অকথ্য ইতরতার বিরুদ্ধে সে স্বামীর কাছেও সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিল না।

দিন-চারেক পরে নীলাম্বরই একদিন ঘাট হইতে হাসিয়া আসিয়া বলিল, নূতন জমিদারের সাজ-সরঞ্জাম দেখেচিস্ বিরাজ?

বিরাজ বুঝিতে পারিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, দেখেচি বৈকি।

নীলাম্বর পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল, লোকটা পাগল না কি, তাই আমি ভাবচি। নদীতে দুটো পুঁটিমাছ থাকবার জল নেই, লোকটা সকাল থেকে একটা মস্ত হুইল-বাঁধা ছিপ ফেলে সারাদিন বসে আছে।

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল, সে কোনমতেই স্বামীর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু এ ত ঠিক নয়। ভদ্রলোকের খিড়কির ঘাটের সামনে সমস্ত দিন বসে থাকলে মেয়েছেলেরাই বা যায় কি করে? আচ্ছা, তোদের নিশ্চয়ই ত ভারী অসুবিধে হচ্ছে?

বিরাজ বলিল, হলেই বা কি করব?

নীলাম্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাই হবে কেন? ছিপ নিয়ে পাগলামি করবার কি আর জায়গা নেই? না, না, কাল সকালেই আমি কাছারিতে গিয়ে বলে আসব—শখ হয় উনি আর কোথাও ছিপ নিয়ে বসে থাকুন গে, কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে ও সব চলবে না।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিরাজ ভীত হইয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, তোমাকে ও-সব বলতে যেতে হবে না, নদী আমাদের একলার নয় যে, তুমি বারণ করে আসবে।

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, তুই বলিস্ কি বিরাজ। নাই হ'ল নদী আমার, কিন্তু লোকের একটা ভালমন্দ বিবেচনা থাকবে না? আমি কালই গিয়ে বলে আসব, না শোনে নিজেই ঐ সকল ঘাট-ফাট টান মেরে ভেঙ্গে ফেলব, তার পরে যা পারে, সে করুক।

কথা শুনিয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করতে?

নীলাম্বর বলিল, কেন যাব না? বড়লোক বলে যা ইচ্ছে অত্যাচার করবে, তাই সয়ে থাকতে হবে?

অত্যাচার করচে, তুমি প্রমাণ করতে পার?

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আমি এত তর্কের ধার ধারিনে, স্পষ্ট দেখচি অন্যায় করছে, আর তুই বলিস্ প্রমাণ করতে পার? পারি, না পারি, সে আমি বুঝব।

বিরাজ একমুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, দেখ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। যাদের দুবেলা ভাত জোটে না, তাদের মুখে এ কথা শুনলে লোকে গায়ে থুতু দেবে।

কিসে?

আর কিসে, তুমি চাও জমিদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে।

কথাটা এতই রূঢ়ভাবে বিরাজের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, নীলাম্বর সহ্য করিতে পারিল না, সে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, তুই আমাকে কুকুর-বেড়াল মনে করিস যে, যখন তখন সব কথায় ঐ খাবার খোঁটা তুলিস। কোন্‌দিন তোর দুবেলা ভাত জোটে না?

দুঃখে-কষ্টে বিরাজের আর পূর্ব্বের ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা ছিল না, সেও জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিল, মিছে চেঁচিও না। যা করে দুবেলা ভাত জুটচে, সে সব তুমি জান না বটে, কিন্তু জানি আমি, আর জানেন অন্তর্য্যামী। এই নিয়ে কোন কথা যদি তুমি বলতে যাও ত আমি বিষ খেয়ে মরব। বলিয়াই সে মুখ তুলিয়া দেখিল, নীলাম্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই চোখে একটা বিহ্বল হতবুদ্ধি দৃষ্টি—সে চাহনির সম্মুখে বিরাজ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর একটা কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেল, তবুও নীলাম্বর তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চণ্ডী-মণ্ডপে একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ না বুঝিয়া একটা অনুচ্চ স্থানের মধ্যে সজোরে মাথা তুলিতে গিয়া তেমনই সজোরে ধাক্কা খাইয়া যেন একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল। কানে তাহার কেবলই বাজিতে লাগিল বিরাজের শেষ কথাটা—কি করিয়া সংসার চলিতেছে এবং কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, সেদিনের সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে ভূশয্যায় সুপ্ত বিরাজের শ্রান্ত অবসন্ন মুখ। সত্যই ত। সত্যই ত। দিন যে কেমন করিয়া চলিতেছে এবং কেমন করিয়া যে ওই অসহায়া রমণী একাকিনী চালাইতেছে, সে ত তাহার জানিতে বাকী নাই। অনতিপূর্ব্বে বিরাজের শক্ত কথা তীরের মতই তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিয়াছিল, কিন্তু যতই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের সেই ক্ষত, সেই ক্ষোভ শুধু যে মিলাইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, ধীরে ধীরে

শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার বিরাজ ত শুধু আজকের বিরাজ নয়, সে যে কতকাল, কত যুগ-যুগান্তরের। তাহার বিচার শুধু দুটো দিনের ব্যবহারে, দুটো অসহিষ্ণু কথার উপর করা চলে না। সে হৃদয় কি দিয়া পরিপূর্ণ, সে কথা ত তার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না। এইবার তাহার দুই চোখ বাহিয়া দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ দুই হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবান, আমার যা আছে সব নাও, কিন্তু আমার একে নিও না। বলিতে বলিতেই একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার বেগ সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রিয়তমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার জন্য তাহাকে যেন একেবারে ঠেলিয়া দিল। সে ছুটিয়া বিরাজের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, সে ঘা দিয়া আবেগকম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল, বিরাজ!

বিরাজ মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, চমকাইয়া উঠিয়া বসিল।

নীলাম্বর বলিল, কি কচ্চিস্ বিরাজ, দোর খোল্!

বিরাজ সভয়ে নিঃশব্দে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলে দে বিরাজ!

এবার বিরাজ কাঁদ কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, তুমি মারবে না বল?

মারব!

কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাম্বরের হৃৎপিণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিল; বেদনায়, লজ্জায়, অভিমানে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা চৌকাঠ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিল না, সে না জানিয়া ছুরির উপর ছুরি মারিয়া কাঁদিয়া বলিল, আর আমি এমন কথা ক'ব না—বল, মারবে না!

নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে, কোনমতে, 'না' বলিতে পারিল মাত্র! বিরাজ সভয়ে ধীরে ধীরে অর্গল মুক্ত করিবামাত্রই নীলাম্বর টলিতে টলিতে ভিতরে ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর এমন মুখ ত বিরাজ কোন দিন দেখে নাই, এখন সমস্তই বুঝিল। শিয়রের কাছে উঠিয়া আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথা নিজের ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘরের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, তথাপি উভয়ের কেহই মুখ খুলিল না, কথা কহিল না। আঁধার শয্যাতলে দুইজনেই নীরবে স্থির হইয়া রহিল, কিন্তু অন্তরে যে কথাবার্ত্তা স্বামী-স্ত্রীতে হইয়া গেল, সে কথা বোধ করি তাহাদের শুধু অন্তর্য্যামীই শুনিলেন।

৮

তবুও নীলাম্বর ভাবিতেছিল—এ কথা বিরাজ মুখে আনিল কি করিয়া? সে তাহাকে মার-ধোর করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা জন্মিল কেন? একে ত সংসারে দুঃখকষ্টের অবধি নাই, তাহার উপর প্রতিদিন এ কি হইতে লাগিল? দুদিন যায় না, বিবাদ বাধে। কথায় কথায় মনোমালিন্য, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে মতভেদ হয়। সর্ব্বোপরি, তাহার এমন বিরাজ দিন দিন এমন হইয়া যাইতে লাগিল অথচ কোন দিকে চাহিয়া সে এই দুঃখের সাগরের কিনারা দেখিল না। ভগবানের চরণে নীলাম্বরের অচলা ভক্তি ছিল, অদৃষ্টের লেখায় অসীম বিশ্বাস ছিল, সে এই কথাই ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও মনে মনে দোষ দিল না, কাহারও নিন্দা করিল না—চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে টাঙানো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ভগবান, যদি এত দুঃখেই ফেলবে মনে ছিল, তবে এত বড় নিরুপায় করে আমাকে গড়লে কেন? সে যে কত নিরুপায়, সে কথা তাহার অপেক্ষা বেশী আর ত কেহই জানে না। লেখাপড়া শিখে নাই, কোন রকমের কাজ-কর্ম্ম জানিত না, জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে, কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া? আর তাহার কিছুই নাই—সমস্ত গিয়াছে। তাই দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর থাকিবে না, বিরাজকে লইয়া যেখানে দুচোখ যায় যাইবে, কিন্তু এই সাত-পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া কোন্ দেব-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া, কোন্ গাছের তলায় শুইয়া সে সুখ পাইবে! ওই ক্ষুদ্র নদী, এই গাছপালায় ঘেরা বাড়ি, এই ঘরের বাহিরে আজন্ম পরিচিত লোকের মুখ—সমস্ত ছাড়িয়া সে কোন্ দেশে, কোন্ স্বর্গে গিয়া একটা দিনও বাঁচিবে! এই বাটীতে তাহার মা মরিয়াছে, এই চণ্ডীমণ্ডপে সে তাহার মুমূর্ষু পিতার শেষ সেবা করিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিয়াছে—এইখানে সে পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়াছে এই ঘরবাড়ির মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে! সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর এই কি তাহার সব দুঃখ? তাহার বোনটিকে কোথায় দিয়া আসিল, তাহার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না, কতদিন হইয়া গেল, তাহার মুখ দেখে নাই, তাহার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের 'দাদা' ডাক শুনিতে পায় নাই—পরের ঘরে সে কি দুঃখ পাইতেছে, কত কান্না কাঁদিতেছে, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অথচ বিরাজের কাছে তাহার নামটি করিবার জো নাই। সে তাহাকে মানুষ করিয়াও এমন করিয়া ভুলিতে পারিল, কিন্তু সে ভুলিবে কি করিয়া? তাহার মায়ের পেটের বোন, হাতে কাঁধে করিয়া বড়

করিয়াছে, যেখানে গিয়াছে, সঙ্গে করিয়া গিয়াছে—সেজন্য কত কথা, কত উপহাস সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই পুঁটিকে কাঁদাইয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা যাইতে পারে নাই। এ-সব কথা শুধু সে জানে, আর সেই ছোট বোনটি জানে।

বিরাজ জানিয়াও জানে না। একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না। পুঁটির সম্বন্ধে সে যেন পাষাণমূর্ত্তির মত একেবারে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। সে যে মনে মনে তাহার সেই নিরপরাধিনী বোনটিকে অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, এ চিন্তা তাহাকে শূলের মত বিঁধিত, কিন্তু এ সম্বন্ধে একবিন্দু আলোচনার পথ পর্য্যন্ত ছিল না। কোন একটা কথা বলিতে গেলেই বিরাজ থামাইয়া দিয়া বলে, ও কথা থাক্—সে রাজরাণী হোক, কিন্তু তার কথায় কাজ নেই। এই 'রাজরাণী' কথাটা বিরাজ এমনভাবে উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া যাইত যে, নীলাম্বরের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে থাকিত। পাছে তাহার উপর গুরুজনের অভিসম্পাত পড়ে, পাছে কোন অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত. ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিত, লুকাইয়া 'হরির লুঠ' দিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

দুর্গাপূজা আসিয়া প'ড়িল। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোপনে টাকা সংগ্রহ করিয়া একখানি কাপড় ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সুন্দরীকে গিয়া ধরিল।

সুন্দরী বসিতে আসন দিল, তামাক সাজিয়া দিল। নীলাম্বর আসন গ্রহণ করিয়া তাহার জীর্ণ মলিন উত্তরীয়ের ভিতর হইতে সেই কাপড়খানি বাহির করিয়া বলিল, তুই তাকে মানুষ করেচিস্ সুন্দরী, যা একবার দেখে আয়। আর সে বলিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া চাদরে চোখ মুছিল।

সুন্দরী ইহাদের কষ্টের কথা জানিত। গ্রামের সকলেই জানিত। কহিল, সে কেমন আছে বড়বাবু?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে।

সুন্দরীর বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল, সে আর প্রশ্ন করিল না। পরদিন সকালেই যাইবে জানাইতে নীলাম্বর কিছু পাথেয় দিতে গেল, সুন্দরী তাহা গ্রহণ করিল না, কহিল, না বড়বাবু, তুমি কাপড় কিনে ফেলেচ, না হলে এও আমি নিয়ে যেতাম না—তোমার মত আমিও যে তাকে মানুষ করেচি।

নীলাম্বরের চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল. সে মুখ ফিরাইয়া ক্রমাগত চোখ মুছিতে লাগিল। এমন একটা সমবেদনার কথা সে কাহারও কাছে পায় নাই। সবাই কহে, সে ভুল করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, পুঁটি হইতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উঠিবার উদ্যোগ করিয়া সে সুন্দরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, যেন এই সব দুঃখকষ্টের কথা পুঁটি কোনমতে না জানিতে পারে।

নীলাম্বর চলিয়া গেল, সুন্দরীও এইবার একফোঁটা চোখের জল আঁচলে মুছিল। এই লোকটিকে মনে মনে সবাই ভালবাসিত, সবাই ভক্তি করিত।

সেদিন বিজয়ার অপরাহ্ণ, বিরাজ শোবার ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল। সন্ধ্যা না হইতেই কেহ খুড়ো বলিয়া বাড়ি ঢুকিল, কেহ নীলুদা বলিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিল।

নীলাম্বর শুষ্কমুখে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যথারীতি প্রণাম-কোলাকুলির পর তাহারা বৌঠানকে প্রণাম করিবার জন্য ভিতরের দিকে চলিল।

নীলাম্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিল, বিরাজ রান্নাঘরেও নাই, শোবার ঘরেরও দ্বার রুদ্ধ। সে করাঘাত করিয়া ডাকিল, ছেলেরা তোমাকে প্রণাম করতে এসেচে বিরাজ।

বিরাজ ভিতর হইতে বলিল, আমার জ্বর হয়েচে—উঠতে পারব না।

তাহারা চলিয়া যাইবার খানিক পরেই আবার দ্বারে ঘা পড়িল। বিরাজ জবাব দিল না। দ্বারের বাহিরে মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি, আমি মোহিনী—একবারটি দোর খোল।

তথাপি বিরাজ কথা কহিল না।

মোহিনী কহিল, সে হবে না দিদি, সারারাত এই দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সে থাকব, কিন্তু আজকের দিনে তোমার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে যাব না।

বিরাজ উঠিয়া কপাট খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, মোহিনীর বাঁ-হাতে এক চুপড়ি খাবার, ডান হাতে ঘটিতে সিদ্ধি গোলা। সে পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, যেন তোমার মত হতে পারি—তোমার মুখ থেকে আমি আর কোন আশীর্ব্বাদ পেতে চাইনে।

বিরাজ সজল চক্ষু আঁচলে মুছিয়া নিঃশব্দে ছোটবধূর অবনত মস্তকে হাত রাখিল।

ছোটবৌ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, কিন্তু সে কথা ত তোমাকে বলতে পারলুম না দিদি, দিদি, তোমার দেহের বাতাস যদি আমার দেহে লেগে থাকে ত সেই জোরে ব'লে যাচ্ছি, আসচে বছর এমনই দিনে সে কথা বলব।

মোহিনী চলিয়া গেলে বিরাজ সেইসব ঘরে তুলিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া বসিল। মোহিনী যে অহর্নিশ তাহাকে চোখে চোখে রাখে, এ-কথা আজ সে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল। তার পর কত ছেলে আসিল, গেল, বিরাজ আর ঘরে দোর দিল না, এই সব দিয়া আজকের দিনের আচার পালন করিল।

পরদিন সকালবেলা সে ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সুন্দরী আসিয়া প্রণাম করিল।

বিরাজ আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিল।

সুন্দরী বসিয়াই বলিল, কাল রাত্তির হয়ে গেল, তাই আজ সকালেই বলতে এলুম। কিন্তু যাই বল বৌমা, এমন জানলে আমি কিছুতেই যেতুম না।

বিরাজ বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল, বাড়িতে কেউ নেই—সবাই গেছে পশ্চিমে হাওয়া খেতে। আছে এক বুড়ো পিসী, তার শক্ত শক্ত কথা কি বৌমা, বলে, ফিরিয়ে নিয়ে যা! জামায়ের পর্য্যন্ত একখানা কাপড় পাঠায়নি, শুধু একখানা সুতোর কাপড় নিয়ে পূজোর তত্ত্ব কত্তে এসেচে! তারপর ছোটলোক, চামার, চোখের চামড়া নেই—এ যে কত বললে, তা আর বলে কি হবে।

বিরাজ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কে কাকে বললে রে?

সুন্দরী বলিল, কেন আমাদের বাবুকে।

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল। সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিল না। কহিল, আমাদের বাবুকে কে বললে তাই বল্।

এবার সুন্দরীও কিছুটা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তাই ত এতক্ষণ বলচি বৌমা! পুঁটির বুড়ো পিসশাউড়ির কি দম্ভ, কি তেজ মা, কাপড়খানা নিলে না, ফিরিয়ে দিলে; বলিয়া কাপড়খানি আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিল।

এবার বিরাজ সমস্ত বুঝিল। সে একদৃষ্টে বস্ত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার অন্তরে বাহিরে আগুন ধরিয়া গেল।

নীলাম্বর বাহিরে গিয়াছিল, কত বেলায় আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, সুন্দরী অপেক্ষা করিতে পারিল না, চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা নীলাম্বর আহার করিতে বসিয়াছিল, বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া অদূরে সেই কাপড়খানা রাখিয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা যে এমনভাবে বিরাজের গোচরে আসিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এখন কোন প্রশ্ন না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিরাজও কহিল, কেন তারা নিলে না, কেন গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলে, সে সব কথা সুন্দরীর কাছে গেলেই শুনতে পাবে।

তথাপি নীলাম্বর মুখ তুলিল না, কিংবা একটি কথাও শুনিতে চাহিল না।

বিরাজ চুপ করিল।

নীলাম্বরের ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল, সে ভীত অবনত মুখে কেবলই অনুভব করিতে লাগিল—বিরাজ তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতেছে।

সন্ধ্যাবেলা সুন্দরীর ঘরে গিয়া সব কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নীলাম্বর কহিল, পশ্চিমে যখন বেড়াতে গেছে, তখন সে নিশ্চয়ই ভাল আছে, না সুন্দরী ?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভাল আছে বৈ কি বাবু।

নীলাম্বরের মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল,—কত বড়টি হয়েচে দেখলি ?

সুন্দরী হাসিয়া বলিল, দেখা ত হয়নি বাবু!

নীলাম্বর নিজের প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া বলিল, তা বটে, কিন্তু দাসী-চাকরের কাছেও শুনলি ত ?

না বাবু। তার পিসশাউড়ি মাগীর যে কথাবার্ত্তা, যে হাত-পা নাড়া, তাতে আর জিজ্ঞেস করব কি, পালাতেই পথ পাইনি।

নীলাম্বর ক্ষণকাল ক্ষুব্ধ-মুখে স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, পুঁটি আমার রোগা হয়ে গেছে, কি একটু মোটাসোটা হয়েছে—তোর কি মনে হয় ?

প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুন্দরী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে কহিল, মোটাসোটাই হ'য়ে থাকবে।

নীলাম্বর আশান্বিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, শুনে এসেচিস্ বোধ করি, না ?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, শুনে কিছুই আসিনি।

তবে জানলি কি করে ?

এবার সুন্দরী বিরক্ত হইল, কহিল, জানলুম আর কোথায় ? তুমি বললে আমার কি মনে হয়, তাই বললুম, হয়ত মোটাসোটা হয়েচে।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তা বটে। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত সুন্দরীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আজ তবে যাই সুন্দরী, আর একদিন আসব।

সুন্দরী তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বস্তুতঃ তাহার অপরাধ ছিল না। একে ত বলিবার কিছুই ছিল না, তাহাতে ঘণ্টা-দুই হইতে নিরন্তর এক কথা একশ' রকম করিয়া বকিয়া বকিয়াও সে নীলাম্বরের কৌতূহল মিটাইতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কহিল, হাঁ বাবু, রাত হ'ল আজ এসো, আর একদিন সকালে এলে সব কথা হবে।

এতক্ষণে নীলাম্বর সুন্দরীর উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিল এবং 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরীর উৎকণ্ঠার একটা বিশেষ হেতু ছিল।

এই সময়টায় ও-পাড়ার নিতাই গাঙ্গুলী প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইয়া পায়ের ধুলা দিয়া যাইতেন। তাঁহার এই ধুলাটা পাছে মনিবের সাক্ষাতেই পড়ে, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও

নানা কারণে এখন কপাল ফিরিয়াছে এবং জমিদারের অনুগ্রহে লজ্জা গর্বেই রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই নিষ্কলঙ্ক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের সম্মুখে হীনতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

নীলাম্বর চলিয়া গেলে সে পুলকিতচিত্তে দ্বার বন্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সম্মুখে চাহিতেই দেখিল, নীলাম্বর ফিরিয়া আসিতেছে। সে দোর ধরিয়া বিরক্তমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মুখে দ্বাদশীর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল।

নীলাম্বর কাছে আসিয়া একবার ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর চাদরের খুট হইতে খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর কাছে ত বলতে লজ্জা নেই সুন্দরী, সবই জানিস—এই আধুলিটি শুধু আছে, নে। বলিয়া হাতে তুলিয়া দিতে গেল। সুন্দরী জিভ কাটিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বলিল, কত কষ্ট দিলাম—যাওয়া-আসার খরচ পর্যন্ত দিতে পারিনি। আর সে বলিতে পারিল না, কান্নায় তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল।

সুন্দরী একমুহূর্ত কি ভাবিল, পরক্ষণে হাত পাতিয়া বলিল, দাও। তুমি যাই হও, আমার চিরদিনের মনিব—আমার 'না' বলা সাজে না। বলিয়া আধুলিটি হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, তবে আর একবার ভিতরে এসো, বলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল।

নীলাম্বর পিছনে পিছনে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া মিনিট-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরের পায়ের কাছে একমুঠা টাকা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয় দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া আছে দেখিয়া, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে চেয়ে থাকলে ত হবে না বাবু, আমি চিরকালের দাসী, শুদ্দুর হলেও এ জোর শুধু আমারই আছে, বলিয়া হেঁট হইয়া টাকাগুলি তুলিয়া চাদরে বাঁধিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ তোমারই দেওয়া টাকা বাবু, তীর্থ করব বলে দেবতার নামে তুলে রেখেছিলুম—আর যেত হ'ল না—দেবতা নিজে ঘরে এসে নিয়ে গেলেন।

নীলাম্বর তখনও কথা কহিতে পারিল না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, বৌমা একলা আছেন, আর না, যাও—কিন্তু একথা যেন কিছুতেই না জানতে পারেন।

নীলাম্বর কি একটা কথা বলিতে গেল, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, হাজার হলেও শুনব না বাবু। আজ আমার মান না রাখলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। তাহার হাতের মধ্যে তখনও চাদরের সেই অংশটা ধরা ছিল, এমন সময় "কি হচ্ছে গো" বলিয়া নিতাই গাঙ্গুলী খোলা দরজার ভিতর দিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী চাদর ছাড়িয়া দিল।

নীলাম্বর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাই ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, ও ছোঁড়াটা নীলু নয়?

সুন্দরী মনে মনে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, হাঁ আমার মনিব।

শুনি, খেতে পায় না—এত রাত্তিরে যে?

কাজ ছিল, তাই এসেছিলেন।

ও—কাজ ছিল! বলিয়া নিতাই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ভাবটা এই যে তাহার মত বয়সের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ সহজ কর্ম নয়।

সুন্দরী হাসির অর্থ স্পষ্ট বুঝিল। নিতাইয়ের বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে, মাথার চুল বারো আনা পাকিয়াছে—তাহার গোঁফ-দাঁড়ি কামান, মাথায় শিখা, কপালে সকালের চন্দনের ফোঁটা তখনও রহিয়াছে—সুন্দরী তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির অর্থ বোঝা নিতায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সে কিছু উত্তেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, অমন করে চেয়ে আছ যে?

দেখচি।

কি দেখচ?

দেখচি তোমরাও বামুন, আর যিনি চলে গেলেন তিনিও বামুন, কিন্তু কি আকাশ-পাতাল তফাৎ!

নিতাই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্ন করিল, তফাৎ কিসে?

সুন্দরী একটুখানি হাসিয়া বলিল, বুড়ো মানুষ, আর হিমে থেকো না, দাওয়ায় উঠে ব'স! মাইরি বলচি গাঙ্গুলিমশাই, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, আমার মনিবের পায়ের এক ফোঁটা ধুলো পেলে তোমার মত কতকগুলি গাঙ্গুলি কত জন্ম উদ্ধার হতে পারে!

তাহার কথা শুনিয়া নিতাই ক্রোধে বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সুন্দরী একটা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে অত্যন্ত সহজভাবে বলিতে লাগিল, রাগ ক'রো না ঠাকুর, কথাটা সত্যি। আজ বলে নয়, বরাবরই দেখে আসচি, ও মনিবের পৈতেগাছটার দিকে চোখ পড়লে চোখ যেন ঠিকরে যায়—মনে হয়, ওঁর গলার ওপরে যেন আকাশের বিদ্যুৎ খেলা করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তোমাদের দেখ—দেখলেই আমার হাসি পায়। বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রথম হইতেই নিতাই ঈর্ষায় জ্বলিতেছিল, এখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখ আগুনের মত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, অত দর্প করিস্‌নে সুন্দরী, মুখ পচে যাবে।

সুন্দরী কলিকাটায় ফুঁ দিতে দিতে কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, কিচ্ছু হবে না—নাও, তামাক খাও। বরং তোমার মুখই মলে পুড়বে না—আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ।

নিতাই কলিকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী তাহার উত্তরীয়ের এক অংশ ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, ব'স ব'স মাথা খাও।

ক্রুদ্ধ নিতাই নিজের উত্তরীয় সজোরে টানিয়া লইয়া—গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও—নিপাত যাও, বলিয়া শাপ দিতে দিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুন্দরী সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া খুব খানিকটা হাসিল, তার পর উঠিয়া আসিয়া সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, কিসে আর কিসে! বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না—যেন আগুন জ্বলচে!

৯

ঠিক কাহার অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটা বিকৃত হইয়া বিরাজের কানে উঠিতে বাকী থাকিল না। সেদিন আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন ও বাড়ীর পিসীমা। বিরাজ সমস্ত মন দিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, ওঁর একটা কান কেটে নেওয়া উচিত পিসীমা।

পিসীমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন, জানি ত ওকে—এমন ফাজিল মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি আছে কি?

বিরাজ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, কবে আবার তুমি সুন্দরীর ওখানে গেলে?

নীলাম্বর ভয়ে শুষ্ক হইয়া গিয়া জবাব দিল, অনেকদিন আগে পুঁটির খবরটা নিতে গিয়েছিলাম।

আর যেও না। তার স্বভাব-চরিত্র শুনতে পাই ভারী মন্দ হয়েচে, বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। তারপর কতদিন কাটিয়া গেল। সূর্য্যদেব ওঠেন এবং অস্ত যান, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জো নাই বলিয়াই বোধ করি শীত গেল, গ্রীষ্মও যাই যাই করিতে লাগিল। বিরাজের মুখের উপর একটা গাঢ় ছায়া ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত এবং খরতর। যে কেহ তাহার দিকে চাহিতে যায়, তাহারই চোখ যেন আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। শূলবিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর শূলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যেভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা প্রায়ই হয় না। তিনি কখন চোরের মতন আসেন যান, সেদিকে সে যেন দৃষ্টিপাতই করে না। সবাই তাহাকে ভয় করে, শুধু করে না ছোটবৌ। সে সুযোগ পাইলেই যখন তখন আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। প্রথম প্রথম বিরাজ

ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। চোখ রাঙাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে।

সেদিন দশহরা। অতি প্রত্যূষে ছোটবৌ লুকাইয়া আসিয়া ধরিল, এখনও কেউ ওঠেনি দিদি, চল না একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।

ও-পারে জমিদারের ঘাট তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নদীতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

দুই জায়ে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, অদূরে একটা গাছতলায় জমিদার রাজেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থানটা হইতে তখনও সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায় নাই, তথাপি দুইজনেই লোকটাকে চিনিল। ছোটবৌ ভয়ে জড়সড় হইয়া বিরাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ অতিশয় বিস্মিত হইল। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? কিন্তু পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনা তাহার মনে উঠিল, হয় ত সে প্রত্যহ এমন করিয়াই প্রহরা দিয়া থাকে! মুহূর্ত্তের এক অংশ মাত্র বিরাজ দ্বিধা করিল, তারপর ছোটজায়ের একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, দাড়াস্ নে ছোটবৌ, চ'লে আয়।

তাহাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর ধীরপদে ফিরিয়া গিয়া রাজেন্দ্রর অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকেও সে দৃষ্টি রাজেন্দ্র সহিতে পারিল না, মুখ নামাইল।

বিরাজ বলিল, আপনি ভদ্রসন্তান, বড়লোক, এ কি প্রবৃত্তি আপনার!

রাজেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—জবাব দিতে পারিল না।

বিরাজ বলিতে লাগিল, আপনার জমিদারী যত বড়ই হউক, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা আমার। হাত দিয়া ও-পারের ঘাটটা দেখাইয়া বলিল, আপনি যে কত বড় ইতর, তা ঐ ঘাটের প্রত্যেক কাঠের টুকরোটা পর্য্যন্ত জানে, আমিও জানি। বোধ করি, আপনার মা বোন নেই। অনেক দিন আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুকতে নিষেধ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি।

রাজেন্দ্র এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ বলিল, আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিন্‌লে কখনই আসতেন না। তাই আজ ব'লে দিচ্চি, আর কখনও আসবার পূর্ব্বে তাঁকে চেনবার চেষ্টা ক'রে দেখবেন, বলিয়া বিরাজ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাড়িতে ঢুকিতে যাইতেছে, দেখিল পীতাম্বর একটা গাড়ু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহুদিন হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ ছিল না, তথাপি সে ডাকিয়া বলিল, বৌঠান, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সে-ই ও-ই জমিদারবাবু না?

চক্ষের নিমেষে বিরাজের চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে 'হাঁ' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া নিজের কথা সে তখনই ভুলিল, কিন্তু ছোটবৌর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি জানি, তাহাকে ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়াছে কি না, কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, মিনিট-দশেক পরে ও-বাড়ি হইতে একটা মারের শব্দ ও চাপা কান্নার আর্ত্তস্বর উঠিল।

বিরাজ ছুটিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছিল, পীতাম্বরের তর্জ্জন ও প্রহারের শব্দ মুহূর্ত্তকাল কান পাতিয়া শুনিল এবং পরক্ষণেই বেড়ার কাছে আসিয়া লাথি মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া ও-বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইল।

বেড়া ভাঙার শব্দে পীতাম্বর চমকিয়া মুখ তুলিয়া সুমুখেই যমের মত বড়-ভাইকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া থামিল।

নীলাম্বর ভূ-শায়িত ছোটবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই।

ছোটবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলে নীলাম্বর সহজভাবে বলিল, বৌমার সামনে আর তোর অপমান করব না, কিন্তু এই কথাটা আমার ভুলেও অবহেলা করিস নে যে, আমি যতদিন ও-বাড়িতে আছি, ততদিন এ সব চলবে না। যে হাতটা ওর গায়ে তুলবি, তোর সেই হাতটা আমি ভেঙে দিয়ে যাব। বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, বাড়ি চ'ড়ে মারতে এলে, কিন্তু কারণ জান?

নীলাম্বর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, জানতেও চাইনে।

পীতাম্বর বলিল, তা চাইবে কেন? আমাকে দেখছি তা হ'লে নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'বে।

নীলাম্বর তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, ভিটে ছেড়ে কাকে পালাতে হ'বে, সে আমি জানি—তোকে মনে ক'রে দিতে হ'বে না, কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোকে সবুর ক'রে থাকতেই হ'বে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম। বলিয়া আবার ফিরিবার উপক্রম করিতেই পীতাম্বর সহসা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তবে তোমাকেও জানিয়ে দিই দাদা। পরকে শাসন করবার আগে ঘর শাসন করা ভাল।

নীলাম্বর চাহিয়া রহিল, পীতাম্বর সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, ও-পারের ঘাটটা কার জান ত? বেশ। আমি সেই থেকে ছোটবৌকে ঘাটে যেতে মানা

ক'রে দেই। আজ রাত থাকতে উঠে বৌঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলেন—এমনই হয় ত রোজই যান, কে জানে?

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এই দোষে হাত তুললি?

পীতাম্বর বলিল, আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলের—কি জানি রাজেনবাবু না কি নাম ওর—দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি ধরে না। আজ যে বৌঠান তার সঙ্গে আধ ঘণ্টা ধ'রে গল্প করছিলেন, কেন?

নীলাম্বর বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, কে কথা কইছিল রে? বিরাজ-বৌ?

হাঁ, তিনিই।

নিজে চোখে দেখেছিস্?

পীতাম্বর মুখের ভাবটা হাসিবার মত করিয়া বলিল, তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না জানি—আমার সে বিচার নারায়ণ করবেন—কিন্তু—

নীলাম্বর চমকাইয়া উঠিল—আবার ঐ নাম মুখে আনে! কি বলবি বল্।

পীতাম্বর চমকিয়া উঠিয়া ঈষৎ হাসিয়া রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিল, চোখে না দেখে কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়। ঘর শাসন না করতে পার, পরকে তেড়ে মারতে এস না।

নীলাম্বরের মাথার উপর অকস্মাৎ যেন বাড়ি পড়িল। ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে প্রশ্ন করিল, আধ ঘণ্টা ধরে গল্প করছিল, কে বিরাজ-বৌ? তুই চোখে দেখেছিস্? পীতাম্বর দু এক পা ফিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, চোখেই দেখেচি। আধ ঘণ্টার হয়ত বেশীও হতে পারে।

আবার নীলাম্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া বলিল, ভাল, তাই যদি হয়, কি করে জান্‌লি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না?

পীতাম্বর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা জানি নে, তবে আমার মার-ধোর করা উচিত হয়নি, কেন না ঘাট তৈরি ছোটবৌর জন্য হয়নি।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় নীলাম্বর দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই থামিয়া পড়িল, তৎপরে পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুই জানোয়ার, তাতে ছোটভাই। বড়ভাই হ'যে আমি আর তোকে অভিসম্পাত করব না, আমি মাপ করলুম, কিন্তু আজ তুই যে কথা গুরুজনকে বল্‌লি, ভগবান তোকে মাপ করবেন না—যা, বলিয়া সে ধীরে ধীরে এ ধারে আসিয়া ভাঙা বেড়াটা নিজেই বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

বিরাজ কান পাতিয়া সমস্ত শুনিল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছিল, একবার ভাবিল, সামনে গিয়া নিজের সব কথা বলে, কিন্তু পা বাড়াইতেই পারিল না। তাহার রূপের উপর পর-পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বামীর সুমুখে এ কথা নিজের মুখে সে কি করিয়া উচ্চারণ করিবে।

বেড়া বাঁধিয়া দিয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা ভাত বাড়িয়া দিয়া বিরাজ আড়ালে বসিয়া রহিল, স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে নিঃশব্দে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং প্রভাতে তাঁহার ঘুম ভাঙিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গেল।

এমনি করিয়া পলাইয়া বেড়াইয়া যখন দুদিন কাটিয়া গেল, অথচ নীলাম্বর কোন প্রশ্ন করিল না, তখন আর এক ধরণের আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। স্ত্রী সম্বন্ধে এত বড় অপবাদের কথায় স্বামীর মনে কৌতূহল জাগে না, ইহার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না; কিংবা ঘটনাটায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন, এ সম্ভাবনাও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এ দুই দিন একদিকে যেমন সে গা ঢাকিয়া ফিরিয়াছে, অপর দিকে তেমনই অনুক্ষণ আশা করিয়াছে, এইবার কথা উঠিবে; এইবার তিনি ডাকিয়া ঘটনাটি জানিতে চাহিবেন। তাহা হইলে সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া স্বামীর পায়ের নীচে তাহার বুকের ভারী বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু কৈ, কিছুই যে হইল না! স্বামী নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

একবার সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত কথাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এই তাহার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাটাও কি তাঁহার চোখে পড়িয়া সংশয় উদ্রেক করিতেছে না? অথচ যাহা এতদিন পর্য্যন্ত সে গোপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা নিজেই বা আজ যাচিয়া বলিবে কিরূপে? সে দিনটাও এমনি করিয়া কাটিল। পরদিন সকালে ভয়ার্ত্ত ভয়াতুর হৃদয় লইয়া সে কোনমতে ঘরের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ ভয়ঙ্কর কথা তাহার বুকের গভীর তলদেশ আলোড়িত করিয়া ঘূর্ণাবর্ত্তের মত বাহির হইয়া আসিল, আর যদি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করিয়াই থাকেন, তা হ'লে?

নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিল, সে ঝড়ের মত আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিস্মিত নীলাম্বর মুখ তুলিতেই বিরাজ সজোরে নিজের অধর দংশন করিয়া বলিয়া উঠিল, কেন, কি করেচি? কথা কও না যে বড়?

নীলাম্বর হাসিল। বলিল, পালিয়ে বেড়ালে কথা কই কার সঙ্গে?

পালিয়ে বেড়াচ্চি! তুমি ডাকতে পারনি একবার?

নীলাম্বর বলিল, যে লোক পালিয়ে বেড়ায়, তাকে ডাকলে পাপ হয়!

পাপ হয়? তা হ'লে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেচ বল?

সত্যি কথা বিশ্বাস করব না।

বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, সত্যি নয়, ভয়ঙ্কর মিছে কথা। কেন তুমি বিশ্বাস করলে?

তুমি নদীর ধারে কথা বলনি?

বিরাজ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, হাঁ বলেচি।

নীলাম্বর বলিল, আমি ঐটুকুই বিশ্বাস করেচি।

বিরাজ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যদি বিশ্বাস করেচ, তবে ঐ হতরটার মত শাসন করলে না কেন?

নীলাম্বর আবার হাসিল। সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্ম্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল, তবে কাছে আয়, ছেলেবেলার মত আর একবার কান মলে দিই।

চক্ষের পলকে বিরাজ সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং পরক্ষণেই তাহার বুকের উপরে সজোরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর কাঁদিতে নিষেধ করিল না। তাহার নিজের দুই চোখও জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে স্ত্রীর মাথায় উপরে নিঃশব্দে ডান হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে কান্নার প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি তাকে বলেছিলুম জান?

নীলাম্বর সস্নেহে মৃদুস্বরে বলিল, জানি, তাকে আসতে বারণ করে দিয়েচ।

কে তোমাকে বললে?

নীলাম্বর সহাস্যে কহিল, কেউ বলেনি, কিন্তু একটা অচেনা লোকের সঙ্গে যখন কথা কয়েচ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েচ। সে কথা ও ছাড়া আর কি হতে পারে বিরাজ!

বিরাজের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু কাজটা ভাল করনি। আমাকে জানান উচিত ছিল, আমি গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আমি অনেকদিন পূর্ব্বে তার মনের ভাব টের পেয়েছি, কতদিন সকালে বিকালে তাকে দেখতেও পেয়েছি, কিন্তু তোমার নিষেধ মনে করেই কোনদিন কিছু বলিনি।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে বিছানায় শুইয়া আবার কথা উঠিল।

নীলাম্বর বলিল, আজ সারাদিন তাকে দেখবার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

বিরাজ ভীত হইয়া উঠিল, কেন?—কেন?

দুটো কথা না বললে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়ে থাকতে হবে, তাই।

ভয়ে উত্তেজনায় বিরাজ উঠিয়া বসিয়া বলিল, না, সে হ'বে না, কিছুতেই হ'বে না, এই নিয়ে তুমি তাকে একটি কথাও বলতে পাবে না।

তাহার মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীলাম্বর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি স্বামী, আমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই?

বিরাজ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বসিল, স্বামীর অন্য কর্ত্তব্য আগে কর, তার পরে এ কর্ত্তব্য করতে যেও।

কি? বলিয়া নীলাম্বর ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে 'আচ্ছা' বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল।

বিরাজ তেমনিভাবে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া আজ বাহির হইয়া গেল!

বাহিরে বর্ষার প্রথম বারিপাতের মৃদু শব্দে খোলা জানালার ভিতর দিয়া ভিজামাটির গন্ধ বহিয়া আসিতে লাগিল, ভিতরে স্বামী-স্ত্রী নির্ব্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর গভীর আর্ত্তকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, আমি যে কত অপদার্থ বিরাজ, তা তোর কাছে যেমন শিখি, তেমন আর কারও কাছে নয়।

বিরাজ কি কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া শব্দ ফুটিল না।

বহুদিন পরে আজ এই অসহ্য দুঃখদৈন্যপীড়িত দম্পতিটির সন্ধির সূত্রপাতেই আবার তাহা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

১০

মধ্যাহ্নে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বিরাজের পায়ের নিচে আসিয়া পড়িল। স্বামীর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই দুইদিন ধরিয়া সে অনুক্ষণ এই সুযোগটুকু প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাঁদিয়া বলিল, শাপ সম্পাত দিও না দিদি, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে মাপ কর, ওঁর কিছু হ'লে আমি বাঁচব না।

বিরাজ হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বিষন্ন গম্ভীর মুখে বলিল, আমি অভিসম্পাত দেব না বোন, আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু তোর মত সতী লক্ষ্মীর দেহে বিনা দোষে হাত তুললে মা দুর্গা সহ্য করবেন না যে!

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কি করব দিদি, ঐ তাঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন, তিনিই মাপ করবেন। তবুও এমন দেব-দেবতা নেই যে, এ জন্য মানত করিনি; কিন্তু মহাপাপী আমি; আমার ডাকে

কেউ কান দিলেন না। এমন একটা দিন যায় না দিদি, বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিরাজ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে, ছোটবৌর ডান রগের উপর একটা বাঁকা গাঢ় কাল দাগ পড়িয়াছে, সভয়ে বলিয়া উঠিল, তোর কপালে মারের দাগ না কি রে?

ছোটবৌ লজ্জিত-মুখ হেঁট করিয়া ঘাড় নাড়িল।

কি দিয়ে মারলে?

স্বামীর লজ্জায় মোহিনী মুখ তুলিতে পারিতেছে না, নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, রাগ হ'লে ওঁর জ্ঞান থাকে না দিদি।

তা জানি, তবু কি দিয়ে মারলে?

মোহিনী তেমনই নতমুখে থাকিয়াই বলিল, পায়ে চটি জুতা ছিল—

বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃত-কণ্ঠে বলিল, কি করে সহ্য করে রইলি ছোটবৌ?

ছোটবৌ একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি।

বিরাজ সে কথা যেন কানেই শুনিতে পাইল না, বিকৃত গলায় বলিল, আবার তার জন্য তুই মাপ চাইতে এলি?

ছোটবৌ বড়জার মুখপানে চাহিয়া বলিল, হাঁ দিদি! তুমি প্রসন্ন না হলে ওঁর অকল্যাণ হ'বে। আর সহ্য করার কথা যদি বললে দিদি, সে তো তোমার কাছেই শেখা, আমার যা কিছু সবই তোমার পায়ে—

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল,—না ছোটবৌ, না, মিছে কথা বলিসনে—এ অপমান, আমি সইতে পারি নে।

ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া বলিল, নিজের অপমান সইতে পারাটাই কি খুব বড় পারা দিদি? তোমার মত স্বামী-সৌভাগ্য সংসারে মেয়ে-মানুষের অদৃষ্টে জোটে না, তবুও তুমি যা সয়ে আছ সে সইতে গেলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাই। তাঁর মুখে হাসি নেই, মনের ভিতর সুখ নেই, তোমায় রাত দিন চোখে দেখতে হচ্চে, অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারতো না দিদি।

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ খপ করিয়া হাত দিয়া তাহার পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, ওঁকে ক্ষমা করলে? তোমার মুখ থেকে না শুনলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না—তুমি প্রসন্ন না হ'লে ওঁকে কেউ রক্ষে করতে পারবে না দিদি।

বিরাজ পা সরাইয়া লইয়া হাত দিয়া ছোটবৌর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, মাপ করলুম।

ছোটবৌ আর একবার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আনন্দিত মুখে চলিয়া গেল।

কিন্তু বিরাজ অভিভূতের মত সেইখানে বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বার বার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, 'এই দেখে শেখ বিরাজ!'

সেই অবধি অনেকদিন পর্য্যন্ত ছোটবৌ এ-বাড়িতে আসে নাই বটে, কিন্তু একটি চোখ, একটি কান এই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। আজ বেলা একটা বাজে, সে অতি সাবধানে এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া এ-বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিরাজ গালে হাত দিয়া রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

ছোটবৌ কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া নিজের মাথায় স্পর্শ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিদি কি পাগল হয়ে যাচ্চ?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল, তুই হতিস নে?

ছোটবৌ বলিল, তোমার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমাকে অপরাধী ক'র না দিদি, এই দুটি পা'র ধুলোর যোগ্যও ত আমি নই, কিন্তু তুমি বল, কেন এমন হচ্চ? কেন বট্‌ঠাকুরকে আজ খেতে দিলে না?

আমি ত খেতে বারণ করিনি!

ছোটবৌ বলিল, বারণ করনি সে কথা ঠিক, কিন্তু কেন একবার গেলে না? তিনি খেতে বসে কতবার ডাক্‌লেন, একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না। আচ্ছা তুমিই বল, এতে দুঃখ হয় কি না? একটিবার কাছে গেলে ত তিনি ভাত ফেলে উঠে যেতেন না।

তথাপি বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিতে লাগিল, 'হাত জোড়া ছিল' ব'লে আমাকে ত ভুলাতে পারবে না দিদি! চিরকাল সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাঁকে সুমুখে ব'সে খাইয়েচ—সংসারে এর চেয়ে বড় কাজ তোমার কোনদিন ছিল না, আজ—

কথা শেষ না হইবার পূর্ব্বেই বিরাজ উন্মাদের মত তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল, তবে দেখ্‌বি আয়। বলিয়া টানিয়া আনিয়া রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ চেয়ে দেখ।

ছোটবৌ চাহিয়া দেখিল, একটা কাল পাথরে অপরিষ্কৃত মোটা চালের ভাত এবং তাহারই একধারে অনেকটা কলমি-শাক সিদ্ধ, আর কিছুই নাই!

আজ কোন উপায় না দেখিয়া বিরাজ এইগুলি নদী হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ছোটবৌর দুচোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু বিরাজের চোখে জলের আভাস মাত্র নাই। দুই জায়ে নিঃশব্দে মুখোমুখি চাহিয়া রহিল।

বিরাজ অবিকৃত কণ্ঠে বলিল, তুইও ত মেয়েমানুষ, তোকেও ত রেঁধে স্বামীর পাতে ভাত দিতে হয়, তুই বল্‌, পৃথিবীতে কেউ কি সুমুখে বসে স্বামীর ওই খাওয়া চোখে দেখতে পারে? আগে বল্‌, ব'লে যা, তোর মুখে যা আসে তাই ব'লে আমাকে গাল দে, আমি কথা কব না।

ছোটবৌ একটা কথাও বলিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া তেমনই অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ রান্নার দোষে যদি কোনদিন তার একটি ভাতও কম খাওয়া হয়েছে ত সারাদিন বুকের ভিতর আমার কি ছুঁচ বিঁধেচে, সে আর কেউ জানে না, তুই ত জানিস ছোটবৌ, আজ তাঁর খিদের সময় আমাকে ঐ এনে দিতে হয়—গণ্ড বুঝি আর জোটে না—আর সহ্য করিতে পারিল না, ছোটজার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর, সহোদরার মত এই দুই রমণী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল, বহুক্ষণ ধরিয়া এই দুই বিভিন্ন নারীহৃদয় নিঃশব্দে অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তারপর বিরাজ মাথা তুলিয়া বলিল, না, তোকে লুকাব না, কেন না, আমার দুঃখ বুঝতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেচি, আমি স'রে না গেলে ওর কষ্ট যাবে না। কিন্তু থেকে ত ও-মুখ না দেখে একটা দিনও কাটাতে পারব না। আমি যাব, বল আমি গেলে ওকে দেখবি?

ছোটবৌ চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?

বিরাজের শুষ্ক ওষ্ঠাধরে কঠিন শীতল হাসির রেখা পড়িল, বোধ করি একবার সে দ্বিধাও করিল, তারপর বলিল, কি ক'রে জানব বোন কোথায় যেতে হয়, শুনি ওর চেয়ে পাপ নাকি আর নেই, তা সে যাই হোক্‌ এ জ্বালা এড়াব ত।

এবার মোহিনী বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া তাহার মুখে হাত চাপিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ছি, ছি, ও কথা মুখে এনো না দিদি! আত্মহত্যার কথা যে বলে তার পাপ, যে কানে শোনে তার পাপ, ছি ছি, কি হয়ে গেলে তুমি!

বিরাজ হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, তা জানি নে। শুধু জানি, ওকে আর খেতে দিতে পারছি নে। আজ আমাকে ছুঁয়ে কথা দে তুই, যেমন ক'রে পারিস্‌ দুই ভায়ে মিল করে দিবি।

কথা দিলুম, বলিয়া মোহিনী সহসা বসিয়া পড়িয়া বিরাজের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে আমাকেও আজ একটা ভিক্ষে দেবে বল?

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কি?

তবে এক মিনিট সবুর কর আমি আসছি, বলিয়া সে পা বাড়াইতেই বিরাজ

আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না যাস্ নে, আমি একটি তিল পর্য্যন্ত কারু কাছে নেব না।

কেন নেবে না?

বিরাজ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, সে কোনমতেই হবে না, আর আমি কারও কিছু নিতে পারব না।

ছোটবৌ ক্ষণেকের জন্যে স্থির দৃষ্টিতে বড়জার আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিল, তারপর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, তবে শোন দিদি। কেন জানি নে, আগে তুমি আমাকে ভালবাসতে না, ভাল ক'রে কথা কইতে না, সেজন্যে কত যে লুকিয়ে বসে কেঁদেচি, কত দেবদেবীকে ডেকেছি তার সংখ্যা নেই। আজ তাঁরাও মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমি ছোট বোন বলে ডেকেচ। এখন একবার ভেবে দেখ, আমাকে এই অবস্থায় দেখে কিছু না করতে পেলে তুমি কি রকম ক'রে বেড়াতে।

বিরাজ জবাব দিতে পারিল না। মুখ নিচু করিয়া রহিল।

ছোটবৌ উঠিয়া গিয়া অনতিকাল পরে একটা বড় ধামায় সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য পূর্ণ করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল।

বিরাজ স্থির হইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন কাছে আসিয়া তাহার আঁচলের একটি খুঁট তুলিয়া একটা মোহর বাঁধিতে লাগিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না, ও কিছুতেই হবে না—ম'রে গেলেও না।

মোহিনী ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। এ আমার বটঠাকুর আমার বিয়ের সময়ে দিয়েছিলেন। বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া আর একবার হেট হইয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

১১

নগরার এতদিনের পিতলের বজার কারখানা যেদিন সহসা বন্ধ হইয়া গেল এবং এই খবরটা চাঁড়ালদের সেই মেয়েটি বিরাজকে দিতে আসিয়া ছাঁচ বিক্রির অভাবে নিজের নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধার বিবরণ অনর্গল বকিতে লাগিল, বিরাজ তখন চুপ করিয়া শুনিল। তার পর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল মাত্র। মেয়েটি মনে করিল, তাহার দুঃখের অংশী মিলিল না, তাই ক্ষুণ্ণ

হইয়া ফিরিয়া গেল। হায় রে, অবোধ দুঃখীর মেয়ে! তুই কি করিয়া বুঝিবি, সেইটুকু নিশ্বাসে কি ছিল, সে নীরবতার আড়ালে কি ঝড় বহিতে লাগিল। শান্ত নির্ব্বাক ধরিত্রীর অন্তস্তলে কি আগুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কোথা পাইবি!

নীলাম্বর আসিয়া বলিল, সে কাজ পাইয়াছে। আগামী পূজার সময় হইতে কলিকাতার এক নামজাদা কীর্ত্তনের দলে সে খোল বাজাইবে।

খবর শুনিয়া বিরাজের মুখ মৃতের মত রক্তহীন হইয়া গেল। তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংস্রবে, সমস্ত ভদ্র সমাজের সম্মুখে নাচিয়া গাহিয়া ফিরিবে, তবে আহার জুটিবে! লজ্জা! ধিক্কারে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও পারিল না—আর যে কোন উপায় নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে নীলাম্বর সে মুখের ছবি দেখিতে পাইল না নিশ্চিন্ত হইল।

ভাঁটার টানে জল যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয় চিহ্ন তার প্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল। আর দ্রুত অতি সুস্পষ্ট ভাবে তেমনই করিয়া তাহার দেহতটের সমস্ত মলিনতা নিরন্তর অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার দেববাঞ্ছিত অতুল্য যৌবনশ্রী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল। দেহ শুষ্ক, মুখ ম্লান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক—যেন কি একটা ভয়ঙ্কর ভবের বস্তু সে অহরহ দেখিতেছে। অথচ তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। ছিল শুধু ছোটবৌ, সেও মাসাধিক কাল ভাইয়ের অসুখে বাপের বাড়ি গিয়াছে। নীলাম্বর দিনের বেলা প্রায়ই ঘরে থাকে না। যখন আসে তখন রাত্রির আঁধার, তাহার দুই চোখ প্রায়ই রাঙা, নিশ্বাসে উষ্ণ বহে। বিরাজ সবই দেখিতে পায়, সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু কোনো কথাই বলে না। বলিতে ইচ্ছাও করে না, তাহার সামান্য কথাবার্ত্তা কহিতেও এমনি ক্লান্তি বোধ হয়।

কয়েকদিন হইল, বিকাল হইতে তাহার শীত করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিতেছিল, এই লইয়াই তাহাকে স্তিমিত সন্ধ্যা-দীপটি হাতে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইত। স্বামী বাড়ি থাকে না বলিয়া, দিনের বেলা আর সে প্রায়ই রাঁধিত না, রাত্রে ভাত রাঁধিত কিন্তু তখন তাহার জ্বর। স্বামীর খাওয়া হইয়া গেলে হাত-পা ধুইয়া শুইয়া পড়িত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল। ঠাকুর-দেবতাকে বিরাজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতেও বলে না, পূর্ব্বের মত প্রার্থনাও জানায় না। আহ্নিক শেষ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া যখন প্রণাম করে, তখন শুধু মনে মনে বলে, ঠাকুর, যে পথে যাচ্ছি, সে পথে যেন একটু শীগ্‌গির ক'রে যেতে পাই।

সেদিন ছিল শ্রাবণের সংক্রান্তি। সকাল হইতে ঘন বৃষ্টিপাতের বিরাম ছিল না।

তিনদিন জ্বর ভোগের পর বিরাজ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সন্ধ্যার পর বিছানায় উঠিয়া বসিল। নীলাম্বর বাড়ি ছিল না। পরশু স্ত্রীর এত জ্বর দেখিয়াও তাহাকে শ্রীরামপুরের এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাটীতে কিছু প্রাপ্তির আশায় যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কথা ছিল, কোনমতেই রাত্রিবাস করিবে না, যেমন করিয়া হউক সেইদিন সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিবে। পরশু গিয়াছে, কাল গিয়াছে, আজও যাইতে বসিয়াছে, তাঁহার দেখা নাই। অনেকদিনের পর আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাজ যখন তখন কাঁদিয়াছে। আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে না পারিয়া, সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিয়া একটা গামছা মাথায় ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে যতদূর পারিল চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ পরে আবার কাঁদিতে লাগিল। কে জানি, তাঁহার কি ঘটিল। একে দুঃখে কষ্টে অনাহারে দেহ তাঁহার দুর্ব্বল, তাহাতে পরিশ্রম—কোথাও অসুখ হইয়া পড়িলেন, না, গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িলেন, কি হইল, কি সর্ব্বনাশ ঘটিল—ঘরে বসিয়া সে কি করিয়া বলিবে, কেমন করিয়া কি উপায় করিবে! আর একটা বিপদ, বাড়িতে পীতাম্বরও নাই, কাল বৈকালে সে ছোটবৌকে আনিতে গিয়াছে, সমস্ত বাড়ির মধ্যে বিরাজ একেবারে একা। আবার সে নিজেও পীড়িত। আজ দুপুর হইতে তাহার জ্বর ছাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরে এমন এতটুকু কিছু ছিল না যে সে খায়। দুদিন শুধু জল খাইয়া আছে। জলে ভিজিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, যে কোনমতে হাতে পায়ে ভর দিয়া পৈঠা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে ঢুকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

সদর দরজার ঘা পড়িল, বিরাজ একবার কান পাতিয়া শুনিল। দ্বিতীয় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 'যাই' বলিয়া চোখের পলকে ছুটিয়া আসিয়া কপাট খুলিয়া ফেলিল। অথচ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে উঠিয়া বসিতেও পারিতেছিল না।

যে করাঘাত করিতেছিল, সে ও-পাড়ার চাষাদের ছেলে। বলিল, মাঠাকুরুণ, দা'ঠাকুর একটা শুক্‌নো কাপড় চাইল—দাও।

বিরাজ ভাল বুঝিতে পারিল না, চৌকাঠে ভর দিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কাপড় চাহিলেন? কোথায় তিনি?

ছেলেটি জবাব দিল, গোপাল ঠাকুরের বাপের গতি ক'রে এই সবাই ফিরে এলেন যে।

গতি ক'রে? বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাদের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। তাহার বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, দিন-দুই পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্রিবেণীতে গঙ্গা-যাত্রা করান হইয়াছিল, আজ দ্বিপ্রহরে তিনি মরিয়াছেন,

দাহ করিয়া এই মাত্র সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি সব সংবাদ দিয়া শেষ-কালে জানাইল, দাদাঠাকুরের মত এ অঞ্চলে কেউ নাড়ী ধরতে পারে না, তাই তিনিও সেই দিন হ'তে সঙ্গে ছিলেন।

বিরাজ টলিতে টলিতে ভিতরে আসিয়া তাহার হাতে একখানা কাপড় দিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

জনপ্রাণীশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার স্ত্রী একা, জ্বরে দুশ্চিন্তায় অনাহারে মৃতকল্প, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিযুক্ত সেই হতভাগিনীর বলিবার বা কহিবার আর কি বাকী থাকে? আজ তাহার অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিতে লাগিল, বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নেই। তোর মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই—স্বামীও নেই। আছে শুধু যম। তাঁর কাছে ভিন্ন তোর জুড়াবার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, ঝিল্লির ডাকে বাতাসের স্বননে কেবল 'নাই' 'নাই' শব্দই তাহার দুই কানের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাঁড়ারে চাল নেই, গোলায় ধান নেই, বাগানে ফল নেই, পুকুরে মাছ নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই।—স্বাস্থ্য নেই—বাড়িতে ছোটবৌ নেই, সকলের সঙ্গে আজ তাহার স্বামীও নেই। অথচ আশ্চর্য এই যে, কাহারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ক্ষোভের ভাবও তাহার মনে উঠিল না। এক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর এই হৃদয়হীনতার শতাংশের একাংশ বোধ করি তাহাকে ক্রোধে পাগল করিয়া তুলিত, কিন্তু আজ কি এক রকমের শুষ্ক অবসাদ তাহাকে অসাড় করিয়া আনিতে লাগিল।

এমনই নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে কত কি ভাবিয়া দেখিতে চাহিল; ভাবিতেও লাগিল, কিন্তু সমস্ত ভাবনাই এলোমেলো! অথচ ইহারই মধ্যে অভ্যাস-বশে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয়নি যে!

আর শুইয়া থাকিতে পারিল না; ত্বরিত-পদে বিছানা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, রাঁধিবার মত যদি কোথাও কিছু থাকে। কিন্তু কিছুই নাই—একটা কণাও তাহার চোখে পাড়ল না। বাহিরে আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর হাতের প্রদীপ ফুঁদিয়া নিবাইয়া রাখিয়া খিড়কির কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কি নিবিড় অন্ধকার! ভীষণ স্তব্ধতা, ঘন গুল্মকণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পিচ্ছল পথ, কিছুই আজ তাহার গতিরোধ করিল না। বাগানের অপর প্রান্তে বনের মধ্যে চাঁড়ালদের ক্ষুদ্র কুটীর, সে সেইদিকে চলিল। বাহিরে প্রাচীর ছিল না, বিরাজ একেবারে প্রাঙ্গণের উপরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, তুলসী!

ডাক শুনিয়া তুলসী আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল—এই আঁধারে তুমি কেন মা?

বিরাজ কহিল, চাটি চাল দে!

চাল দেব? বলিয়া তুলসী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এই অদ্ভুত প্রার্থনার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

বিরাজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে থাকিস নে তুলসী, একটু শীগগির ক'রে দে।

তুলসী আরও দু-একটা প্রশ্নের পর চাল আনিয়া বিরাজের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু এ মোটা চালে কি কাজ হ'বে মা? এ ত তোমরা খেতে পাববে না!

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারব।

তারপর তুলসী আলো লইয়া পথ দেখাইতে চাহিল। বিরাজ নিষেধ করিয়া বলিল, কাজ নেই, তুই একা ফিরে আসতে পারবি নে। বলিয়া নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ চাঁড়ালের ঘরে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেল, অথচ এত বড় অপমান তাহাকে তেমন বিঁধিল না—শোক, দুঃখ, অপমান, অভিমান কোন বস্তুরই তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি তাহার দেহে ছিল না।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, নীলাম্বর আসিয়াছে। স্বামীকে সে তিন দিন দেখে নাই, চোখ পড়িবামাত্রই দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ক্রমাগত ঐদিকে টানিতে লাগিল, কিন্তু এখন আর তাহাকে এক পা টলাইতে পারিল না।

তীব্র তড়িৎ সংস্পর্শে ধাতু যেমন শক্তিময় হইয়া ওঠে, স্বামীকে কাছে পাইয়া চক্ষের নিমিষে সে তেমনই শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি সমস্ত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়াছিল, সেই দৃষ্টিতেই বিরাজ দেখিয়াছিল, তাহার দুই চোখ জবার মত ঘোর রক্তবর্ণ—মড়া পোড়াইতে গিয়া তাহারা যে এই তিন দিন অবিশ্রাম গাঁজা খাইয়াছে সে কথা তাহার অগোচর রহিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে থাকিয়া কাছে সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাওয়া হয়নি?

নীলাম্বর বলিল, না।

বিরাজ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল, নীলাম্বর সহসা ডাকিয়া বলিল,—শোন, এত রাত্তিরে একা কোথায় গিয়েছিলে?

বিরাজ দাঁড়াইয়া পড়িয়া এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া বলিল, ঘাটে।

নীলাম্বর অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, না ঘাটে তুমি যাওনি।

তবে যমের বাড়ি গিয়েছিলুম, বলিয়া বিরাজ রান্না ঘরে চলিয়া গেল। ঘণ্টা খানেক পরে ভাত বাড়িয়া যখন সে ডাকিতে আসিল; নীলাম্বর তখন চোখ বুজিয়া

'ঝিমাইতেছিল। অত্যধিক গাঁজার মহিমায় তাহার মাথা উত্তপ্ত এবং বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্ব প্রশ্নের অনুবর্ত্তি স্বরূপে কহিল, কোথায় গিয়েছিলে?

বিরাজ নিজের উদ্ধত জিহ্বাকে সজোরে দংশন করিয়া নিরুত্ত করিয়া শান্তভাবে বলিল, আজ খেয়ে শোও, সে কথা কাল শুনো।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজই শুনব। কোথায় গিয়েছিলে বল?

তাহার জিদের ভঙ্গি দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিল, বলিল, যদি না বলি?

বল্‌তেই হবে, বল।

আমি তা কিছুতেই বল্‌ব না। আগে খেয়ে শোও তখন শুনতে পাবে।

নীলাম্বর এ হাসিটুকু লক্ষ্য করিল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মুখ তুলিল। সে চোখে আর আচ্ছন্ন ভাব নাই, হিংসা ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ভীষণ কণ্ঠে বলিল, না, কিছুতেই না, কোনমতেই না। না শুনে তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাব না।

বিরাজ চমকাইয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চমকায় না। সে টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে পিছাইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি বল্‌লে? আমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবে না?

না, কোন মতেই না।

কেন?

নীলাম্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, আবার জিজ্ঞেস্ কচ্চ, কেন?

বিরাজ নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখে প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল, বুঝেছি! আর জিজ্ঞেস করব না। আমিও কোন মতে বল্‌ব না, কেন না কাল যখন তোমার হুঁশ হ'বে, তখন নিজেই বুঝবে—এখন তুমি তোমাতেই নেই।

নেশাখোর সব সইতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধিভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, গাঁজা খেয়েচি, এই বলছিস্ ত? গাঁজা আজ আমি নূতন খাইনি যে, জ্ঞান হারিয়েচি, বরং জ্ঞান হারিয়েচিস তুই, তুই আর তোতে নেই।

বিরাজ মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, কার চোখে ধূলা দিতে চাস বিরাজ? আমার? আমি অতি মূর্খ, তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু সে ছোট ভাই, যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নইলে কেন বল্‌তে পারিস্‌নে কোথা ছিলি? কেন মিছে কথা বল্‌লি—তুই ঘাটে ছিলি?

বিরাজের দুই চোখ এখন ঠিক পাগলের চোখের মত ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল,

তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল, মিছে কথা বল্‌ছিলুম, এ কথা শুন্‌লে তুমি লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে, হয়ত তোমার খাওয়া হবে না তাই, কিন্তু সে ভয় মিছে—তোমার লজ্জা-সরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই। কিন্তু তুমি মিছে কথা বলনি? একটা পশুরও এত বড় ছল করতে লজ্জা হ'ত, কিন্তু তোমার হ'ল না! সাধু পুরুষ! রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে কোন্ শিষ্যের বাড়িতে তিন দিন ধ'রে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে, বল?

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না। বলচি, বলিয়া হাতের কাছের শূন্য পানের ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। বড় ডিবা, তাহার কপালে লাগিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া খুলিয়া নিচে পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণ বাহিয়া ঠোঁটের প্রান্ত দিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া উঠিল।

বিরাজ বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আমাকে মারলে?

নীলাম্বরের ঠোঁট মুখ কাঁপিতে লাগিল, বলিল, না মারিনি। কিন্তু দূর হ সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস্‌নে—অলক্ষ্মী, দূর হয়ে যা।

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, যাচ্চি। এক পা গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিন্তু সহ্য হ'বে ত? কাল যখন মনে পড়বে, জ্বরের উপর আমাকে মেরেচ—তাড়িয়ে দিয়েচ, আমি তিন দিন খাইনি তবু এই অন্ধকারে তোমার জন্যে ভিক্ষা ক'রে এনেচি—সইতে পারবে ত? এই অলক্ষ্মীকে ছেড়ে থাকতে পারবে ত?

রক্ত দেখিয়া নীলাম্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল সে মূঢ়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিল, এই এক বছর যাই যাই করচি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। চেয়ে দেখ, দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এক পা চলতে পারিনে—আমি যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না। তোমার পায়ের নিচে মরবার লোভ আমার সবচেয়ে বড় লোভ—সেই লোভটাই আমি কোন মতে ছাড়তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম, বলিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে খিড়কির খোলা দোর দিয়া আর একবার অন্ধকারে বাগানের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নীলাম্বর কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু জিভ নাড়িতে পারিল না। ছুটিয়া পিছনে যাইতে চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। কোন মায়ামন্ত্রে তাহাকে অচল পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া বিরাজ অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ একবার ওই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদুপ্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে! যে কালো পাথরখণ্ডটার উপর একদিন বসন্ত প্রভাতে দুই ভাই-বোনকে অসীম স্নেহে সুখে এক হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কালো পাথরটার উপর বিরাজ

আজিকার আঁধার রাত্রে কি হৃদয় লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীর-ভিত্তিতে ধাক্কা খাইয়া আবর্ত্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেইদিকে একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নীচে কালো পাথর, মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশ, সুমুখে কালো জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ, স্তব্ধ বনানী—আর বুকের ভিতর জাগিতেছে তাদের চেয়ে কালো আত্মহত্যা প্রবৃত্তি। সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের হাত-পা বাঁধিতে লাগিল।

১২

প্রত্যুষের আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি জল পড়িতেছিল। নীলাম্বর খোলা দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সুপ্তকর্ণে শব্দ আসিল, হাঁ গা, বিরাজ-বৌমা!

নীলাম্বর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। হয়ত শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষায় মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে তুলসী ডাকিতেছে। কাল সমস্ত রাত্রি বনে বনে প্রতি বৃক্ষতলে খুঁজিয়া খুজিয়া কাঁদিয়া ঘণ্টা-খানেক পূর্ব্বে শ্রান্ত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় বসিয়াছিল, তার পর কখন ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তুলসী জিজ্ঞাস করিল, মা কোথায় বাবু?

নীলাম্বর হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুই তবে কাকে ডাকছিলি?

তুলসী বলিল, বৌমাকেই ত ডাকচি বাবু! কাল এক পহর রাতে কোথাও কিছু নেই, এই আঁধারে মা গিয়ে আমাদের বাড়ি মোটা চাল চেয়ে আনলে, তাই সকালে দোর খোলা পেয়ে জানতে এলুম, সে চেলে কি কাজ হ'ল?

নীলাম্বর মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

তুলসী বলিল, এত ভোরে তবে খিড়কি খুললে কে? তবে বুঝি বৌমা ঘাটে গেছেন, বলিয়া চলিয়া গেল।

নদীর ধারে ধারে প্রতি গর্ত্ত, প্রতি বাঁক, প্রতি ঝোপ-ঝাড় অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত দিন অভুক্ত, অস্নাত নীলাম্বর সহসা একস্থানে থামিয়া পড়িয়া বলিল, এ কি পাগলামি আমার মাথায় চাপিয়াছে! আমি যে সারাদিন খাই নাই, এখনও কি একথা তাহার মনে পড়িতে বাকী আছে? এর পরও সে কি কোথাও কোন কারণে

এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে ? তবে একি অদ্ভুত কাণ্ড সকাল হইতে করিয়া ফিরিতেছি ? এ-সব চোখের সামনে এমনই সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে কাদা ঠেলিয়া, মাঠ ভাঙিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটিল। বেলা যখন যায় যায়, পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব ক্ষণকালের জন্য মেঘের ফাঁকে রক্তমুখ বাহির করিয়াছেন, সে তখন বাড়ি ঢুকিয়া সোজা রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঝের উপর তখনও আসন পাতা, তখনও গতরাত্রির বাড়া ভাত শুকাইয়া পড়িয়া আছে—আরশোলা ইঁদুরে ছুটাছুটি করিতেছে—কেহ মুক্ত করে নাই। সে আঁধারে আঁধারে ঠাহর করে নাই; এখন ভাতের চেহারা দেখিয়াই বুঝিল, ইহাই তুলসীর মোটা চাল, ইহাই অভুক্ত স্বামীর জন্য বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে লুকাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল, ইহারই জন্য সে মার খাইয়াছে, অশ্রাব্য কটূ কথা শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে বর্ষার দুরন্ত রাতে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

নীলাম্বর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেয়েমানুষের মত গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যখন এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তখন আর আসিবার কথা ভাবিতে পারিল না। সে স্ত্রীকে চিনিত। সে যে কত অভিমানী, প্রাণ গেলেও সে যে অপরের ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া এই কলঙ্ক প্রকাশ করিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিল বলিয়াই তাহার বুকের ভিতরে এত সত্বর এমন হাহাকার উঠিল। তারপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতে লাগিল, এ আমি সইতে পারব না বিরাজ, তুই আয়।

সন্ধ্যা হইল, এ-বাড়িতে কেহ দীপ জ্বালিল না, রাত্রি হইল, রান্নাঘরে কেহ রাঁধিতে প্রবেশ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া গেল, কেহ মুছাইয়া দিল না। দুদিনের উপবাসীকে কেহ খাইতে ডাকিল না। বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল, ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের শিখা তাহার মুদ্রিত চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দুর্য্যোগের বার্ত্তা জানাইয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে উঠিয়া বসিল না, চোখ মেলিল না, একভাবে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সকাল। বাহিরের দিকে অস্পষ্ট কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরজায় একটা গো-শকট দাঁড়াইয়া আছে, ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই ছোটবৌ ঘোমটা টানিয়া দিয়া নামিয়া পড়িল। অগ্রজের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া পীতাম্বর ওধারে সরিয়া গেল। ছোটবৌ কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে কি-একটা আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ

করিতে গিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত ছোটবৌ হেঁট মাথা তুলিতে না তুলিতে সে দ্রুতপদে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছোটবৌ জীবনে আজ প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু-ভারাক্রান্ত রক্তাভ চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? দুঃখ কষ্টে দিদি আত্মঘাতী হলেন, তবুও আমরা পর হ'য়ে থাকব? তুমি থাকতে পার থাক গে, আমি আজ থেকে ও-বাড়ির সব কাজ করব।

পীতাম্বর চমকাইয়া উঠিল—সে কি কথা?

মোহিনী তুলসীর কাছে যতটুকু শুনিয়াছিল এবং নিজে যাহা অনুমান করিয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কহিল।

পীতাম্বর সহজে বিশ্বাস করিবার লোক নয়। কহিল, তাঁর দেহ ভেসে উঠবে ত?

ছোটবৌ চোখ মুছিয়া বলিল, না উঠতেও পারে! স্রোতে ভেসে গেছেন, সতী-লক্ষ্মীর দেহ মা-গঙ্গা হয়ত বুকে তুলে নিয়েচেন। তা ছাড়া কে বা সন্ধান করচে, কে বা খুঁজে বেড়িয়েছে?

পীতাম্বর প্রথমটা বিশ্বাস করিল না, শেষটা করিল; বলিল, আচ্ছা আমি খোঁজ করাচ্চি। একটু ভাবিয়া বলিল, বৌঠান মামার বাড়ি চ'লে যায়নি ত?

মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, কখ্খন না। দিদি বড় অভিমানী, তিনি কোথাও যাননি, নদীতেই প্রাণ দিয়েছেন।

আচ্ছা, তাও দেখছি, বলিয়া পীতাম্বর শুষ্কমুখে বাহিরে চলিয়া গেল। বৌঠানের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল। লোকজন নিযুক্ত করিয়া, একজন প্রজাকে বিরাজের মামার বাড়ি পাঠাইয়া, জীবনে আজ সে প্রথম পুণ্যের কাজ করিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, যদুকে দিয়ে উঠানের বেড়াটা ভাঙিয়ে দাও, আর যা পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না; বলিয়া গুড় মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া কাজে চলিয়া গেল। চার-পাঁচ দিন কামাই হওয়ায় তাহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

কাজ করিতে করিতে ছোটবৌ ক্রমাগত চোখ মুছিয়া ভাবিতেছিল, ইনি যে মুখের পানে চাইতে পারেন নাই, সে মুখ না জানি কি হইয়া গিয়াছে!

নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখানে চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুমুখে দেয়ালে টাঙান রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির পট। এই পটখানি নাকি জাগ্রত। যখন রেলগাড়ি হয় নাই, তখন তাহাদের পিতামহ পায়ে হাঁটিয়া এখানি বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সহিত পটখানি মানুষের গলায় কথা কহিত, এ ইতিহাস নীলাম্বর তাহার জননীর কাছে বহুবার শুনিয়াছিল। ঠাকুর-দেবতা জিনিসটা তাহার কাছে ঝাপ্সা ব্যাপার ছিল না। তেমন করিয়া ডাকার

মত ডাকিলে পারিলে এঁরা যে সুমুখে আসেন, কথা ক'ন, এ সমস্ত তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। তাই ইতিপূর্ব্বে গোপনে এই পটখানিকে কথা কহাইবার প্রয়াস সে যে কত করিয়াছে, তাহার অবধি নাই, কিন্তু সফল হয় নাই। অথচ এই নিষ্ফলতার হেতু সে নিজের অক্ষমতার উপরেই দিয়া আসিয়াছে, এমন সংশয় কোনদিন মনে উঠে নাই, পট সত্যই কথা কহে কি না। লেখাপড়া সে শিখে নাই। বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তারপর বিরাজের কাছে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে এবং একটু-আধটু চিঠিপত্র লিখিতে শিখিয়াছিল—শাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন ধার ধারিত না, তাই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার নিতান্তই মোটা ধরণের ছিল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন যুক্তি-তর্কও সহিতে পারিত না। ছেলেবেলায় এই সব লইয়া কখনও বা পীতাম্বরের সহিত কখনও বা বিরাজের সহিত তাহার মারপিট হইয়া যাইত।

বিরাজ তাহার অপেক্ষা মাত্র চার বছরের ছোট ছিল—তেমন মানিত না। একবার সে মার খাইয়া নীলাম্বরের পেট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ী উভয়কে ছাড়াইয়া দিয়া বিরাজকে ভৎ'সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, ছি মা, গুরুজনকে অমন করে কামড়ে দিতে নেই।

বিরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, ও আমাকে আগে মেরেছিল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া শপথ দিয়াছিলেন, বিরাজের গায়ে কখনো যেন সে হাত না তোলে। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর, আজ প্রায় ত্রিশ হইতে চলিয়াছে—সে অবধি মাতৃভক্ত নীলাম্বর সেদিন পর্য্যন্ত মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই।

আজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পুরাতন দিনের এইসব বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়া প্রথমে সে মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাহার জাগ্রত ঠাকুরকে দুটা সোজা কথায় বিড় বিড় করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিল, অন্তর্য্যামী ঠাকুর! তুমি ত সমস্তই দেখতে পেয়েছ! সে যখন এতটুকু অপরাধ করেনি, তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে, আর তাকে দুঃখ দিও না। তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল।

বাবা!

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ছোটবৌ অদূরে বসিয়া আছে। তাহার মুখে সামান্য একটু ঘোমটা, সে সহজকণ্ঠে বলিল, আমি আপনার মেয়ে, বাবা, ভেতরে আসুন, স্নান করে আপনাকে দুটি খেতে হবে।

প্রথমে নীলাম্বর নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল—কত যুগ যেন গত হইয়াছে, তাহাকে কেহ খাইতে ডাকে নাই। ছোটবৌ পুনরায় বলিল, বাবা, রান্না হয়ে গেছে।

এইবার সে বুঝিল। একবার তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তার পর সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—রান্না হয়ে গেল মা!

গ্রামের সবাই শুনিল, সবাই বিশ্বাস করিল, বিরাজ-বৌ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে; বিশ্বাস করিল না শুধু ধূর্ত্ত পীতাম্বর। সে মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, এই নদীতে এত বাঁক, এত ঝোপ-ঝাড়, মৃতদেহ কোথাও-না-কোথাও আটকাইবে। নদীতে নৌকা লইয়া ধারে ধারে বেড়াইয়া তটভূমির সমস্ত বন-জঙ্গল লোক দিয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও যখন শবের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, তখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, বৌঠান আর যাই করুক, নদীতে ডুবিয়া মরে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে একটা সন্দেহ তাহার মনে উঠিয়াছিল, আবার সেই সন্দেহটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। অথচ কাহারো কাছে বলিবার জো নাই। একবার মোহিনীকে বলিতে গিয়াছিল, সে জিভ কাটিয়া কানে আঙুল দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা হলে ঠাকুর-দেবতাও মিছে, দিনও মিছে, রাতও মিছে। দেওয়ালে টাঙান অন্নপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, দিদি ওঁর অংশ ছিলেন। এ কথা আর কেউ জানুক, আর না জানুক, আমি জানি, বলিয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বর রাগ করিল না—হঠাৎ সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

মোহিনী ভাসুরের সহিত কথা কহিতে শুরু করিয়াছে। ভাত বাড়িয়া দিয়া একটু-খানি আড়ালে বসিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। সমস্ত সংসারের মাঝে শুধু সে জানিল কি ঘটিয়াছিল, শুধু সেই বুঝিল, কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা ওঁর বুকে বিঁধিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, মা, যত দোষই করে থাকি না কেন, জ্ঞানে ত করিনি, তবে কি ক'রে মায়া সে কাটিয়ে চলে গেল? আর সইতে পারছিল না, তাই কি গেল মা?

মোহিনী অনেক কথা জানিত। একবার ইচ্ছা হইল বলে, দিদি, যাবে বলিয়া একদিন স্বামীর ভার তাহার উপরে দিয়াছিল; কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

পীতাম্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কও?

মোহিনী জবাব দিল, বাবা বলি, তাই কথা কই।

পীতাম্বর হাসিয়া বলিল, কিন্তু লোকে শুনলে নিন্দে করবে যে!

মোহিনী রুষ্ট ভাবে বলিল, লোকে আর কি পারে যে করবে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি ত লোকের নিন্দে আমি মাথায় পেতে নেব। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

১৩

পনর মাস গত হইয়াছে। আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ-আভাষ জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপরাহ্নবেলায় নীলাম্বর একখানা কম্বলের আসনের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত কৃশ, মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর, মাথায় ছোট ছোট জটা, চোখে বৈরাগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। মহাভারতখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা পুঁটিদের বোধ করি আজ আর আসা হ'ল না।

শুভ্র-বস্ত্র-পরিহিতা নিরাভরণা ছোটবৌ অনতিদূরে বসিয়া এতক্ষণ মহাভারত শুনিতেছিল, বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, না বাবা, এখনও সময় আছে- আসতেও পারে। দুর্দ্দান্ত শ্বশুরের মৃত্যুতে পুঁটি এখন স্বাধীন। সে স্বামী ও দাস-দাসী সঙ্গে করিয়া আজ বাপের বাড়ি আসিতেছে এবং পূজার কয়দিন এখানেই থাকিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছে। আজিও সে কোনও সংবাদ জানে না। তাহার মাতৃসমা বৌদিদি নাই —ছয়মাস পূর্ব্বে সর্পাঘাতে ছোটদাদা মরিয়াছে, কোন কথাই সে জানে না।

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই বোধ করি ছিল ভাল, একসঙ্গে এতগুলো সে কি সইতে পারবে মা?

প্রিয়তমা ছোটভগিনীকে স্মরণ করিয়া বহুদিন পরে আজ তাহার শুষ্ক চক্ষে জল দেখা দিল। যে রাত্রে পীতাম্বর সর্পদষ্ট হইয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আমার কোন ওষুধপত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাঁচতেও চাইনে, বলিয়া সর্ব্বপ্রকার ঝাড়-ফুঁক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার পায়ের নীচে মাথা ঘষিতেছিল এবং বিষের যাতনায় অব্যাহতি পাইবার আশায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পা ছাড়ে নাই, সেইদিন নীলাম্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল, আজ আবার সেই চোখে জল আসিয়াছে। পতিব্রতা সাধ্বী ছোটবধূ নিজের চোখের জল গোপনে মুছিয়া নীরব হইয়া রহিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, সেজন্যও তত দুঃখ করিনি মা, আমার পীতাম্বরের মত বিরাজকেও যদি ভগবান নিতেন ত আজ আমার সুখের দিন। সে ত হ'ল না। পুঁটি এখন বড় হয়েচে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েচে, তাই মায়ের মতন বৌদির এ-কলঙ্ক শুনলে বল ত মা, তার বুকের ভিতর কি করতে থাকবে! আর ত সে মুখ তুলে চাইতেও পারবে না।

সুন্দরী আত্মগ্লানি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাস-দুই পূর্ব্বে নীলাম্বরের কাছে কবুল করিয়া ফেলিয়াছিল, সে রাত্রে বিরাজ মরে নাই, জমিদার রাজেন্দ্রর সহিত গৃহ-

ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে নীলাম্বরের মনোকষ্ট আর দেখিতে পারিতেছিল না। মনে হইয়াছিল, এ-কথায় সে ক্রোধের বশে হয়ত দুঃখ ভুলিতে পারিবে। ঘরে আসিয়া নীলাম্বর এ কথা বলিয়াছিল।

সে কথা মনে করিয়া ছোটবৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝিকে জানিয়ে কাজ নেই।

কি ক'রে লুকাবে মা? যখন জিজ্ঞেস করবে, বৌদির কি হয়েছিল, তখন কি জবাব দেব?

ছোটবৌ বলিল, যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েছেন—তাই।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয় না মা। শুনেচি, পাপ গোপন করলেই বাড়ে, আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভার আর বাড়িয়ে দেব না। বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সেটুকু হাসিতে কত ব্যথা, কত ক্ষমা, তাহা ছোটবৌ বুঝিল। খানিক পরে ছোটবৌ অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে মৃদুস্বরে বলিল, এ-সব কথা হয়ত সত্যি নয় বাবা।

কোন্ সব কথা মা? তোমার দিদির কথা?

ছোটবৌ নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, সত্যি বই কি মা—সব সত্যি। জান ত মা, রেগে গেলে সে পাগ্‌লীর জ্ঞান থাকত না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হ'ল তখনও তাই। তাকে যে অত্যাচার, যে অপমান আমি করেছিলাম, সে সহ্য করতে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পারতেন না—সে ত মানুষ। নীলাম্বর হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, মনে হ'লে বুক ফেটে যায় মা, হতভাগী তিন দিন খায়নি, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে আমার জন্যে দুটি চাল ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, সেই অপরাধে আমি—আর সে বলিতে পারিল না, কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে নিরোধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল।

ছোটবৌ নিজেও তেমনই করিয়া কাঁদিতেছিল, সেও কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাটিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ মুছিয়া বলিল, অনেক কথাই তুমি জান, তবু শোন মা। কি ক'রে জানি নে, সেই রাতেই সে অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে উঠে তারপরে—উঃ—টাকার লোভে সুন্দরী, পাগ্‌লীকে আমার সেই রাতেই রাজেনবাবুর বজরায় তুলে দিয়ে আসে—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী নিজেকে ভুলিয়া, লজ্জা-সরম ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কখ্‌খনো সত্যি নয় বাবা, কখ্‌খনো সত্যি নয়। দিদির

দেহে প্রাণ থাকতে এমন কাজ তাঁকে কেউ করাতে পারবে না। তিনি যে সুন্দরীর মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তেন না!

নীলাম্বর শান্তভাবে বলিল, তাও শুনেচি। হয় ত তোমার কথাই সত্যি মা, দেহে তার প্রাণ ছিল না। ভাল ক'রে জ্ঞান-বুদ্ধি হ'বার পূর্ব্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায়নি, আজও তা আমার কাছে আছে, বলিয়া সে চোখ বুজিয়া তাহার হৃদয়ের অন্তরতম স্থান পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

ছোটবৌ মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত, পাণ্ডুর, নিমীলিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে-মুখে ক্রোধ বা হিংসা-দ্বেষের এতটুকু ছায়া নাই—আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা ও অনন্ত ক্ষমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা। সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে মনে মনে বলিল, দিদি চিনেছিল, তাতেই একটি দিনও ছেড়ে থাকতে চাইত না।

দীর্ঘ চার বৎসর পরে পুঁটি বাপের বাড়ি আসিয়াছে এবং বড় মানুষের মতই আসিয়াছে। তাহার স্বামী, ছয় মাসের শিশু পুত্র। পাঁচ-ছয় জন দাস-দাসী এবং অগণিত জিনিসপত্রে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্টেশনে নামিয়াই যদু চাকরের কাছে খবর শুনিয়া সে সেইখান হইতে কাঁদিতে শুরু করিয়াছিল। উচ্চরোলে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ি ঢুকিয়া দাদার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে রাত্রে জলস্পর্শ করিল না, দাদাকেও ছাড়িল না, এবং এই মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই সে একটু একটু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল। আগে বৌদিকে বরঞ্চ সে ভয় করিত। সঙ্কোচ করিত, কিন্তু দাদাকে ঠিক পুরুষ মানুষও মনে করিত না! সঙ্কোচও করিত না। সমস্ত আবদার উপদ্রব তাহার দাদার উপরেই ছিল। শ্বশুরবাড়ি যাইবার পূর্ব্বের দিনও সে বৌদির কাছে তাড়া খাইয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহার সেই দাদাকে যাহারা এতদিন ধরিয়া এত দুঃখ দিয়াছে, এমন জীর্ণ শীর্ণ এমন পাগলের মত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার ক্রোধ ও দ্বেষের পরিসীমা রহিল না! তাহার দাদার এত বড় দুঃখের কাছে পুঁটি আপনার সমস্ত দুঃখকেই একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিল। তাহার শ্বশুর কুলের উপর ঘৃণা জন্মিল, ছোটদের সর্পাঘাত তাহাকে বিঁধিল না এবং তাহার দুঃখিনী বিধবা ভাতৃজায়ার দিক হইতে সে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দুদিন পরে সে তাহার স্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, আমি দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাব, তুমি এই সব লট-বহর নিয়ে বাড়ি যাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, না হয় তুমিও সঙ্গে চল।

যতীন অনেক যুক্তি-তর্কের পর শেষ কাজটাই সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর একবার জিনিষপত্র বাঁধা-বাঁধির উদ্যোগে প্রস্থান করিল। যাত্রার আয়োজন

চলিতে লাগিল। পুঁটি সুন্দরীকে একবার গোপনে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে আসিল না। যে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাকে বলিয়া দিল, এ মুখ দেখাইতে পারিব না। এবং যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি। আর কিছু বলিবাব নাই। পুঁটি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পুঁটির নিদারুণ উপেক্ষা ও ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। সে হাত জোড় কবিয়া মনে মনে বড়জাকে স্মরণ করিয়া বলিল, দিদি, তুমি ছাড়া আমাকে আব কে বুঝবে! যেখানেই থাক, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করে থাক, সেই আমাব সর্ব্বস্ব। চিরদিনই সে নিস্তব্ধ প্রকৃতির, আজিও নীরবে সকলেব সেবা করিতে লাগিল। কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না। ভাসুরকে খাওয়াইবাব ভাব পুঁটি লইয়াছিল। এ কয়দিন সেখানেও বসিবাব আবশ্যক হইল না।

যাইবার দিন নীলাম্বর অত্যন্ত আশ্চয্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে না মা?

ছোটবৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

পুঁটি ছেলে কোলে করিয়া দাদাব পাশে আসিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিল, সে হবে না মা। তুমি একলাটি কেমন করেই বা থাকবে, আব থেকেই বা কি হবে মা? চল।

ছোটবৌ তেমনই হেঁট মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা। আমি কোথাও যেতে পারব না।

ছোটবৌর বাপেব বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। বিধবা মেয়েকে তাঁরা অনেকবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই যায় নাই।

নীলাম্বর তখন মনে করিত, সে শুধু তাহারই জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু এখন শূন্য বাটীতে কি হেতু একা পড়িয়া থাকিতে চাহে, কিছুই বুঝতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কেন কোথাও যেতে পারবে না মা?

ছোটবৌ চুপ করিয়া রহিল।

না বললে ত আমারও যাওয়া হবে না মা!

ছোটবৌ মৃদুকণ্ঠে বলিল, আপনি যান, আমি থাকি।

কেন?

ছোটবৌ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মনে মনে একটা সঙ্কোচের জড়তা প্রাণপণে কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর ঢোক গিলিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, কখনও যদি দিদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা!

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিল। খর বিদ্যুৎ চোখ-মুখ ধাঁধিয়া দিলে যেমন হয়, তেমনিই চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিল, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। মুহূর্ত্তেই নিজেকে

সংবরণ করিয়া লইয়া অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া কহিল, ছি মা, তুমিও যদি এমন ক্ষ্যাপার মত কথা বল, এমন অবুঝ হয়ে যাও তাহলে আমার উপায় কি হবে? ছোটবৌ চক্ষের পলকে চোখ বুজিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণে সংশয়লেশহীন স্থির মৃদুস্বরে বলিল, অবুঝ হইনি বাবা। আপনার যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য উঠতে দেখব, ততদিন কারো কোন কথা আমি বিশ্বাস করব না।

ভাইবোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে তেমনই সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্ফল হতে পাবে না। সতী-লক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশায় মুখ চেয়ে থাকব—আমাকে কোথাও যেতে বলবেন না বাবা। বলিয়া এক নিশ্বাসে অনেক কথা কহার জন্য মুখ হেঁট করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না, সে কান্না তাহার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কোথাও একটু আড়ালে গিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পুঁটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পায়ের নীচে বসাইয়া দিয়া আজ প্রথম সে এই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুট স্বরে কাঁদিয়া বলিল, বৌদি। কখনো তোমাকে চিনতে পারিনি বৌদি, আমাকে মাপ কর।

ছোটবৌ হেঁট হইয়া তাহার ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ দিয়া অশ্রু গোপন করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

১৪

বিরাজের মরাই উচিত ছিল, কিন্তু মরিল না। সেই রাত্রে মরিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার বহুদিনব্যাপী দুঃখ-দৈন্য পীড়িত দুর্ব্বল বিকৃত মস্তিষ্ক অনাহার ও অপমানের অসহ্য আঘাতে মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। মৃত্যু বুকে করিয়া যখন আঁচল দিয়া হাত-পা বাঁধিতেছিল তখন কোথায় বাজ পড়িল, সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীব্র আলোকে ওপারের সেই স্নানের ঘাট ও সেই মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। এগুলো এতক্ষণ ঠিক যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহারই দৃষ্টি অপেক্ষা করিয়াছিল,

চোখা-চোখি হইবামাত্রই ইসারা করিয়া ডাক দিল! বিরাজ সহসা ভীষণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্য্যন্ত খাবে না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!

কামারের জাঁতার মুখে জ্বলন্ত কয়লা যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া জ্বলিয়া ছাই হয়, বিরাজের প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের মুখে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার অতুল্য অমূল্য হৃদয়খানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে স্বামী ভুলিল, ধর্ম্ম ভুলিল, মরণ ভুলিল, এক দৃষ্টে প্রাণপণে ও-পারের ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। আবার কড়াকড় করিয়া অন্ধকারে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, একবার মুখ বাড়াইয়া জলের পানে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ির দিকে দেখিল। তাহার পর লঘু হস্তে নিজের বাঁধা বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে অন্ধকার বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহার দ্রুত পদশব্দে কত কি সর্ সর্ খস্ খস্ করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে সুন্দরীর কাছে চলিয়াছিল। পঞ্চানন ঠাকুর তলায় তাহার ঘর। পূজা দিতে গিয়া সে কতবার তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। এ গ্রামের বধূ হইলেও শৈশবে এ গ্রামের প্রায় সমস্ত পথ-ঘাটই সে চিনিত, অল্পকালের মধ্যেই সে সুন্দরীর রুদ্ধ জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ঘণ্টা-দুই পরেই কাঙালী জেলে তাহার পান্‌সীখানা ওপারের দিকে ভাসাইয়া দিল। অনেক রাত্রেই সে পয়সার লোভে সুন্দরীকে ওপারে পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, আজ শুধু একটির পরিবর্ত্তে দুটি রমণী নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্ধকারে বিরাজের মুখ সে দেখিতে পাইল না, পাইলেও চিনিতে পারিত না। তাহাদের ঘাটের কাছে আসিয়া দূর হইতে অন্ধকার তীরে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ ঋজু দেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিরাজ চোখ বুজিয়া রহিল।

সুন্দরী চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করিল, কে অমন ক'রে মারলে বৌমা?

বিরাজ অধীর হইয়া বলিল, আমার গায়ে হাত তুলতে পারে, সে ছাড়া আর কে সুন্দরী, যে বার বার জিজ্ঞেস কচ্চিস্? সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

আরো ঘণ্টা-দুই পরে একখান সুসজ্জিত বজরা নোঙর তুলিবার উপক্রম করিতেছে, বিরাজ সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, তুই সঙ্গে যাবিনে?

না বৌমা, আমি এখানে না থাকলে লোকে সন্দেহ করবে, যাও মা, ভয় নেই, আবার দেখা হবে।

বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পান্‌সীতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

জমিদারের সুশ্রী বজ্‌রা বিরাজকে লইয়া তীর ছাড়িয়া ত্রিবেণী অভিমুখে যাত্রা করিল। দাঁড়ের শব্দ ছাপাইয়া বাতাস চাপিয়া আসিল। দূরে একধারে মৌন রাজেন্দ্র নতমুখে বসিয়া মদ খাইতে লাগিল, বিরাজ পাষাণ মূর্ত্তির মত জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আজ রাজেন্দ্র অনেক মদ খাইয়াছিল। মদের নেশা তাহার দেহের রক্তকে উত্তপ্ত এবং মগজকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল। বজরা যখন সপ্তগ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল। বিরাজের রুক্ষ চুল এলাইয়া লুটাইতেছে, মাথার আঁচল খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে— কিছুতেই তাহার চৈতন্য নাই। কে আসিল, কে কাছে বসিল, সে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

কিন্তু রাজেন্দ্রর এ কি হইল? একাকী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ভূত-প্রেতের ভয় মানুষের বুকের মধ্যে যেমন তোলপাড় করিয়া উঠে তাহারও সমস্ত বুক-জুড়িয়া ঠিক তেমনই আতঙ্কের ঝড় উঠিল। সে চাহিয়া রহিল, ডাকিয়া আলাপ করিতে পারিল না।

অথচ এই রমণীটির জন্য সে কি না করিয়াছে! দুই বৎসর অহর্নিশ মনে মনে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে, নিদ্রায় জাগরণে ধ্যান করিয়াছে, চোখের দেখা দেখিবার লোভে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াছে—তাহার স্বপ্নের অগোচর এই সংবাদ, আজ যখন সুন্দরী ঘুম ভাঙাইয়া তাহার কানে কানে কহিয়াছিল, সে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এ সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সুমুখে নদী বাঁকিয়া গিয়া উভয় তীরে দুই প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়, বহু প্রাচীন বট ও পাকুড় গাছের ভিতর দিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বাঁশ, কঞ্চি ও গাছের ডাল জলের উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমস্ত স্থানটাকে নিবিড় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। বজরা এখানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে রাজেন্দ্র সাহস সঞ্চয় করিয়া, কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল, তুমি—আপনি—ভেতরে গিয়ে একবার বসুন—গায়ে ডালপালা লাগবে!

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সুমুখে একটা ক্ষুদ্র দীপ জলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে চোখাচোখি হইল, পূর্ব্বেও হইয়াছে। তখন দুর্ব্বৃত্ত পরের জমির উপর দাঁড়াইয়াও সে দৃষ্টি সহিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আজ নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে মাতাল করিয়াও সে এ চাহনির সুমুখে মাথা সোজা রাখিতে পারিল না—ঘাড় হেঁট করিল।

কিন্তু বিরাজ চাহিয়া রহিল। তাহার এত কাছে পর-পুরুষ বসিয়া অথচ মুখে তাহার আবরণ নাই। মাথায় এতটুকু আঁচল পর্য্যন্তও নাই। এ সময়ে বজ্‌রা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া ডালপালা সরাইতে ব্যস্ত হইল। নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাটার টানও এখানে অত্যন্ত প্রখর। ওরে

সাবধান। বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়ীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশে 'নামুন, ভিতরে আসুন' বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল।

বিরাজ মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্র চালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ 'মা গো' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

সে চীৎকারে রাজেন্দ্র চমকাইয়া উঠিল। যেন, অস্পষ্ট দীপালোকে বিরাজের দুই চোখ রক্তমাখা সিঁথার সিন্দুর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে মাতাল সে আগুনের সুমুখ হইতে আহত কুকুরের ন্যায় একটা ভীত ও বিকৃত শব্দ করিয়া কাঁপিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানুষ না জানিয়া অন্ধকারে পায়ের নীচে, ক্লেদাক্ত শীতল ও পিচ্ছিল সরীসৃপ মাড়াইয়া ধরিলে যে ভাবে লাফাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিরাজ ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল—একবার জলের দিকে চাহিয়া, পরক্ষণে, 'মা গো। এ কি করলুম মা।' বলিয়া অন্ধকার অতল জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দাঁড়ী-মাঝিরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ছুটাছুটি করিয়া বজ্‌রা উল্টাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল—আর কিছুই করিতে পারিল না। সবাই প্রাণপণে জলের দিকে চাহিয়াও সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু রাজেন্দ্র এক চুল নড়িল না। নেশা তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্রোতের টানে বজ্‌রা আপনি বাহিরে আসিয়া পড়ায় মাঝি উদ্বিগ্ন মুখে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু। কি করা যাবে? পুলিশে খবর দিতে হবে ত? রাজেন্দ্র বিহ্বলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভয়-কণ্ঠে বলিল, কেন, জেলে যাবার জন্যে? গদাই, যেমন ক'রে পারিস পালা। গদাই মাঝি পুরান লোক, বাবুকে চিনিত, সবাই চিনে—তাই ব্যাপারটা আগে, কতক অনুমানই করিয়াছিল। এখন এই ইঙ্গিতে তাহার চোখ খুলিয়া গেল। সে অপর সকলকে একত্র করিয়া চুপিচুপি আদেশ দিয়া বজরা উড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার কাছাকাছি আসিয়া রাজেন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। গত রজনীর সুগভীর অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া সে যে চোখ দেখিয়াছিল, স্মরণ করিয়া আজ দিনের বেলায় এতদূর আসিয়াও তাহার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সে মনে মনে নিজের কান মলিয়া বলিল, ইহজীবনে ও কাজ আর নয়। কিসের মধ্যে যে কি লুকান থাকে, কেহই জানে না। পাগ্‌লী যে কাল চোখ দিয়া তাহার পৈতৃক প্রাণটা শুষিয়া লয় নাই, ইহাই সে পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং কোন কারণে কখনও সে যে ও-মুখো হইতে পারিবে, সে ভরসা তাহার রহিল না। মূর্খ কুলটা লইয়াই এতাবৎ নাড়াচাড়া করিয়াছে। সতী যে কি বস্তু তাহা জানিত না। আজ পাপিষ্ঠের কলুষিত জীবনে প্রথম চৈতন্য হইল, খোলস লইয়া খেলা করা চলে, কিন্তু জীবন্ত বিষধর অত বড় জমিদার-পুত্রেরও ক্রীড়ার সামগ্রী নহে।

১৫

সেদিন অপরাহ্ণে যে স্ত্রীলোকটি বিরাজের শিয়রে বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরাজ জানিল, সে হুগলির হাসপাতালে আছে। দীর্ঘকাল বাত-শ্লেষ্মা বিকারের পর, যখন হইতে তাহার হুঁশ হইয়াছে, তখন হইতেই সে ধীরে ধীরে নিজের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একে একে অনেক কথা মনেও পড়িয়াছে।

একদিন বর্ষার রাত্রে স্বামী তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার পীড়ায় জর্জ্জর, উপবাসে অবসন্ন ভগ্ন দেহ, বিকল মন সে নিদারুণ অপবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। দুঃখে দুঃখে অনেকদিন হইতেই সে হয়ত পাগল হইয়া আসিতেছিল। সেদিন অভিমানে ঘৃণায় আর তাঁহার মুখ দেখিবে না বলিয়া সমস্ত বাঁধন ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নদীতে মরিতে গিয়াছিল—কিন্তু মরে নাই।

তারপর জ্বর ও বিকারের ঝোঁকে বজরায় উঠিয়াছিল এবং অর্দ্ধপথে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল, ভিজা মাথায়, ভিজা কাপড়ে সারারাত্রি একাকী বসিয়া জ্বরে কাঁপিয়াছিল, শেষে কি করিয়া না জানি, এক গৃহস্থের দরজায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এতটা মনে পড়ে। কে এখানে আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কতদিন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—মনে পড়ে না। তার মনে পড়ে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা—পর-পুরুষ আশ্রয় করিয়া গ্রামের বাহির হইয়াছিল।

ইহার পরে আর সে ভাবিতে পারিত না—ভাবিতে চাহিত না। তারপর ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যতের দিক হইতে নিজের চিন্তাকে সে প্রাণপণে বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা তাহার প্রতি অণু-পরমাণু অহর্নিশ ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিল সত্য, কিন্তু যে যবনিকা ফেলা আছে, তাহার এতটুকু কোণ তুলিয়া দেখিতেও ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যাইত, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া মূর্চ্ছার মত বোধ হইত। একদিন অগ্রহায়ণের প্রভাতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে কহিল, এখন সে ভাল হইয়াছে, এইবার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে। আচ্ছা বলিয়া বিরাজ চুপ করিয়া রহিল। সে স্ত্রীলোকটি হাসপাতালের লোক। সে বুঝিয়াছিল, এ পীড়িতার আত্মীয়-স্বজন সম্ভবতঃ কেহ নাই, কহিল, রাগ করো না বাছা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যারা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁরা আর কোনদিন ত দেখতে এলেন না, তাঁরা কি তোমার আপনার লোক নয়?

বিরাজ বলিল, না, তাঁদের কখনও চোখে দেখিনি। একদিন বর্ষার রাত্রে আমি ত্রিবেণীর কাছে ডুবে যাই। তাঁরা বোধ করি, দয়া করে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।

ওঃ, জলে ডুবেছিলে? তোমার বাড়ি কোথা গা?

বিরাজ মামার বাড়ির নাম করিয়া বলিল, আমি সেইখানেই যাইব, সেখানে আমার আপনার লোক আছে।

স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছিল এবং বিরাজের মধুর স্বভাবের গুণে একটু মমতাও জন্মিয়াছিল, দয়ার্দ্র-কণ্ঠে বলিল, তাই যাও বাছা, একটু সাবধানে থেকো, দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

বিরাজ একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর ভাল কি হবে মা? এ চোখও ভাল হবে না, এ হাতও সারবে না।

রোগের পর তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির চোখ ছল্ ছল করিয়া উঠিল, কহিল, বলা যায় না বাছা, সেরে যেতেও পারে।

পরদিন সে নিজের একখানি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং কিছু পাথেয় দিয়া গেল, বিরাজ তাহা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি নিজের মুখখানা একবার দেখব—একটা আরশি যদি—

আছে বৈকি, এখনই দিচ্চি, বলিয়া অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি দর্পণ বিরাজের হাতে দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বিরাজ আর একবার তাহার লোহার খাটের উপর ফিরিয়া গিয়া আরশি খুলিয়া বসিল। প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিবামাত্রই একটা অপরিমেয় ঘৃণায় তাহার মুখ আপনি বিমুখ হইয়া গেল। দর্পণটা ফেলিয়া দিয়া সে বিছানায় মুখ ঢাকিয়া গভীর আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। মাথা মুণ্ডিত—তাহার সেই আকাশভরা মেঘের মত কালো চুল কই? সমস্ত মুখ এমন করিয়া কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল! সেই পদ্মপলাশ চক্ষু কোথায় গেল? অমন অতুলনীয় কাঁচা সোনার মত বর্ণ কে হরণ করিল! ভগবান! এ কি গুরুদণ্ড করিয়াছ! যদি কখনও দেখা হয়, এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে! যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন আশা একেবারে নির্মূল হইয়া মরে না। তাই, তাহার হয়ত অতি ক্ষীণ একটু আশা অন্তঃসলিলার মত অতি নিভৃত অন্তস্তলে তখনও বহিতেছিল। দয়াময়! সেটুকু শুকাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল?

তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পরে রোগশয্যায় শুইয়া স্বামীর মুখ যখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, তখন কখনও বা সহসা মনে হইত, যাহা সে করিয়াছে, সে ত অজ্ঞান হইয়াই করিয়াছে, তবে কি সে অপরাধের ক্ষমা হয় না? সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, শুধু কি ইহারই নাই? অন্তর্যামী ত জানেন, যথার্থ পাপ সে করে নাই, তথাপি যেটুকু হইয়াছে, সেটুকু কি তাহার এতদিনের স্বামী-সেবায় মুছিবে না? মাঝে মাঝে বলিত, তাঁর মনে ত রাগ থাকে না, যদি হঠাৎ পায়ের উপর পড়ি, সব কথা খুলে বলি, আমার মুখের পানে চেয়ে কি করেন তা হ'লে? তাহা হইতে সম্ভবত

কি যে করেন, এই কল্পনাটাকে সে যে কত রঙে কত ভাবে ফুটাইয়া দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, ঘুম পাইলে উঠিয়া গিয়া চোখে জল দিয়া আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিত—হা ভগবান! তাহার সেই বিচিত্র ছবিটাকে কেন এমন করিয়া তুই পায়ে মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া দিলে? সে তাহার স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কোন্ লজ্জায় আর এমুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিবে!

ঘরে আর একজন রোগিণী ছিল, সে বিরাজের কান্না দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি হ'ল গা? কেন কাঁদছ?

হায় রে! আর একজন বিরাজের কান্নার হেতু জানিতে চায়!

বিরাজ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল!

সেই দিন লোকপরিপূর্ণ শব্দমুখর রাজপথের একপ্রান্ত বহিয়া যখন সে তাহার অনভ্যস্ত ক্লান্ত চরণ দুটিকে সারাজীবনের অনুদ্দিষ্ট যাত্রায় প্রথম পরিচালিত করিল, তখন, বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, ভগবান! হয়ত ভালই করিয়াছ। আর কেহ চাহিয়া দেখিবে না—এই মুখ, এই চোখ, হয়ত এই যাত্রারই উপযুক্ত। গ্রামের লোক জানিয়াছে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা। তাই, সে মুখ তুলিয়া তাহার গ্রামের মুখ, তাহার স্বামীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে মুখ হয়ত এমন হওয়াই তোমার মঙ্গলের বিধান!—বিরাজ পথ চলিতে লাগিল।

১৬

কত দিন গত হইয়া গিয়াছে। প্রথম সে দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভগ্ন দেহ অসমর্থ হইল—গৃহস্থ বিদায় দিলেন। তখন হইতে ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। সে পথে পথে ভিক্ষা করে, গাছতলায় রাঁধিয়া খায়, গাছতলায় শোয়। এই বর্তমান জীবনে, তাহার অতীতের তিলমাত্র চিহ্নও আর বিদ্যমান নাই। তাহার শতছিন্ন বস্ত্র, জটবাঁধা রুক্ষ একটুখানি চুল, মলিন ভিক্ষালব্ধ একখানি ছোট কাঁথা গায়ে। এখন তাহার তেমনই দেহ, তেমনই বর্ণ, তেমনই সব। অথচ, এই তাহার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স। এই দেহেরই তুলনা একদিন স্বর্গেও মিলিত না। অতীত হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া ভগবান তাহাকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সে নিজেও সব ভুলিয়াছে। শুধু ভুলিতে পারে নাই দুটি কথা। 'দাও' বলিতে এখনও তাহার মুখে রক্ত ছুটিয়া আসে—আজও কথা গলা দিয়া স্পষ্ট বাহির

করিতে পারে না। আর ভুলিতে পারে না যে, তাহাকে অনেক দূরে গিয়া মরিতে হইবে। মরণের সেই স্থানটুকু তাহার কোন্ দেশান্তরে তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু এটা জানে, সেই সুদূরের জন্যই সে অবিশ্রান্ত পথ চলিয়াছে। সে যে কোনমতেই এ দশা তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না, এবং দোষ তাহার যত অপ্রেমময়ই হউক, তাহার এ অবস্থা চোখে দেখিলে যে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবে, তাহা এক মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারে না বলিয়াই সে নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

একটা বৎসর পথ হাঁটিতেছে, কিন্তু কোথায় তাহার সেই অপরিচিত গম্য স্থান? কোথায় কোন্ ভূমিশয্যায় এই লজ্জাহত তপ্ত মাথাটা পাতিয়া এই লাঞ্ছিত জীবনটা নিঃশব্দে শেষ করিতে পারিবে? আজ দুদিন হইতে সে একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে—উঠিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে রোগ ঘিরিয়াছে—কাসি, জ্বর, বুকে ব্যথা। দুর্ব্বল দেহে শক্ত অসুখে পড়িয়া হাসপাতালে গিয়াছিল, ভাল হইতে না হইতেই এই পথশ্রম, অনশন ও অর্দ্ধাশন। তাহার বড় সবল দেহ ছিল বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে, আর বুঝি থাকে না। আজ চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, এই বৃক্ষতলই কি সেই গম্য স্থান? ইহার জন্যই কি সে এত দেশ, এত পথ অবিশ্রাম হাঁটিয়াছে? আর কি সে উঠিবে না? বেলা অবসান হইয়া গেল। গাছের সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল, সেই সঙ্গে তাহার নিমীলিত চোখের সম্মুখে অপরিচিত গৃহস্থ-বধূদের শান্ত-মঙ্গল মূর্ত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন, কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, হাতে দীপ লইয়া কোথায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসীতলায় দীপ দিয়া কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে—এই সমস্ত সে চোখে দেখিতে লাগিল, কানে শুনিতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পায় নাই, কাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে তাঁহার আয়ু ঐশ্বর্য্য মাগিয়া লয় নাই। এ সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু আর পারিল না। শাঁখের আহ্বানে তাহার ক্ষুধিত তৃষিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গৃহস্থ-বধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনশ্চক্ষে প্রতি ঘর-দোর, প্রতি প্রাঙ্গণ-প্রান্তর, বাঁধান তুলসী-বেদী, প্রতি দীপটি পর্য্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহার চেনা; সবগুলিতেই এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে! আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা রহিল না, পীড়ার যাতনা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া মনে মনে বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যখন তাহারা

রাঁধিতে গেল, সে সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সমাধা করিয়া অনেক রাত্রে যখন তাহারা নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তাহারই স্বামী। আর তাহার চোখের পলক পড়িল না, একদৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। গৃহ ছাড়িয়া পর্য্যন্ত এমন করিয়া একটি রাত্রিও ত তাহার কাছে আসে নাই! আজ তাহার ভাগ্যে এ কি অসহ্য সুখ, নিদ্রায় জাগরণে, তন্দ্রায় স্বপনে এ কি মধুর নিশাযাপন। বিরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। তখনও পূর্ব্বগগন স্বচ্ছ হয় নাই, তখনও দূরে ধূসর জ্যোৎস্না শাখা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামিয়া বৃক্ষতলে, তাহার চারিদিকে শেফালি পুষ্পের মত ঝরিয়া রহিয়াছে, সে ভাবিতেছিল, সে যদি অসতী, তবে কেন তিনি আজ এমন করিয়া দেখা দিলেন? তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই কি জানাইয়া দিয়া গেলেন? তবে ত এক মুহূর্ত্তও কোথাও সে বিলম্ব করিতে পারিবে না। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি সহসা তাহার রুদ্ধ দৃষ্টি সজোরে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত আনন্দে মাধুর্য্যে ভরিয়া দিয়া গিয়াছে। আর দেখা হউক বা না হউক, আর ত তাহাকে এক নিমিষের জন্যও স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না। এমন করিয়া তাঁহাকে যে পাইবার পথ ছিল, অথচ সে বৃথায় এতদিন স্বামীছাড়া হইয় দুঃখ পাইয়াছে, এই ত্রুটিটা তাহাকে গভীর বেদনায় পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে লাগিল। আজ কি করিয়া না জানি, তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি ডাকিতেছেন।

বিরাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, ঠিক ত! এই দেহটা কি আমার আপনার যে, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছে। বিচার করিবার অধিকার আমার নয়, তাঁর। যা করিবার—তিনিই করিবেন, আমি সব কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া ছুটি লইব। বিরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আজ তাহার দেহ লঘু, পদক্ষেপ যেন কঠিন মাটির উপর পড়িতেছে না, মন পরিপূর্ণ, কোথাও এতটুকু গ্লানি নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, তাহার এ কি বিষম ভুল! এ কি অহঙ্কার তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল? এই এরূপ কুৎসিত মুখ বিশ্বের সুমুখে বাহির করিতে লজ্জা হয় নাই, শুধু লজ্জা হইয়াছিল তাঁর কাছে, যাঁর কাছে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার তাহার নয় বৎসর বয়সে বিধাতা স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭

পুঁটি দাদাকে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয় না। পূজার সময় হইতে পৌষের শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত নগরের পর নগরে, তীর্থের পর তীর্থে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল। তার অল্প বয়স, সুস্থ সবল দেহ, অসীম কৌতূহল, তাহার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলা নীলাম্বরের সাধ্যাতীত—সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, কোথাও বসিয়া একটুখানি জিরাইয়া লইবার ইচ্ছা না হইয়া কেন যে সমস্ত দেহটা তাহার ঘরের পানে চাহিয়া অহর্নিশ কাঁদিয়া কাঁদিয়া নালিশ জানাইতেছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। কি আছে দেশে? কেন এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে মন বসে না? ছোটবৌ মাঝে মাঝে পুঁটিকে চিঠি দেয়; তাহাতেও এমন কোনও কথা থাকে না, তথাপি সেই বন জঙ্গলের অবিশ্রাম টানে তাহার শীর্ণ দেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি চায়—দাদা সব ভুলিয়া আবার তেমনিই হয়। তেমনিই সুস্থ সদানন্দ, তেমনই মুখে মুখে গান, তেমনই কারণে অকারণে উচ্চহাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু দাদা তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিতে বসিয়াছে। আগে সে এমন ভাবিয়া দেখে নাই। হতাশ হয় নাই, মনে করিত, আরও দুদিন যাক। কিন্তু দু'দিন করিয়া চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। বাড়ি ছাড়িয়া আসিবার দিনে, মোহিনীর কথায় ব্যবহারে বিরাজের উপর তাহার একটা করুণার ভাব আসিয়াছিল, তাহার কথাগুলো বিশ্বাসও করিয়াছিল। দাদা ভাল হইয়া গেলে ছেলেবেলার কথা মনে করিয়া সে হয়ত মনে মনে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেও পারিত। বস্তুত ক্ষমা করিবার জন্য, সেই বৌদিদিকে একটুখানি মাধুর্য্যের সহিত স্মরণ করিবার জন্য এক সময়ে সে নিজেও ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিতেছে কৈ? দাদা ভাল হইতেছে কৈ? একে ত সংসারে এমন কোনও দুঃখ, কোনও হেতু সে কল্পনা করিতে পারে না, যাহাতে এই মানুষটিকে এত দুঃখে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। বৌদি ভাল হউক, মন্দ হউক, পুঁটি আর ভ্রূক্ষেপ করে না, কিন্তু ত্যাগ করিয়া যাইবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে যে স্ত্রী অপরাধিনী, তাহার প্রতি বিদ্বেষেরও তাহার যেন অন্ত রহিল না, সেই হতভাগিনীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ এমন করিয়া মনে মনে পালন করিয়া, যে মানুষ নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে, তাহারও প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না!

একদিন সকালে সে মুখ ভার করিয়া আসিয়া বলিল, দাদা, বাড়ি যাই চল। নীলাম্বর কিছু বিস্মিত হইয়াই বোনের মুখের পানে চাহিল, কারণ, মাঘ মাসটা প্রয়াগে কাটাইবার কথা ছিল। পুঁটি দাদার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, একটা দিনও আর থাকতে চাইনে, কালই যাব।

তাহার রুষ্টভাব অবলোকন করিয়া নীলাম্বর একটুখানি বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল, কেন রে পুঁটি ?

পুঁটি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু-বিকৃত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—কি হবে থেকে ? তোমার ভাল লাগচে না, তুমি যাই যাই করে, প্রতিদিন শুকিয়ে উঠচ, না, আমি কিছুতেই একদিনও থাকবো না।

নীলাম্বর সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, ফিরে গেলেই কি ভাল হয়ে যাব রে ? এ দেহ সারবে ব'লে আর আমার ভরসা হয় না পুঁটি—ভাই চল বোন যা হবার ঘরে গিয়েই হক।

দাদার কথা শুনিয়া পুঁটি অধিকতর কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুমি সদাসর্ব্বদা তাকে এমন ক'রে ভাববে ? শুধু ভেবেই ত এমন হয়ে যাচ্চ।

কে বললে, আমি তাকে সর্ব্বদা ভাবি ?

পুঁটি তেমনই ভাবে জবাব দিল, কে আবার বলবে, আমি নিজেই জানি।

তুই তাকে ভাবিসনে ?

পুঁটি চোখ মুছিয়া উদ্ধতভাবে বলিল, না, ভাবিনে। তাকে ভাবলে পাপ হয়।

নীলাম্বর চমকিত হইল—কি হয় ?

পাপ হয়। তার নাম মুখে আনলে মুখ অশুচি হয়, মনে আনলে স্নান করতে হয়, বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দাদার স্নেহকোমল দৃষ্টি এক নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর বোনের মুখের দিকে চাহিয়া কঠিনস্বরে বলিল, পুঁটি।

ডাক শুনিয়া সে ভীত ও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে দাদার বড় আদরের বোন, ছেলে-বেলাতেও সহস্র অপরাধে কখনও এমন চোখ দেখে নাই, এমন গলা শুনে নাই। এখন বড় বয়সে বকুনি খাইয়া তাহার ক্ষোভে ও অভিমানে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নীলাম্বর আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলে সে চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দুপুর-বেলা দাদার আহারের সময় কাছে গেল না, অপরাহ্নে দাসীর হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলাম্বর ডাকিল না, কথাটি বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া সেই আসনেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পুঁটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠের উপর মুখ রাখিল। এটা তাহার নালিশ করার ধরন। ছেলে-বেলায় অপরাধ করিয়া বৌদির তাড়া খাইয়া এমনই করিয়া সে অভিযোগ করিত। নীলাম্বরের

সহসা তাহা মনে পড়িয়া চোখ সজল হইয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া কোমলস্বরে বলিল, কি রে ?

পুঁটি পিঠ ছাড়িয়া দিয়া কোলের উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে পুঁটি কান্নার সুরে বলিল, আর বলব না দাদা !

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না, আর ব'ল না।

পুঁটি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলাম্বর তাহার মনের কথা বুঝিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সে তোর গুরুজন শুধু সম্পর্কে নয় পুঁটি, তোকে মায়ের মত মানুষ ক'রে তোর মায়ের মতই হয়েচে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোর মুখে ও-কথায় গভীর অপরাধ হয়। পুঁটি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কেন সে আমাদের এ ন ক'রে ফেলে রেখে গেল ?

কেন যে গেল পুঁটি, সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী তিনি জানেন। সে নিজেও জানত না—তখন সে পাগল হয়েছিল, তার এতটুকু জ্ঞান থাকলে সে আত্মহত্যাই করত, এ কাজ করত না।

পুঁটি আর একবার চোখ মুছিয়া ভাঙা গলায় বলিল, কিন্তু এখন তবে কেন আসে না দাদা ?

কেন আসে না ? আসবার জো নেই ব'লেই আসে না দিদি, বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া ক্ষণকাল পরেই বলিল, যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে, তার এতটুকু ফেরবার পথ থাকলে, সে ফিরে আসত একটা দিনও কোথাও থাকত না। এ কথা কি তুই নিজেই বুঝিসনে পুঁটি ?

পুঁটি মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বুঝি দাদা—

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, তাই বল বোন। সে আসতে চায়, পারে না। সে যে কি শাস্তি পুঁটি, তা তোরা দেখতে পাসনে বটে, কিন্তু চোখ বুজলেই আমি তা দেখি। সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় করে আনচে রে, আর কিছুই নয় ?

পুঁটি কাঁদিয়া ফেলিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন-তখন বলত। এক সাধ, শেষ সময়ে আমার কোলে যেন মাথা রাখতে পায় ; আর সাধ, সীতা-সাবিত্রীর মত হয়ে মরণের পরে যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেছে।

পুঁটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, তোরা সবাই তার অপবাদ দিস্, বারণ করতে পারিনে বলে আমিও চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দিই কি

করে বল্ দেখি? তিনি ত দেখচেন, কার ভুল, কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে ডুবে গেল। তুই বল্, আমি কোন্ মুখে তার দোষ দিই, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ না করে কি ক'রে থাকি? না বোন, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হোক, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নেই। নিজের দোষে এ-জন্মে তাকে পেয়েও হারালাম, ভগবান করুন, যেন পরজন্মেও তাকে পাই।

সে আর বলিতে পারিল না, এইখানে তাহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল। পুঁটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আঁচল দিয়া দাদার চোখ মুছাইয়া দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল, সহসা তাহার মনে হইল, দাদা যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া বলিল, যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, কিন্তু আমি তোমাকে একটি দিন কোথাও একলা ছেড়ে দেব না।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

বিরাজ জগন্নাথের পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই পথ ধরিয়া যখন সে অনির্দ্দিষ্ট মৃত্যুশয্যার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, সে যাওয়ায় আর এই আসায় কি প্রভেদ। এখন সে বাড়ি যাইতেছে। তাহার দুর্ব্বল দেহ পথে যতই সকাতরে বিশ্রাম ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, ততই সে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোন কারণে কোথাও বিলম্ব করিতে সে সম্মত নয়। তাহার কাসি যক্ষ্মায় পরিণত হইয়াছে, ইহা সে টের পাইয়াছিল, তাই আশঙ্কার অবধি ছিল না, পাছে যাওয়া না ঘটে। ছেলেবেলা হইতে একটা বিশ্বাস তাহার বড় দৃঢ় ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। সে এই উপায়ে মরণের পূর্ব্বে একবার নিজের দেহটাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে নির্ভয়ে মহানন্দে জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে; কিন্তু দামোদরের এধারে আসিয়া তাহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল—আর কিছুতেই পা চলিল না। সে হতাশ হইয়া একটা গাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। এ কি ভয়ানক অপরাধ যে, এত করিয়াও তাহার শেষ আশা মিটিল না! তাহার এ জন্ম গেল, পরজন্মেও আশা নাই, তবে সে আর কি করিবে। আশা নাই, তবুও সে গাছতলায় পড়িয়া সারাদিন হাত জোড় করিয়া স্বামীর পায়ে মিনতি জানাইতে লাগিল।

পরদিন তারকেশ্বরের কাছাকাছি কোথাও হাটবার ছিল। প্রভাত হইতে সেপথে গরুর গাড়ি চলিতে লাগিল। সে সাহসে ভর করিয়া এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানকে

আবেদন করিল। বুড়ো মানুষ তাহার কান্না দেখিয়া, সম্মত হইয়া তাহাকে গাড়ি করিয়া তারকেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বিরাজ স্থির করিল, এই মন্দিরের আশে-পাশে কোথাও সে পড়িয়া থাকিবে। এখানে কত লোক আসে যায়, যদি কোন উপায়ে একবার ছোটবৌয়ের কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

কঠিন-ব্যাধি-পীড়িত কত নরনারী, কত কামনায় এই দেব-মন্দির ঘিরিয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে আসিয়া বিরাজ অনেকদিনের পর একটু শান্তি অনুভব করিল। তাহাদের মত তাহারও ব্যাধি আছে, কামনা আছে, সে তাই লইয়া এখানে নীরবে পড়িয়া থাকিতে পাইবে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, কাহারও অর্থহীন কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে না মনে করিয়া এত দুঃখের মাঝেও আরাম পাইল; কিন্তু রোগ দ্রুত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। মাঘের এই দুর্জ্জয় শীতে ও অনাহারে ছয়দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটিবে বলিয়াও আশা হইল না, কেহ আসিবে বলিয়াও ভরসা রহিল না। ভরসা রহিল শুধু মৃত্যুর—সে তারই জন্য আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; অপরাহ্ন না হইতেই আঁধার বোধ হইতে লাগিল। ও-বেলায় তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি রক্ত উঠায় মৃতকল্প দেহটা যেন একেবারে নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, বুঝি আজই সব সাঙ্গ হইবে এবং তখন হইতেই মন্দিরের পিছনে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের পূজা হইয়া গেলে অন্যদিনের মত উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিতে পারিল না—মনে মনে করিল। এতদিন স্বামীর চরণে সে শুধু মিনতি জানাইয়াই আসিয়াছে। সে অবোধ নয়, যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে এ-জন্মের কোন দাবি রাখে নাই, শুধু পরজন্মের অধিকার না যায়, ইহাই চাহিয়াছে। না বুঝিয়া অপরাধ করার শাস্তি যেন এ-জন্ম অতিক্রম করিয়া পরজন্ম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে না পায়, এই ভিক্ষাই মাগিয়াছে; কিন্তু বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার ধারা সহসা এক আশ্চর্য্য পথে ফিরিয়া গেল। ভিক্ষার ভাব রহিল না, বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া এক অপূর্ব্ব অভিমানের সুর অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে বাজিয়া উঠিল। সে তাহাতেই মগ্ন হইয়া কেবল মনে মনে বলিতে লাগিল, কেন তবে তুমি বলেছিলে!

অজ্ঞাতসারে কখন তাহার পঙ্গু বাঁ হাতখানি স্খলিত হইয়া পথের উপর পড়িয়াছিল, সে টের পাই নাই, সহসা তাহারই উপর [illegible] কঠিন ব্যথা পাইয়া সে অস্ফুটস্বরে কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। এটা যাতায়াতের পথ। যে ব্যক্তি না দেখিয়া এই অবশ শীর্ণ হাতখানি মাড়াইয়া দিয়াছিল, সে অতিশয় লজ্জিত ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া

বলিল, আহা হা—কে গা, এমন ক'রে পথের উপর শুইয়া আছ ? বড় অন্যায় করেচি—বেশী লাগেনি ত ?

চক্ষের পলকে বিরাজ মুখের কাপড় সরাইয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া চুপ করিল এই ব্যক্তি নীলাম্বর। সে একবার একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ হইল সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ছিল না, দিক-চক্রবাল-বিচ্ছুরিত স্বর্ণাভা মন্দিরের চূড়ায়, গাছের আগায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া পুঁটিকে কহিল, ওই রোগা মেয়েমানুষটিকে বড় মাড়িয়ে দিয়েছি বোন, দেখ্‌ দেখি যদি কিছু দিতে পারিস্‌ -বোধ করি ভিক্ষুক।

পুঁটি চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। তাই সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত, তথাপি যেন মনে হইল, এ মুখ যেন সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তোমার বাড়ি কোথায় ?

সাতগাঁয়ে, বলিয়া স্ত্রীলোকটি হাসিল।

বিরাজের সবচেয়ে মধুর সামগ্রী ছিল তাহার মুখের হাসি; এ হাসি সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও ভুল করিবার জো ছিল না। ওগো এ যে বৌদি, বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই পুঁটি সেই জীর্ণ-শীর্ণ দেহের উপরে পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কথাবার্ত্তা শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বুঝিল। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার অপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর শান্ত-কণ্ঠে বলিল, এখানে কাঁদিসনে পুঁটি, ওঠ, বলিয়া ভগিনীকে সরাইয়া দিয়া স্ত্রীর শীর্ণ দেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

* * * *

চিকিৎসার জন্য উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য বিরাজকে অনেক সাধ্য-সাধনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনমতেই তাহাকে রাজী করান যায় নাই। আর ঘর ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

নীলাম্বর পুঁটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল, আর ক'টা দিন বোন ? যেখানে যেমন করে ও থাকতে চায় দে। আর্‌ ওকে তোরা পীড়াপীড়ি করিসনে।

তারকেশ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে প্রথম আবেদন জানাইয়াছিল, তাহাকে ঘরে লইয়া চল, তাহার নি[illegible] শয্যার উপরে শোয়াইয়া দাও। ঘরের উপর, ঘরের প্রতি সামগ্রীটির উপর [illegible]স্বামীর উপর তাহার কি ভীষণ তৃষ্ণা, তাহা যে কেহ চোখে দেখে সেই উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। দিবারাত্রির অধিকাংশ

সময়ই সে জ্বরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, একটু সজাগ হইলেই ঘরের প্রতি বস্তুটি তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া দেখে।

নীলাম্বর শয্যা ছাড়িয়া প্রায়ই কোথাও যায় না এবং প্রায়ই সজল চক্ষে প্রার্থনা করে, ভগবান, অনেক শাস্তি দিয়াছ, এইবার ক্ষমা কর। যে লোক পরলোকে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ইহলোকের মোহ কাটাইয়া দাও।

গৃহত্যাগিনীর গৃহের উপর এই নিদারুণ আকর্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। কাল হইতে তাহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ সারাদিন ভুল বকিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঘুমাইয়াছিল, সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া চাহিল। পুঁটি কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ের কাছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ছোটবৌ শিয়রের কাছে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া বলিল, ছোটোবৌ না?

ছোটবৌ মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, হাঁ দিদি, আমি মোহিনী।

পুঁটি কোথায়?

ছোটবৌ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, তোমার পায়ের কাছে ঘুমুচ্চে।

উনি কৈ?

ও-ঘরে আহ্নিক কচ্চেন।

তবে আমিও করি, বলিয়া সে চোখ বুজিয়া মনে মনে জপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডান হাত ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল তারপর ছোটবৌয়ের মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি আজই চললুম বোন, কিন্তু আবার যেন দেখা হয়, আবার যেন তোকেই এমন কাছে পাই।

বিরাজের সময় যে একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কাল হইতে তাহা সকলেই টের পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ছোটবৌ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

বিরাজের বেশ জ্ঞান আসিয়াছে সে কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া চুপি চুপি বলিল, ছোটবৌ, সুন্দরীকে একবার ডাকতে পারিস?

ছোটবৌ রুদ্ধস্বরে বলিল, আর তাকে কেন্ দিদি? সে আসবে না।

আসবে রে আসবে। একবার ডাকা—আমি তাকে মাপ করে আশীর্ব্বাদ করে যাই। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কারও ওপর কোন ক্ষোভ নেই। ভগবান আমাকে যখন ক্ষমা করে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েচেন, আমিও তখন সকলকে ক্ষমা করে যেতে চাই।

ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, [illegible]ার ক্ষমা কি দিদি? বিনা অপরাধে এত দণ্ড দিয়েও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ন[illegible]মাকে নিতে বসেচেন। একটা হাত নিলেন, তবুও যদি তোমাকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে দিতেন—

বিরাজ হাসিয়া উঠিল; বলিল, কি করতিস আমাকে নিয়ে? পাড়ায় দুর্নাম রটেচে—আমার বেঁচে থাকায় আর ত লাভ নেই বোন।

ছোটবৌ গলায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, আছে দিদি, তা ছাড়া ও ত মিথ্যে দুর্নাম—ওতে আমরা ভয় করিনে।

তোরা করিসনে, আমি করি। দুর্নাম মিথ্যে নয়, খুব সত্যি। আমার অপরাধ যতটুকুই হয়ে থাক ছোটবৌ, তার পরে আর হিন্দুর ঘরের মেয়ের বাঁচা চলে না। তোরা ভগবানের দয়া নেই বলচিস্, কিন্তু—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুঁটি উচ্ছ্বসিত কান্নার স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, ওঃ ভারি দয়া ভগবানের!

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া কাঁদিতেছিল আর শুনিতেছিল। আর সে সহ্য করিতে না পারিয়া অমন করিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিল, তাঁর এতটুকু বিচার নেই। যারা আসল পাপী, তাদের কিছু হল না, আর আমাদেরই তিনি এমন করে শাস্তি দিচ্চেন।

তাহার কান্নার দিকে চাহিয়া বিরাজ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কি মধুর, কি বুক-ভাঙা হাসি। তার পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, চুপ কর পোড়ারমুখী, চেঁচাস্‌নে।

পুঁটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তুমি ম'রো না বৌদি, আমরা কেউ সইতে পারব না। তুমি ওষুধ খাও—আর কোথাও চল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি বৌদি, আর দু'টো দিন বাঁচ।

তাহার কান্নার শব্দে আহ্নিক ফেলিয়া নীলাম্বর ত্রস্তপদে কাছে আসিয়া শুনিতে লাগিল, পুঁটির যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া বাঁচিবার জন্য বৌদিকে ক্রমাগত অনুনয় করিতে লাগিল। এইবার বিরাজের দুই চোখ বহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল। ছোট বৌ সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া পুঁটিকে টানিয়া লইতেই, সে তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সকলকে কাঁদাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বিরাজ অনবরত ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল, কাঁদিস্‌নে পুঁটি শোন্।

নীলাম্বর আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, বিরাজের চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে তাহা সে বুঝিল। বিরাজ বলিতে লাগিল, না শুনে তাঁর দোষ দিস্ না পুঁটি। কি সূক্ষ্ম বিচার! তবু যে কত দয়া সে কথা আজ আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। মরাই আমার বাঁচা সে কথা আমি গেলেই তোরা বুঝবি। আর বলচিস্—একটা হাত আর একটা চোখ নিয়েচেন, সে ত দুদিন আগে যেতই। কিন্তু এইটুকু শাস্তি দিয়ে তিনি তোদের কোলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েচেন সেটা তোরা কি করে ভুলবি পুঁ[illegible]

ছাই ফিরিয়ে দিয়েছেন, বলিয়া পুঁটি [illegible]তই লাগিল।

ভগবানের দয়া বা সূক্ষ্ম বিচারের একটা বর্ণও সে বিশ্বাস করিল না। বরং সমস্ত

ব্যাপারটা তাহার কাছে গভীর অত্যাচার ও অবিচার বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। খানিকপরে বিরাজ বলিল, পুঁটি, অনেকক্ষণ দেখিনি রে, তোর দাদাকে একবার ডাক।

নীলাম্বর আড়ালেই ছিল, আসিতেই ছোটবৌ বিছানা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর শিয়রে বসিয়া স্ত্রীর ডান হাতটা সাবধানে নিজের হাতে তুলিয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল। সত্যই বিরাজের আর কিছু ছিল না। সে যে জ্বরের উপর এত কথা বলিতেছে এবং ইহারই অবসানের সঙ্গে খুব সম্ভব সমস্তই শেষ হইবে, তাহা সে পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল, এখন তাহাই বুঝিল।

বিরাজ বলিল, বেশ হাত দেখ, বলিয়াই হাসিল।

সহসা সে মর্ম্মান্তিক পরিহাস করিয়া ফেলিল। এই উপলক্ষ করিয়াই যে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা সকলেরই মনে পড়িয়া গেল। বেদনায় নীলাম্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিরাজও বোধ করিয়া তাহা দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, না, না, তা বলিনি—সত্যিই বলচি, আর কত দেরি? বলিয়া চেষ্টা করিয়া নিজের মাথা স্বামীর ক্রোড়ে তুলিয়া বলিল, সকলের সুমুখে আর একবার তুমি বল, আমাকে মাপ করেচ?

নীলাম্বর রুদ্ধস্বরে 'করেচি' বলিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিল।

বিরাজ ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, জ্ঞানে, অজ্ঞানে এতদিনের ঘরকন্নায় কতই না দোষ-ঘাট করেচি—ছোটবৌ, তুমিও শোন, পুঁটি, তুইও শোন দিদি, তোমরা সব ভুলে আজ আমাকে বিদেয় দাও—আমি চল্লুম। বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদতল খুঁজিতে লাগিল। নীলাম্বর মাথায় বালিশটা এক পাশে সরাইয়া দিয়া উপরে পা তুলিতেই বিরাজ হাত দিয়া ক্রমাগত পায়ের ধূলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হল—আর কিছু নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ - এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে। বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, এমনই করে আমাকে নিয়ে থাক, কোথাও যেও না, বলিয়া সে নীরব হইল। সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলেই শুষ্কমুখে বসিয়া রহিল। রাত্রি বারোটার পর হইতে সে ভুল বকিতে লাগিল। নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা—হাসপাতালের কথা—নিরুদ্দেশ পথের কথা, কিন্তু সব কথার মধ্যে অত্যুগ্র একাগ্র পতিপ্রেম। মুহূর্ত্তের ভ্রমে কি করিয়া সে সতী-সাধ্বীকে দগ্ধ করিয়াছে শুধুই তাই।

এ কয়দিন তাহারই সুমুখে বসিয়া নীলাম্বরকে আহার করিতে হইত; সেদিন মাঝে মাঝে সে পুঁটিকে ডাকিয়া ছোটবৌকে ডাকিয়া বকিতে লাগিল। তারপর ভোরবেলায় সমস্ত ডাকাডাকি দমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল, আর সে চাহিল না, আর সে কথা কহিল না, স্বামীর দেহে মাথা রাখিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনীর সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল।

নব-বিধান

নব-বিধান

১

এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ঘোষাল পত্নীবিয়োগান্তে পুনশ্চ সংসার পাতিবার সূচনাতেই যদি না বন্ধু-মহলে একটু বিশেষ রকমের চক্ষু-লজ্জায় পড়িয়া যাইতেন ত এই ছোট গল্পের রূপ এবং রঙ বদলাইয়া যে কোথায় কি দাঁড়াইত, তাহা আন্দাজ করাও শক্ত। সুতরাং ভূমিকায় সেই বিবরণটুকু বলা আবশ্যক।

শৈলেশ্বর কলিকাতার একটা নামজাদা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক—বিলাতি ডিগ্রী আছে। বেতন আট শত। বয়স বত্রিশ। মাস-পাঁচেক পূর্ব্বে বছর-নয়েকের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুরুষানুক্রমে কলিকাতার পটলডাঙায় বাস। বাড়ির মধ্যে ওই ছেলেটি ছাড়া, বেহারা-বাবুর্চ্চি, সহিস-কোচম্যান প্রভৃতিতে প্রায় সাত-আটজন চাকর। ধরিতে গেলে সংসারটা এরকম এইসব চাকরদের লইয়াই।

প্রথমে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছাই ছিল না। ইহা স্বাভাবিক। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও নূতনত্ব নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভবানীপুরের ভূপেন বাঁড়ুজ্যের মেজ মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে এবং সে দেখিতে ভাল। এরূপ কৌতূহলও সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন, তথাপি সেদিন সন্ধ্যাকালে শৈলেশ্বরেরই বৈঠকখানায় চায়ের বৈঠকে এই আলোচনাই উঠিয়া পড়িল। তাহার বন্ধু-সমাজের ঠিক ভিতরের না হইয়াও একজন অল্প-বেতনের ইস্কুল-পণ্ডিত ছিল। চা-রসের পিপাসাটা তাহার কোন বড় বেতনের প্রফেসারের চেয়েই ন্যূন ছিল না। পাগলাটে গোছের বলিয়া প্রফেসাররা তাহাকে দিগ্‌গজ বলিয়া ডাকিতেন। সে হিসাব করিয়াও কথা বলিত না, তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিত না। দিগ্‌গজ নিজে ইংরাজী জানিত না, মেয়েমানুষে একজামিন পাশ করিয়াছে শুনিলে রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। ভূপেনবাবুর কন্যার প্রসঙ্গে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে খেলেন, আবার বিয়ে! সংসার করতেই যদি হয় ত উমেশ ভট্‌চায্যির মেয়ে দোষটা করলে কি শুনি? ঘর করতে হয় ত তাকে নিয়ে ঘর করুন।

ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু জানিতেন না, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দিগ্‌গজ কহিল, সে বেচারার দিকে ভগবান যদি মুখ তুলে চাইলেন ত তাকেই বাড়িতে আনুন —আবার একটা বিয়ে করবেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ! পাশ হয়ে ত সব হবে! রাগে তাহার দুই চক্ষু রাঙা হইয়া উঠিল। শৈলেশ্বর নিজেও কোনমতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, আরে, সে যে পাগল দিগ্‌গজ।

কেহ কাহাকেও পাগল বলিলে দিগ্‌গজের আর হুঁস থাকিত না, সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল সব্বাই? আমাকেও লোকে পাগল বলে—তাই বলে আমি পাগল!

সকলেই উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা চাপা পড়িল না। হাসি থামিলে শৈলেশ লজ্জিতমুখে ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিল, আমার জীবনে সে একটা অত্যন্ত unfortunate ব্যাপার। বিলাতে যাবার আগেই আমার বিয়ে হয়, কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে বাবার কি একটা নিয়ে ভয়ানক বিবাদ হয়ে যায়। তা ছাড়া মাথা খারাপ বলে বাবা তাঁকে বাড়িতে রাখতেও পারেননি। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে আমি আর দেখিনি। এই বলিয়া শৈলেশ জোর করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিল, ওহে দিগ্‌গজ। বুদ্ধিমান! তা না হলে কি তাঁরা একবার পাঠাবার চেষ্টাও করতেন না? চায়ের মজলিসে গরহাজির ত কখনো দেখলুম না; কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এলে আশা আর কোরো না। গঙ্গাজল আর গোবর ছড়ার সঙ্গে তোমাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে তবে ছাড়বেন, এ নোটিশ তোমাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখলুম।

দিগ্‌গজ জোর করিয়া বলিল, কখ্‌খনো না।

কিন্তু এ কথায় আর কেহ যোগ দিলেন না। ইহার পরে সাধারণ গোছের দুই-চারিটি কথাবার্ত্তার পরে রাত্রি হইতেছে বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রায় এমনি সময়েই প্রত্যহ সভা ভঙ্গ হয়, হইলও তাই। কিন্তু আজ কেমন একটা বিষণ্ণ ম্লান ছায়া সকলের মুখের পরেই চাপিয়া রহিল—সে যেন আজ আর ঘুচিতে চাহিল না।

২

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না, বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কার করিয়া গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না, অপরদিকে তেমনি লজ্জারও অবধি রহিল না। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠার বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী উষার বয়স তখন মাত্র এগার। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালীপদবাবু অল্পমূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনোমালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে একপ্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেন না। ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন; অযাচিত, কোনমতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, বাড়ি গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর-চারেক পরে যখন যথার্থ-ই বাড়ি ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতির দুই-ই বদলাইয়া গেছে। অতএব আর-একজন বিলাতফেরতের বিলাতি আদব-কায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে, শৈলেশের পিতা কালীপদবাবুও মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালঙ্কারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এতকালের মধ্যে ও-বাড়ির কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপ, তপ, পূজা-অর্চ্চনা, গঙ্গাজল ও গোবর লইয়া কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগলামিতে ভায়েরা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার শ্রুতিসুখকর নহে, কেবল একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয় না। দিলে শৈলেশের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্নামের আভাসমাত্রও কোন সূত্রে আজও তাহাকে শুনিতে হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল; ভূপেনবাবুর শিক্ষিতা কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ

না করিলেই নয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে আনিয়া একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি গৃহিণীপনার ভার দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। বিশেষতঃ সোমেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপ বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ি শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিস্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু ইহা ত চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। লোকটাকে অনেকদিন সে অনেক চা ও বিস্কুট খাওয়াইয়াছে, সে এমনি করিয়া তাহার শোধ দিল।

শৈলেশ আসলে লোক মন্দ ছিল না, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ। তাই সত্যকার লজ্জার চেয়ে চক্ষুলজ্জাই তাহার প্রবল ছিল। বিদ্যাভিমানের সঙ্গে আর একটা বড় অভিমান তাহার এই ছিল যে, জ্ঞানতঃ কাহারও প্রতি লেশমাত্র অন্যায় বা অবিচার করিতে পারে না। বন্ধুরাও মুখে না বলিলেও মনে মনে যে তাহাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপরাধী করিয়া রাখিবে, ইহা বুঝিতে বাকী ছিল না —এই অখ্যাতি সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সারারাত্রি চিন্তা করিয়া ভোর নাগাদ তাহার মাথায় সহসা অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির উদয় হইল। তাহাকে আনিতে পাঠাইলে ত সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমতঃ সে আসিবে না। যদি বা আসে ম্লেচ্ছর সংসার হইতে সে দুদিনেই আপনি পলাইবে। তখন কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। এই দু-পাঁচ দিন সোমেনকে তাহার পিসীর বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অন্যত্র কোথাও গা-ঢাকা দিয়া থাকিলেই হইল। এত সোজা কথা কেন যে তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই ত ঠিক!

কলেজ হইতে সে সাতদিনের ছুটি লইল। এলাহাবাদে একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজের যাওয়ার কথা তাঁহাকে তার করিয়া দিল এবং বিভাকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, সে নন্দীপুর হইতে ঊষাকে আনিতে পাঠাইতেছে, যদি আসে ত সে যেন আসিয়া সোমেনকে শ্যামবাজারে লইয়া যায়। এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে তাহার দিন-সাতেক বিলম্ব হইবে।

শৈলেশের এক অনুগত মামাত ভাই ছিল, সে মেসে থাকিয়া সদাগরী অফিসে চাকরি করিত। তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, ভুতো, তোকে কাল একবার নন্দীপুরে গিয়ে তোর বৌদিকে আনতে হবে।

ভূতনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, বৌদিটা আবার কে?

তুই ত বরযাত্রী গিয়েছিলি, তোর মনে নেই? উমেশ ভট্টাচার্য্যির বাড়ি?

মনে খুব আছে, কিন্তু কেউ কারুকে চিনিনে, তিনি আসবেন কেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ কহিল, না আসে নেই—নেই। তোর কি? সঙ্গে বেহারা আর ঝি যাবে। আসবে না বললেই ফিরে আসবি।

ভুতো আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা যাব। কিন্তু মারধোর না করে।

শৈলেশ তাহার হাতে খরচপত্র এবং একটা চাবি দিয়া কহিল, আজ রাত্রের ট্রেনে এলাহাবাদে যাচ্ছি। সাতদিন পরে ফিরব। যদি আসে এই চাবিটা দিয়ে ওই আলমারিটা দেখিয়ে দিবি। সংসার-খরচের টাকা রইল। পুরো একমাস চলা চাই।

ভূতনাথ রাজী হইয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন মেজদা? খাল খুঁড়ে কুমীর আনচ না ত?

শৈলেশ চিন্তিতমুখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আসবেনা নিশ্চয়। কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা কিছু করা চাই ত। শ্যামবাজারে একটা খবর দিস্। সোমেনকে যেন নিয়ে যায়।

রাত্রের পাঞ্জাব মেলে শৈলেশর এলাহাবাদ চলিয়া গেল।

৩

দিনকয়েক পরে একদিন দুপুরবেলা বাটীর দরজায় আসিয়া একখানা মোটর থামিল এবং মিনিট-দুই পরেই একটি বাইশ-তেইশ বছরের মহিলা প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের কার্পেটে বসিয়া সোমেন্দ্র একখানা মস্ত বাঁধানো এ্যাল্‌বাম হইতে তাহার নূতন মাকে ছবি দেখাইতেছিল; সেই ই মহা আনন্দে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, মা, পিসীমা।

ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরনে নিতান্ত সাদা-সিধা একখানা রাঙা-পেড়ে শাড়ি, হাতে এবং গলায় সামান্য দুই-একখানা গহনা, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক্ হইল।

প্রথমে উষাই কথা কহিল। একটু হাসিয়া ছেলেকে বলিল, পিসীমাকে প্রণাম করলে না বাবা?

সোমেনের এ শিক্ষা বোধ করি নূতন, সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসীমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল। উষা কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঠাকুরঝি, ব'সো?

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে এলেন?

উষা বলিল, সোমবারে এসেচি, আজ বুধবার—তাহলে তিন দিন হ'ল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে হবে কেন ভাই ব'সো।

বিভা ভাব করিতে আসে নাই, বাড়ি হইতেই মনটাকে সে তিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, কহিল, বসবার সময় নেই আমার—ঢের কাজ। সোমেনকে আমি নিতে এসেচি।

কিন্তু এই রুক্ষতার জবাব উষা হাসিমুখে দিল। কহিল, আমি একলা কি করে থাকব ভাই? সেখানে বৌয়েদের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ। কেউ একজন কাছে না থাকলে ত আমি বাঁচিনে ঠাকুরঝি। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিল।

এই হাসির উত্তর বিভা কটুকণ্ঠেই দিল। ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বাবা বলেচেন আমার ওখানে গিয়ে থাকতে। আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই সোমেন—যাও ত শীগ্‌গির কাপড় পরে নাও; আমাকে আবার একবার নিউ মার্কেট ঘুরে যেতে হবে।

দুজনের মাঝখানে পড়িয়া সে যেন ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, মা যে যেতে বারণ করচেন পিসীমা? তাহার বিপদ দেখিয়া উষা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমাকে যেতে আমি বারণ করচি নে বাবা, আমি শুধু এই বলচি যে, তুমি চলে গেলে একলা বাড়িতে আমার বড় কষ্ট হবে।

ছেলেটি মুখে ইহার জবাব কিছু দিল না, কেবল অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বিমাতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুলের মধ্য দিয়া আঙুল বুলাইতে বুলাইতে উষা হাসিয়া কহিল, ও যেতে চায় না ঠাকুরঝি।

লজ্জায় ও ক্রোধে বিভার মুখ কালো হইয়া উঠিল, এবং অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস, আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো।

উষার ঠোঁটের কোণ দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, আমরা বুড়োমানুষেই নিজের উচিত ঠিক করে উঠতে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ! ও বোঝেই বা কতটুকু। আর

অন্যায় প্রশ্রয়ের কথা যদি তুললে ঠাকুরঝি, আমি অনেক ছেলে মানুষ করেচি, এ সব আমি সামলাতে জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বিভা কঠোর হইয়া কহিল, দাদাকে তা হলে চিঠি লিখে দেব?

উষা কহিল, দিয়ো। লিখে দিয়ো যে, তাঁর এলাহাবাদের হুকুমের চেয়ে আমার কলকাতার হুকুমটাই আমি বড় মনে করি। কিন্তু দেখ ভাই বিভা, আমি তোমার সম্পর্কে এবং বয়সে দুই-ই বড়। এই নিয়ে আমার উপরে তুমি অভিমান করতে পাবে না। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কহিল, আজ তুমি রাগ করে একবার বসলে না পর্য্যন্ত, কিন্তু আর একদিন তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৌদিদির কাছে এসে বসবে, এ কথাও আজ তোমাকে বলে রাখলুম।

বিভা এ কথার কোন উত্তর দিল না, কহিল, আজ আমার সময় নেই—নমস্কার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গাড়িতে বসিয়া হঠাৎ সে উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, বারন্দার রেলিঙ ধরিয়া উষা সোমেনকে লইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৪

সাত দিনের ছুটি, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ-দুই এলাহাবাদে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা শৈলেশ্বর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখের নীচে বারান্দায় বসিয়া সোমেন কতকগুলা কাঠি, রঙ-বেরঙের কাগজ, আঠা, দড়ি ইত্যাদি লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল, পিতার আগমন প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু দেখিবামাত্রই সংবর্দ্ধনা করিল, এবং লজ্জিত আড়ষ্টভাবে পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করার ব্যাপারে এখনও সে পটুত্ব লাভ করে নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। খুব মন্দ না লাগিলেও শৈলেশ বিস্মিত হইল। কিন্তু ঐ কাগজ-কাঠি-আঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, ও-সব তোমার কি হচ্চে সোমেন?

সোমেন রহস্যটা এক কথায় ফাঁস করিল না, বলিল, তুমি বল ত বাবা, ও কি?

বাবা বলিলেন, আমি কি করে জানব?

ছেলে হাততালি দিয়া মহা আনন্দে কহিল, আকাশ-প্রদীপ।

আকাশ-প্রদীপ! আকাশ-প্রদীপে কি হবে?

ইহার অদ্ভুত বিবরণ সোমেন আজ সকালেই শিখিয়াছে, কহিল, আজ সংক্রান্তি, কাল সন্ধ্যাবেলায় উই উঁচুতে বাঁশ বেঁধে টাঙাতে হবে বাবা। মা বলেন, আমার ঠাকুরদাদারা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁদের আলো দেখাতে হয়। তাঁরা আশীর্ব্বাদ করেন।

শৈলেশের মেজাজ গরম হইয়াই ছিল, টান মারিয়া পা দিয়া সমস্ত ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করেন। যত সমস্ত কুসংস্কার যা পড়গে যা বলছি।

তাহার এত সাধের আকাশ-প্রদীপ ছত্রাকার হইয়া পড়ায় সোমেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। উপরে কোথা হইতে মিষ্ট-কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবা সোমেন, কাল বাজার থেকে আমি আরও ভাল একটা আকাশ-প্রদীপ তোমাকে কিনে আনিয়ে দেব, তুমি আমার কাছে এস।

সোমেন চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেশ কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীর বিরক্তমুখে তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই ছোট্ট ঘণ্টার শব্দ হইল—টুন্ টুন্ টুন্ টুন্, কেহ সাড়া দিল না।

আবদুল!

আবদুল আসিল না।

গিরিধারী? গিরিধারী?

গিরিধারীর পরিবর্ত্তে বাঙালী চাকর গোকুল গিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, আজ্ঞে –

শৈলেশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিল, আজ্ঞে? ব্যাটারা মরেছিস্?

গোকুল বলিল, আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না? আবদুল কই?

গোকুল কহিল, মা তাকে ছুটি দিয়েছেন, সে বাড়ি গেছে।

ছুটি দিয়েছেন! বাড়ি গেছে! গিরিধারী কোথা গেল?

গোকুল জানাইল, সেও ছুটি পাইয়া দেশে চলিয়া গেছে।

শৈলেশ স্তম্ভিত হইয়া কহিল, বাড়িতে কি লোকজন কেউ আর নেই না কি?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে আর সবাই আছে।

তাই যা আছে কেন? যা দূর হ—

শৈলেশ্বর নিজেই তখন জুতা খুলিল, কোট খুলিয়া টেবিলের উপরেই জড় করিয়া

রাখিল ; আল্‌না হইতে কাপড় লইয়া ট্রাউজার খুলিয়া দূরের একটা চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে সেটা নীচে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল ; নেকটাই, কলার প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া নিজের চৌকিতে গিয়া বসিতেই ঠিক সম্মুখে টেবিলের উপর ছোট্ট একটি খাতা তাহার চোখে পড়িল—মলাটে লেখা,সংসার-খরচের হিসাব। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। দৈনিক খরচের অঙ্ক—মাছ এত, শাক এত, চাল এত ডাল এত,—হঠাৎ দ্বারের পর্দা সরানর শব্দে চকিত হইয়া দেখিল, কে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে। সে আর যেই হউক দাসী নয়, তাহা চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শৈলেশ হিসাবের খাতার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। যে আসিল সে তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কি এত বেলায় আবার চা খাবে না কি ? কিন্তু তা হলে আর ভাত খেতে পারবে না।

ভাত খাব না।

না খাও, হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে চল। অবেলায় স্নান করে আর কাজ নেই, কিন্তু জলখাবার ঠিক করে আমি কুমুদাকে সরবৎ তৈরি করতে বলে এসেচি। চল।

এখন থাক।

ওগো আমি ঊষা—বাঘ-ভাল্লুক নই। আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে কেউ তোমাকে ছি-ছি করবে না।

শৈলেশ কহিল, আমি কি বলেচি তুমি বাঘ-ভাল্লুক ?

তবে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন ?

আমার কাজ ছিল। তুমি বিভার সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন ?

ঊষা কহিল, ও তোমার বানানো কথা, তোমাকে সে কখ্‌খনো লেখেনি আমি ঝগড়া করেচি।

শৈলেশ কহিল, তুমি আবদুলকে তাড়িয়েচ কেন ?

কে বলেচে তাড়িয়েচি ? সে এক বছরের মাইনে পায়নি, বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করছিল ; আমি মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েচি।

শৈলেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, সমস্ত চুকিয়ে দিয়েচ ? তা হলে সে আর আসবে না। গিরিধারী গেল কেন ?

ঊষা কহিল, এ ত তোমার ভারি অন্যায়। চাকর-বাকরদের মাইনে না দিয়ে আটকে রাখা কেন, তাদের কি বাড়ি-ঘর-দোর নেই না কি ? আমি তাকে মাইনে দিয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

শৈলেশ কহিল, বেশ করেচ। এইবার বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম বানিয়ে

তোলো। সে হিসাবের পাতার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিতেছিল, হঠাৎ একটা বড় অঙ্ক তাহার চোখে পড়িতেই, চমকিয়া কহিল, এটা কি? চারশ-ছ টাকা—

উষা উত্তর দিল, ও টাকাটা মুদির দোকানে দিয়েচি। এখনো বোধ করি শ-দুই আন্দাজ বাকী রইল, বলেচি আসচে মাসে দিয়ে দেব।

শৈলেশ অবাক্ হইয়া বলিল, ছ-শ টাকা মুদির দোকানে বাকী?

উষা হাসিয়া কহিল, হবে না? কখনো শোধ করবে না, কখনো হিসেব দেখতে চাইবে না—কাজেই দু'বছর ধরে এই টাকাটা জমিয়ে তুলেচ।

শৈলেশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, তুমি কি এই দু'বছরের হিসেব দেখলে নাকি।

উষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নইলে আর উপায় ছিল কি?

শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপরে যে লজ্জার ছায়া পড়িতেছে, এ কথা এই পাঁচ মিনিটের পরিচয়েও উষার চিনিতে বাকী রহিল না; জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ বল ত?

শৈলেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাবচি টাকা যা ছিল, সব ত খরচ করে ফেললে, কিন্তু মাইনে পেতে পনর-যোল দিন বাকী।

উষা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কি ছেলেমানুষ যে, সে হিসেব নেই? পনর দিন কেন, এক মাসের আগেও আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসব না। কিন্তু কি কাণ্ড করে রেখেচ বল ত? গোয়ালা বলছিল, তার প্রায় দেড়শ টাকা পাওনা। ধোপা পাবে পঞ্চাশ টাকার ওপর, আর দর্জ্জির দোকানে যে কত পড়ে আছে, সে শুধু তারাই জানে। আজ হিসেব পাঠাতে বলে পাঠিয়েছি।

শৈলেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, করেচ কি? তারা হয়ত হাজার টাকাই পাওনা বলবে -কিন্তু দেবে কোথা থেকে?

উষা নিশ্চিন্তমুখে কহিল, একেবারেই দিতে পারব তা ত বলিনি, আমি তিন-চার মাসে শোধ করব। আর কারও কাছে ত কিছু ধার করে রাখোনি? আমাকে লুকিয়ো না।

শৈলেশ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমলা যেতে একজনের কাছে হ্যাণ্ডনোটে দু-হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, একটা টাকা সুদ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি।

উষা গালে হাত দিয়া বলিল, অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমিও দেখচি এক বছরের আগে আর আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেবে না। কিন্তু আর কিছু নেই ত?

শৈলেশ বলিল, বোধ হয় না। সামান্য কিছু থাকতেও পারে, কিন্তু আমি ত ভেবেচি, এ জন্মে ও আর শোধ দিতে পারব না।

উষা কহিল, তুমি কি সত্যিই কখনো ভাবো?

শৈলেশ বলিল, ভাবিনে? কতদিন অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে যেন দম আটকে এসেচে। মাইনেতে কুলোয় না, প্রতি মাসেই টানাটানি হয়, কিন্তু আমাকে তুমি ভুলিয়ো না। যথার্থ-ই কি আশা কর শোধ করতে পারবে?

উষার চোখের কোণ সহসা সজল হইয়া আসিল। যে স্বামীকে সে মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও চিনিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহারই জন্য হৃদয়ে সত্যকার বেদনা অনুভব করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, তুমি বেশ মানুষ ত! সংসার করতে ধার হয়েচে, শোধ দিতে হবে না? কিন্তু এই ক-টা টাকা দিয়ে ফেলতে আমার ক-দিন লাগবে!

সকলের বড় কষ্ট হবে—

উষা জোর দিয়া বলিল, কারও না। তোমরা হয়ত টেরও পাবে না কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েচে।

শৈলেশ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, অনেক দিনের মেঘলা আকাশের কোন একটা ধার দিয়ে যেন তাহার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

৫

খাম ও পোস্টকার্ডে বিস্তর চিঠিপত্র জমা হইয়াছিল, সেই সমস্ত পড়িয়া জবাব দিতে, সাময়িক কাগজগুলি একে একে খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে, আরও এমনি সব ছোট-খাটো কাজ শেষ করিতে শৈলেশের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাহার কর্ম্ম-নিরত একাগ্র মুখের চেহারা বাহির হইতে পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিলে এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও একান্ত মনঃসংযোগের প্রতি আনাড়ী লোকের মনের মধ্যে অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মাই-বারই কথা। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা এই গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয়

নয়, এক্ষেত্রে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, অধ্যাপক বলিয়াই যে, সংসারে ছলনা করার কাজে হঠাৎ কেহ তাঁহাদিগকে হঠাইয়া দিবে এ আশা দুরাশা। হাতের কাজ সমাপ্ত করিয়া শৈলেশ্বর নিজেই সুইচ টিপিয়া লইয়া আলো জ্বালাইয়া মস্ত মোটা একটা দর্শনের বই লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। যেন তাহার নষ্ট করিবার মুহূর্ত্তের অবসর নাই, অথচ সন্ধ্যার পরে এরূপ কুকর্ম্ম করিতে পূর্ব্বে তাহাকে কোনদিন দেখা যাইত না।

এইরূপে যখন সে অধ্যয়নে নিমগ্ন, বাহিরে পর্দ্দার আড়াল হইতে কুমুদা ডাকিয়া কহিল, বাবু, মা বলে দিলেন আপনার খাবার দেওয়া হয়েচে, আসুন।

শৈলেশ ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ ত আমার খাবার সময় নয়! এখনো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি।

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে তুলে রাখতে বলে দেব?

শৈলেশ কহিল, তুলে রাখাই উচিত। আবদুল না থাকাতেই এই সময়ের গোল-যোগ ঘটেচে।

দাসী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া বলিল, সমস্ত তোলা-তুলি করাও হাঙ্গামা, আচ্ছা, বল গে আমি যাচ্চি।

আজ খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত নয়, উপরে আসিয়া দেখিল, তাহার শোবার ঘরের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় আসন পাতিয়া অত্যন্ত স্বদেশী প্রথায় স্বদেশী আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, সাবেক দিনের রেকাবি গেলাস বাটি প্রভৃতি মাজা-ধোয়া হইয়া বাহির হইয়াছে -থালার তিন দিক ঘেরিয়া এই সকল পাত্রে নানাবিধ আহার্য থরে থরে সজ্জিত, অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ঊষা, এবং তাহাকে ঘেঁষিয়া বসিয়াছে সোমেন।

শৈলেশ আসনে বসিয়া কহিল, তোমাকে ত সঙ্গে খেতে নেই আমি জানি. কিন্তু সোমেন? তাকেও খেতে নেই নাকি?

ইহার উত্তর ছেলেই দিল, আমি রোজ মার সঙ্গে খাই বাবা।

শৈলেশ আয়োজনের প্রাচুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এত সব রাঁধল কে? তুমি নাকি?

ঊষা কহিল, হাঁ।

শৈলেশ কহিল, বামুনটাও নেই বোধ হয়। যতদূর মনে আছে তার মাইনে বাকী ছিল না—তাকে কি তা হলে এক বছরের আগাম দিয়েই বিদায় করলে?

ঊষা মুখের হাসি গোপন করিয়া কহিল, দরকার হলে আগাম মাইনেও চাকরদের দিতে হয়, কেবল বাকী রাখলেই চলে না। কিন্তু সে আছে, তাকে ডেকে দেব নাকি?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, থাক্। তাকে দেখবার জন্যে আমি ঠিক উতলা হয়ে উঠিনি, তাকেও মাঝে মাঝে রাঁধতে দিও, নইলে যা কিছু শিখেছিল ভুলে গেলে বেচারার ক্ষতি হবে।

আহার করিতে বসিয়া শৈলেশের কত যে ভাল লাগিল তাহা সেই জানে। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন—হঠাৎ সেই দিনের কথা মনে পড়িল। পাশের বাটিটা টানিয়া লইয়া কহিল, দিব্যি গন্ধ বেরিয়েছে। গোঁসাইরা মাংস খায় না, তারা কাঁঠালের তরকারিতে গরম মসলা দিয়ে গাছ-পাঁঠা বলে খায়। আমার রুচিটা ঠিক অতখানি উচ্চজাতীয় নয়। তাই কাঁঠাল বরঞ্চ আমার সইবে, কিন্তু গাছ-পাঁঠা সইবে না।

উষা খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন হাসির হেতু বুঝিল না, কিন্তু সে মায়ের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গাছ-পাঁঠা কি মা?

প্রত্যুত্তরে উষা ছেলেকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীকে শুধু কহিল, আগে খেয়েই দেখ।

শৈলেশ একটুকরা মাংস মুখে পুরিয়া দিয়া কহিল, না, চারপেয়ে পাঁঠাই বটে, চমৎকার হয়েছে; কিন্তু এ রান্না তুমি শিখলে কি করে?

উষার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, রান্না কি শুধু তোমার আবদুলই জানে? আমার বাবা ছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েত, তুমি কি ভেবেচ আমি গোঁসাই-বাড়ি থেকে আসচি!

শৈলেশ কহিল, এই একবাটি খাবার পরে সে কথা মুখে আনে কার সাধ্য! কিন্তু আমার ত সিদ্ধেশ্বরী নেই, এ কি প্রতিদিন জুটবে?

উষা বলিল, কিসের অভাবে জুটবে না শুনি?

শৈলেশ কহিল, আবদুলের শোক ত আমি আজই ভোলবার জো করেচি, দেনা—

উষা রাগ করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে বলেচি যে, স্বামী-পুত্রকে না খেতে দিয়ে আমি দেনা শোধ করব? দেনার কথা তুমি আর মুখেও আনতে পারবে না বলে দিচ্চি?

শৈলেশ কহিল, তোমাকে বলে দিতে হবে না, দেনার কথা মুখে আনা আমার স্বভাবই নয়। কিন্তু—

উষা বলিল, এতে কোন কিন্তু নেই। খাবার জন্যে ত দেনা হয়নি।

কিসের জন্যে যে হ'লো কিছুই ত জানিনে উষা—

উষা জবাব দিল, তোমার জেনেও কোন দিন কাজ নেই।

দয়া করে এইটি শুধু ক'রো, পাগল বলে আবার যেন নির্ব্বাসনে পাঠিয়ো না।

শৈলেশ নিঃশব্দে নতমুখে আহার করিতে লাগিল। সোমেন কহিল, খাবে চল মা। কালকের সেই জটাই পক্ষীর গল্পটা কিন্তু আজ শেষ করতে হবে। জটাইয়ের ছেলে তখন কি করল মা?

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, জটাইয়ের ছেলে যাই করুক, এ ছেলেটি ত দেখচি তোমাকে একেবারে পেয়ে বসেচে।

ঊষা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিল, এর কারণ কি জান?

ঊষা কহিল, কারণ আর কি। মা নেই, ছেলেমানুষ একলা বাড়িতে—

তা বটে, কিন্তু মা থাকলেও এত আদর বোধ হয় ও কখনো পায়নি।

ঊষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার এক কথা। আর একটু মাংস আনতে বলে দি? আচ্ছা, না খাও—আমার মাথা খাও, মেঠাই দুটো ফেলে উঠো না কিন্তু! সমস্ত দিন পরে খেতে বসেচ, এ কথা একটু হিসেব কর।

শৈলেশ হাঁ করিয়া ঊষার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। খাবার জন্য এই পীড়াপীড়ি, এমনি করিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল মাথার দিব্যি দেওয়া—যেন বহুকালের পরে ছেলেবেলায় শোনা গানের একটা শেষ চরণের মত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে নিজেও তাহার মায়ের এক ছেলে -অকস্মাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে যেন তাহার ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিল। মেঠাই ফেলিয়া উঠিবার তাহার শক্তিই রহিল না। ভাঙিয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কোন দিকের কোন হিসাবই আর আমি করব না ঊষা, এ ভারটা তোমাকে একেবারে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

৬

একটি সপ্তাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া আবার রবিবার ফিরিয়া আসিল, শৈলেশ ঠাহর পাইল না। সকালে উঠিয়াই উষা কহিল, তোমাকে রোজ বলচি কথা শুনচো না— যাও আজ ঠাকুরঝির ওখানে। সে কি মনে করচে বল ত? তুমি কি আমার সঙ্গে তার সত্যিই ঝগড়া করিয়ে দেবে না কি?

শৈলেশ মনে মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিল, কলেজের যে রকম কাজ পড়েচে—

উষা বলিল, তা আমি জানি। কলেজ থেকে ফেরবার মুখেও তাই একবার গিয়ে উঠতে পারলে না!

কিন্তু কি রকম ক্লান্ত হয়ে ফিরতে হয়, সে ত জান না? তোমাকে ত আর ছেলে পড়াতে হয় না।

উষা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবার যাও। রবিবারেও ছেলে-পড়ানোর ছল করলে বিভা জন্মে আর মুখ দেখবে না। এই বলিয়া সে সহিসকে ডাকাইয়া আনিয়া গাড়ি তৈরি করিবার হুকুম দিয়া কহিল, বাবুকে শ্যামবাজারে পৌঁছে দিয়েই তোরা ফিরে আসিস। গাড়িতে আমার কাজ আছে।

যাবার সময় শৈলেশ ছেলেকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে সে বিমাতার গায়ে ঠেস্ দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমার কাছে যাইতে সে কোনদিনই উৎসাহ বোধ করিত না, বিশেষতঃ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ভয়ের অবধি রইল না। উষা ক্রোড়ের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, সোমেন থাক্, ও না হয় আর-একদিন যাবে।

শৈলেশ কহিল, বিভার ওখানে ও যে যেতে চায় না, সে দেখচি তুমি টের পেয়েচ।

তোমাকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করচি, এই বলিয়া সে হাসিমুখে ছেলেকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া শ্যামবাজার হইতে বাড়ি ফিরিতে শৈলেশের বেলা প্রায় আড়াইটা হইয়া গেল। বিভা, ভগিনীপতি ক্ষেত্রমোহন এবং তাহার সতর-আঠার বছরের একটি অনূঢ়া ভগিনীও সঙ্গে আসিলেন। বিভাকে সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা শৈলেশের ছিল না। সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই আসিল। উষার বিরুদ্ধে তাহার অভি-যোগ বহুবিধ। কেবলমাত্র দাদাকেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনাইয়া তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ হয় নাই; এখানে উপস্থিত হইয়া এতগুলি লোকের সমক্ষে নানাপ্রকার তর্কবিতর্কের মধ্যে ফেলিয়া পল্লীগ্রামের কুশিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূকে সে একেবারে অপদস্থ করিয়া দিবে এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। দাদার সহিত আজ দেখা হওয়া পর্য্যন্তই

সে অনেক অপ্রিয় কঠিন অনুযোগের সহিত এই কথাটাই বারংবার সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, এতকাল পরে এই স্ত্রীলোকটিকে আবার ঘরে ডাকিয়া আনায় শুধু যে মারাত্মক ভুল হইয়াছে, তাহাই নয়, তাহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতিও প্রকারান্তরে অবমাননা করা হইয়াছে। তিনি যাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা কিসের জন্য ? সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করা যাইবে না, কোথাও কোন সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাহাকে চলিবে না, এমন কি বড় ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেই যাহাকে লজ্জাবোধ হইবে, তাহাকে লইয়া লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া ?

অপরিচিত উষার পক্ষ লইয়া ক্ষেত্রমোহন দুই-একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই স্ত্রীর কাছে ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। বিভা রাগ করিয়া বলিল, দাদা মনে করেন আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু আমি সব খবর রাখি। বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই এতকালের খানসামা আবদুলকে তাড়ালেন মুসলমান ব'লে, গিরিধারীকে দূর করলেন ছোটজাত ব'লে। এত যাঁর জাতের বিচার তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই ত আমাদের দায়। আমি ত এমন বৌকে একটা দিনও স্বীকার করতে পারব না, তা যিনিই কেন না যত রাগ করুন।

এ কটাক্ষ যে কাহাকে হইল, তাহা সকলেই বুঝিলেন। শৈলেশ আস্তে আস্তে বলিতে গেল যে, ঠিক সে কারণে নয়, তাহারা নিজেরাই বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই কথায় বিভা দাদার মুখের উপরেই জবাব দিল যে, বৌদিদির আমলে তাহাদের এতখানি ব্যগ্রতা দেখা যায় নাই, কেবল ইনি ঘরে পা দিতে-না-দিতেই তাহারা পলাইয়া বাঁচিল।

এই শ্লেষের আর উত্তর কি ? শৈলেশ মৌন হইয়া রহিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, চাকর-বাকর ত সব পালিয়েছে, তোমরা এখন চলে কি করে ?

শৈলেশ নিস্পৃহ-কণ্ঠে কহিল, এমনি একরকম যাচ্ছে চলে।

বিভা কহিল, যারা গেছে তারা আর আসবে না, আমি বেশ জানি। কিন্তু বাড়ি ত একেবারে ভাইচাষ্যি-বাড়ি করে রাখলে চলবে না, সমাজ আছে। লোকজন আবার দেখে শুনে রাখো—মানুষে বলবে কি ?

শৈলেশ কহিল, না চললে রাখতে হবে বৈকি।

বিভা বলিল, কি করে যে চলচে সে তোমরাই জানো, আমরা ত ভেবে পাইনে। এই বলিয়া সে কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বাপের বাড়ি না ফিরেও পারিনে, কিন্তু গেলে বোধ করি এক পেয়ালা চাও জুটবে না।

ক্ষেত্রমোহন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই ছিলেন, ভাইবোনের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে কথা কহিতে চাহেন নাই, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আগে গিয়েই ত দেখ, চা যদি না পাও তখন না হয় ব'লো।

বিভা কহিল, আমার দেখাই আছে। প্রথম দিন তাঁর ভাব দেখেই আমি বুঝে এসেচি! এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার অনুযোগ যে একেবারেই সত্য নয়, বস্তুতঃ সেদিন কিছুই দেখিয়া আসিবার মত তাহার সময় বা মনের অবস্থা কোনটাই ছিল না, তাহা উভয়ের কেহই জানিতেন না। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাস্তবিক শৈলেশ, ব্যাপার কি তোমাদের? চাকর-বাকর সমস্ত বিদায় করে দিয়ে কি বোষ্টম-বৈরাগী হয়ে থাকবে না কি? আজকাল খাচ্চো কি?

শৈলেশ কহিল, ডাল ভাত লুচি তরকারি—

গলা দিয়ে গলচে ওগুলো?

অন্ততঃ গলায় বাধচে না এ কথা ঠিক।

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিল, ঠিক তা আমিও জানি। এবং আমার যে সত্যি সত্যিই বাধে তাও নয়, কিন্তু মজা এমনি যে, সে কথা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করবার জো নেই। তুমি কি এমনই বরাবর চালিয়ে যাবে স্থির করেচ নাকি?

শৈলেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, দেখ ক্ষেত্র, যথার্থ কথা বলতে কি, স্থির আমি নিজে কিছুই করিনি, করবার ভারও আমার 'পরে তিনি দেননি। শুধু এইটুকু স্থির করে রেখেচি যে, তাঁর অমতে তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থায় আর আমি হাত দিচ্চিনে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাকবে না, তা বলে দিচ্ছি!

শৈলেশ কহিল, এদিকে যদি রক্ষা নাও থাকে অন্য দিকে একটু রক্ষা বোধ হয় পেয়েচি যে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবে না। বল কি হে, অহর্নিশি কেবল টাকার ভাবনা, মাসের পনরটা দিন পার হলেই মনে হয় বাকী পনরটা দিন পার হবে কি করে—সে পথে আর পা বাড়াচ্ছি নে। আমি বেঁচে গেছি ভাই—টাকা ধার করতে আর যেতে হবে না—যে ক'টা টাকা মাইনে পাই, সেই আমার যথেষ্ট, এ সুখবরটা এঁর কাছে আমি পেয়ে গেছি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল কি হে? কিন্তু টাকার দুর্ভাবনা কি একা তোমারই ছিল না কি? আমি যে একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠেচি, সে খবর ত রাখো না।

শৈলেশ বলিতে লাগিল, এলাহাবাদে পালাবার সময় পুরো একটি মাসের মাইনে আলমারিতে রেখে যাই। বলে যাই, একটি মাস পুরো চলা চাই। আগে ত কোন

কালেই চলেনি, সোমেনের মা বেঁচে থাকতেও না, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার নিজের হাতেও না। ভেবেছিলাম এঁর হাত দিয়ে যদি ভয় দেখিয়েও চালাতে পারি ত তাই যথেষ্ট। যাদের তাড়ানো নিয়ে বিভা রাগ করছিল, তাদের মুসলমান এবং ছোটজাত বলেই বাস্তবিক তাড়ানো হয়েছে কি না আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু এটা জানি, যাবার সময়ে তারা এক বছরের বাকী মাইনে নিয়ে খুব সম্ভব খুশী হয়েই দেশে গেছে। মুদির দোকানে চার-শ টাকা দেওয়া হয়েচে, আরও ছোট-খাটো কি কি সাবেক দেনা শোধ করে ছোট্ট একখানি খাতায় কড়ায় গণ্ডায় লেখা—ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ তুমি কি কাণ্ড করে বসে আছো উষা, অর্দ্ধেক মাস যে এখনো বাকী—চলবে কি করে? জবাবে বললেন, আমি ছেলেমানুষ নই, সে জ্ঞান আমার আছে। খাবার কষ্ট ত আজও তাঁর হাতে এক তিল পাইনি ক্ষেত্র, কিন্তু ডাল-ভাতই আমার অমৃত। আমার দর্জ্জি ও কাপড়ের বিল এবং হ্যাণ্ডনোটের দেনাটা শোধ হয়ে যাক ভাই, নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ক্ষেত্রমোহন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মোটর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনজনেই উঠিয়া বসিলেন। সমস্ত পথটা ক্ষেত্রমোহন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কাহারও কোন কথা বোধ করি তাহার কানেই গেল না।

৭

অল্প কিছুক্ষণেই গাড়ি আসিয়া শৈলেশ্বরের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সাক্ষাৎ মিলিল সোমেনের। সে কয়লাভাঙা হাতুড়িটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া চৌকাঠে বসিয়া তাহার রেলগাড়ির চাকা মেরামত করিতেছিল—তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া হঠাৎ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না। তাহার কপালে, গালে, দাড়িতে, বুকে, বাহুতে—অর্থাৎ দেহের সমস্ত উপরার্দ্ধটাই প্রায় চিত্র-বিচিত্র করা। গঙ্গার ঘাটের উড়ে পাণ্ডা সাদা, রাঙা, হলুদ রঙ দিয়া নিজের দেশের জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের রাম-সীতা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার দেব দেবীর অসংখ্য নাম ছাপিয়া দিয়াছে।

বিভা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ দেখিয়েচে বাবা, বেঁচে থেকো!

শৈলেশের এই দুইজনের কাছে যেন মাথা কাটা গেল। স্বভাবতঃ সে মৃদু-প্রকৃতির লোক, যে-কোন কারণেই হউক, হৈ-চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে সে পারিত না, কিন্তু ভগিনীর এই অত্যন্ত কটু উত্তেজনা হঠাৎ তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল। ছেলের গালে সশব্দে একটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগা পাজি! কোথা থেকে এই সমস্ত করে এলি? কোথা গিয়েছিলি?

সোমেন কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, আজ সকালে সে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। শৈলেশ তাহার গলায় একটা ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল গে, যা বলচি!

তিনজনে আসিয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাই-বোন উভয়েরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর; মিনিট-খানেক কেহই কোন কথা কহিল না, শৈলেশের লজ্জিত বিরস মুখে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, এতটা বাড়াবাড়ি সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু বিভা কথা না কহিয়াও যেন সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, এসব তার জানা কথা। এইরূপ হইতেই বাধ্য।

কথা কহিলেন ক্ষেত্রমোহন। তিনি হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, শৈলেশ, তুমি যে একেবারে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে ফেললে হে! ছেলেটাকে মারলে কি বলে! তোমাদের সঙ্গে ত চলা-ফেরা করাই দায়।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিভা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চায়ের পেয়ালায় তুফান কি রকম! তুমি কি এটাকে ছেলে-খেলা মনে করলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, অন্ততঃ ভয়ানক কিছু একটা যে মনে হচ্ছে না তা অস্বীকার করতে পারিনে।

তার মানে?

মানে খুব সহজ। আজ নিশ্চয় কি একটা গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, সোমেন সঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্নান করেছে। একটা দিন কলের জলে না নেয়ে দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত কি মহাপাপ হতে পারে আমি ত ভেবে পাইনে।

বিভা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার পরে?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তার পরের ব্যাপারও খুব স্বাভাবিক। ঘাটে বিস্তর উড়ে পাণ্ডা আছে, হয়ত কেউ ছুটো-একটা পয়সার আশায় ছেলেমানুষের গায়ে চন্দনের ছাপ মেরে দিয়েচে। এতে খুনোখুনি কাণ্ড করবার কি আছে।

বিভা তেমনি ক্রোধের স্বরে প্রশ্ন করিল, এর পরিণাম ভেবে দেখচ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বিকালবেলা মুখহাত ধোয়ার সময় আপনি মুছে যায়—এই পরিণাম।

বিভা কহিল, ওঃ—এই মাত্র! তোমার ছেলে-পুলে থাকলে তুমিও তা হলে এইরকম করতে দিতে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমার ছেলে-পুলে যখন নেই, তখন এ তর্ক বৃথা।

বিভা মনে মনে আহত হইয়া কহিল, তর্ক বৃথা হতে পারে, চন্দন ধুয়ে ফেললে উঠে যায় আমি জানি, কিন্তু এর দাগ হয়ত অত সহজে নাও উঠতে পারে। ছেলে-পুলের ভবিষ্যৎ জীবনের পানে চেয়েই কাজটা করতে হয়। আজকার কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় এ-কথা আমি একশবার বলব, তা তোমরা যাই কেন না বল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তোমরা নয়—একা আমি! শৈলেশ ত চড় মেরে আর গলাধাক্কা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলে—আমি কিন্তু এ আশা করিনি যে, অধ্যাপক-বংশের মেয়ে একদিনেই মেমসাহেব হয়ে উঠবে। তা সে যাই হোক, তোমরা দু-ভাইবোন এর ফলাফল বিচার করতে থাকো, আমি উঠলুম।

শৈলেশ চুপ করিয়াই ছিল, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কোথায় হে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, উপরে। ঠাকরুনের সঙ্গে পরিচয়টা একেবারে সেরে আসি, কথা ক'ন কি না একটু সাধ্যসাধনা করে দেখিগে। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরে গেলেন।

উপরে উঠিয়া শোবার ঘরের দরজা হইতে ডাক দিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন নমস্কার।

ঊষা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন কাছে বসিয়া বোধ করি মায়ের কাজ বাড়াইতেছিল, কহিল, পিসেমশাই।

ঊষা অদূরে একটা চৌকি দেখাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বসুন। তাহার সম্মুখের গোটা-দুই আলমারির কপাট খোলা, মেঝের উপর অসংখ্য রকমের কাপড় জামা শাড়ি জ্যাকেট কোট পেণ্টুলান মোজা টাই কলার—কত যে রাশিকৃত করা তাহার নির্ণয় নাই। ক্ষেত্রমোহন আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনার হচ্ছে কি?

সোমেন স্তূপের মধ্য হইতে একজোড়া মোজা টানিয়া বাহির করিয়া কহিল এই আর একজোড়া বেরিয়েচে। এইটুকু শুধু ছেঁড়া—চেয়ে দেখ মা।

ঊষা ছেলের হাত হইতে লইয়া একস্থানে গুছাইয়া রাখিল। তাহার রাখিবার শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এ কি অনাথ-আশ্রমের ফর্দ তৈরি হচ্ছে, না জঞ্জাল পরিষ্কারের চেষ্টা হচ্ছে? কি করচেন বলুন ত? তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, পল্লী অঞ্চলের নূতন বধূ তাঁহাকে দেখিয়া হয়ত লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে, কিন্তু ঊষার আচরণে সেরূপ কিছু প্রকাশ পাইল

না। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না বটে, কিন্তু কথার জবাব সহজকণ্ঠেই দিল; কহিল, এগুলো সব সারাতে পাঠাবো ভাবচি। কেবল মোজাই এত জোড়া আছে যে, বোধ করি দশ বচ্ছর আর না কিনলেও চলে যাবে।

ক্ষেত্রমোহন এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন, এখন কেউ নেই, এই সময় চট্ করে একটা কথা বলে রাখি। আপনার ননদটিকে দেখে তাঁর স্বামীর স্বরূপটা যেন মনে মনে আন্দাজ করে রাখবেন না। বাইরে থেকে আমার সাজসজ্জা আর আচার-ব্যবহার দেখে আমাকে ফিরিঙ্গি ভাববেন না, আমি নিতান্তই বাঙালী। কেউ গঙ্গাস্নান করে এসেছে শুনলে তাকে আমার মারতে ইচ্ছা করে না, এ-কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আরও একটা কথা নিরিবিলিতেই বলে রাখি। সোমেনের মারটা নিজের গায়ে পেতে নিলে শৈলেশ বেচারার প্রতি কিন্তু অবিচার করা হবে। এত বড় অপদার্থ ও সত্যিসত্যিই নয়।

ঊষা এ-কথারও কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, এখন আপনি বসুন। আমার জন্যে আপনার সময় না নষ্ট হয়। একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনার লক্ষ্মী হাতের কাজ করা দেখে আমিও গৃহস্থালীর কাজকর্ম একটু শিখে নিই।

ঊষা মেঝের উপর বসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, এ-সব মেয়েদের কাজ, আপনার শিখে লাভ কি?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এর জবাব একদিন আপনাকে দেব, আজ নয়।

ঊষা নীরবে হাতের কাজ করিতে লাগিল; কিন্তু একটু পরেই কহিল, এ-সব ত গরীব-দুঃখীদের কাজ, আপনাদের এ শিক্ষায় ত কোন প্রয়োজনই হবে না।

ক্ষেত্রমোহন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন, বাইরের চাকচিক্য দেখে যদি আপনারও ভুল হয় ত সংসারে আমাদের মত দুর্ভাগাদের ব্যথা বোঝবার আর কেউ থাকবে না। ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোনটিকে আপনার কাছে দিন-কতক রেখে যাই। আপনার লক্ষ্মীশ্রীর কতকটাও হয়ত সে তাহলে শ্বশুরবাড়িতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা অনেকগুলি জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে শুনতে পাইয়া শুধু বলিলেন, এঁরা সব উপরেই আসচেন দেখচি। শৈলেশের বোন এবং আমার বোনের বাইরের বেশভূষার সাদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরটাও একরকম বলে স্থির করে নেবেন না।

উষা শুধু একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি বোধ হয় চিনতে পারব।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বোধ হয়! নিশ্চয় পারবেন, এও আমি নিশ্চয় জানি।

৮

সিঁড়িতে যাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়াছিল তাহারা শৈলেশ, বিভা এবং বিভার ছোট ননদ উমা। শৈলেশ ও বিভা ঘরে প্রবেশ করিল, সকলের পিছনে ছিল উমা; সে চৌকাঠের এদিকে পা বাড়াইতেই, তাহার দাদা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, জুতোটা খুলে এস উমা।

বিভা ফিরিয়া চাহিয়া স্বামীকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, দোষ কি? পায়ে কাঁটাও ফুটবে না, হোঁচটও লাগবে না।

বিভা কহিল, আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ জুতো খোলার দরকার হ'ল কিসে তাই শুধু জিজ্ঞাসা করেচি।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুন হিঁদুমানুষ—তা ছাড়া গুরুজনের ঘরের মধ্যে ওটা পায়ে দিয়ে না আসাই বোধ হয় ভাল।

বিভা স্বামীর পায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, শুধু কেবল ভগিনীকে উপদেশ দেওয়াই নয়, নিজেও তিনি ইতিপূর্ব্বে তাহা পালন করিয়াছেন দেখিয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল; কহিল, গুরুজনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা তোমার অসাধারণ সে ভালই, কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। গুরুজনের এটা শোবার ঘর না হয়ে ঠাকুরঘর হলে আজ হয়ত তুমি একেবারে গোবর খেয়ে পবিত্র হয়ে ঢুকতে।

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া ক্ষেত্র হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, গোবরের প্রতি রুচি নেই, ওটা বৌঠাকরুনের খাতিরেও মুখে তুলতে পারতুম না, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে যখন কোন সুবাদই রাখিনে, তখন অকারণে তাঁদের ঘরে ঢুকেও উৎপাত করতুম না। আচ্ছা বৌঠাকরুন, এ-ঘরে ত আগেও বহুবার এসেচি, মনে হচ্ছে যেন একটা ভাল কার্পেট পাতা ছিল, সেটা তুলে দিলেন কেন?

উষা কহিল, ধোয়ামোছা যায় না, বড় নোংরা হয়, শোবার ঘর—

বিভা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, কার্পেট পাতা থাকলে ঘর নোংরা হয়?

উষা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, হয় বৈ কি ভাই। চোখে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু নীচে তার ঢের ধূলো-বালি চাপা পড়ে থাকে।

বিভা বোধ করি ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রবল-কণ্ঠে অকস্মাৎ তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ব্যস্‌ ব্যস্‌ বৌঠাকুরুন, নোংরা চাপা পড়লেই আমাদের কাজ চলে যায়—তার বেশী আর আমরা চাইনে। ও জিনিসটা চোখের আড়ালে থাকলেই আমরা খুশী হয়ে থাকি। কি বল শৈলেশ, ঠিক না?

শৈলেশ কথা কহিল না। বিভার ক্রোধের অবধি রহিল না; কিন্তু সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া সে তর্ক না করিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার স্নেহ ও প্রীতির হয়ত কোন অভাব ছিল না, কিন্তু বাহিরে সাংসারিক আচরণে বাদ-প্রতিবাদের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায়ই প্রকাশ হইয়া পড়িত। লোকের সম্মুখে বিভা তর্কে কিছুতেই হার মানিতে পারিত না, ইহা তাহার স্বভাব। সেই হেতু প্রায়ই দেখা যাইত, এই বস্তুটা পাছে কথায় কথায় বাড়াবাড়িতে গিয়া উপনীত হয়, এই ভয়ে প্রায়ই ক্ষেত্রমোহন বিতণ্ডার মাঝখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িত। কিন্তু আজ তাহার সে ভাব নয়, ইহা ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া বিভা আপনাকে সংবরণ করিল।

বস্তুতঃই তাহার বিরুদ্ধে আজ ক্ষেত্রমোহনের মনের মধ্যে এতটুকু প্রশ্রয়ের ভাব ছিল না। পরের দোষ ধরিয়া কটুকথা বলা বিভার একপ্রকার স্বভাবের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত ইহাতে অশিষ্টতা ভিন্ন আর কোন ক্ষতিই হইত না; কিন্তু এই যে নিরপরাধ বধূটির বিরুদ্ধে প্রথম দিন হইতেই সে একেবারে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে, বিনা দোষে অশেষ দুঃখভোগের পর যে স্ত্রী স্বামীর গৃহকোণে দৈবাৎ স্থানলাভ করিয়াছে, তাহার সেইটুকু স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি আর একজন স্বামীর চিত্ত দুঃখে ও বিরক্তিতে পূর্ণ করিয়া আনিতেছিল। অথচ ইহারই পদধূলির যোগ্যতাও অপরের নাই, এই সত্য চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রমোহনের তিক্ত ব্যথিত চিত্তে বিভার বিরুদ্ধে আর কোন ক্ষমা রহিল না। অথচ এই কথা প্রকাশ করিয়া বলাও এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে তেমনি সুকঠিন। বরঞ্চ যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার আবরণে বাহিরে ইহাকে গোপন করিতেই হইবে।

ক্ষেত্রমোহন ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, উমা, তোমার এই পল্লীগ্রামের বৌদিদির কাছে এসে যদি রোজ দুপুর-বেলা বসতে পারো, যে কোন সংসারেই পড় না কেন দিদি, দুঃখ পাবে না তা বলে রাখচি।

ঊষা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। ঊষা মুখ না তুলিয়া বলিল, তা হলেই হয়েচে আর কি! আপনাদের সমাজে ওকে এক-ঘরে করে দেবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তা দিক বৌঠাকরুন। কিন্তু ওরা স্বামী-স্ত্রীতে যে পরম সুখে থাকবে তা বাজি রেখে বলতে পারি।

শৈলেশ বিভার প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল, বাজি রাখতে আর হবে না ভাই, এই বলাতেই যথেষ্ট হবে।

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিয়া কহিলেন, আর যাই হোক, আজকের কাজটুকুও যদি মনে রাখতে পারে ত নিরর্থক নিত্য নূতন মোজা-কেনার দায় থেকেও অন্ততঃ ওর স্বামী বেচারা অব্যাহতি পাবে।

বিভা সেই অবধি চুপ করিয়াই ছিল, আর পারিল না। কিন্তু গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন গোপন করিয়া একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল ওর ভবিষ্যৎ সংসারে হয়ত মোজায় তালি দেবার প্রয়োজন নাও হতে পারে। দিলেও হয়ত ওর স্বামী পরতে চাইবে না। আগে থেকে বলা কিছুই যায় না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যায় বৈ কি। চোখ কান খোলা থাকলেই বলা যায়। যে সত্যিকারের জাহাজ চালায়, সে জলের চেহারা দেখলেই টের পায় তলা কত দূরে। বৌঠাকরুন, জাহাজে পা দিয়েই ধরে ফেলেছিলেন, একটু অসাবধানেই তলায় পাঁক গুলিয়ে উঠবে, এতেই আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিই। আর শৈলেশের পক্ষ থেকে ত লক্ষ্যকোটি ধন্যবাদেও পর্য্যাপ্ত হবার নয়।

ঊষা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে বলিল, নিজের গৃহে নিজের স্বামীর অবস্থা বোঝবার চেষ্টা করার মধ্যে ধন্যবাদের ত কিছুই নেই ক্ষেত্রমোহনবাবু।

এ-কথার জবাব দিল বিভা। সে কহিল, অন্ততঃ নিজের স্ত্রীকে অপমান করার কাজটা হয়ত সিদ্ধ হয়। তা ছাড়া, কাউকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলেই বোধ হয় আর কারুর ভক্তি-শ্রদ্ধা উথলে উঠে।

ঊষা মুখ তুলিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিল, স্বামীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার চেষ্টাকে কি উঞ্ছবৃত্তি বলে ঠাকুরঝি?

ক্ষেত্রমোহন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, না, বলে না। পৃথিবীর কোন ভদ্রব্যক্তিই এমন কথা মুখে আনতেও পারে না। কিন্তু স্বামীর চক্ষে স্ত্রীকে নিরন্তর হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে হৃদয়ের কোন প্রবৃত্তি বলে, আপনার ঠাকুরঝিকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে নিন।

বিভার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। অভিভূতের মত একবার সে বক্তার মুখের দিকে, একবার শৈলেশের মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। এতগুলি লোকের সমক্ষে তাহার স্বামী যে যথার্থ-ই তাহাকে এমন করিয়া

আঘাত করিতে পারে প্রথমে সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিল না। তার পরে শৈলেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এর পরে আর ত তোমার বাড়িতে আসতে পারিনে দাদা! আমি তা হলে চিরকালের মতই চললুম।

শৈলেশ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঊষা হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমরা ত তোমাকে কোন কথা বলিনি ভাই।

হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল, এবং এই গণ্ডগোলের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। বিভা হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যখন আপনার কেবল শত্রুতাই করচি, তখন এ বাড়িতে আমার আর কিছুতেই প্রবেশ করা উচিত নয়।

ঊষা কহিল, কিন্তু এমন কথা আমি ত কোনদিন মনেও ভাবিনি ঠাকুরঝি!

বিভা কানও দিল না। অশ্রু-বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল, আজ উনি মুখের উপর স্পষ্ট বলে গেলেন, কাল হয়ত দাদাও বলবেন তাঁর নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে কথা কইতে যাওয়া শুধু অপমান হওয়া। উমা, বাড়ি যাও ত এস। এই বলিয়া সে নীচে নামিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বৌদিদি যখন নেই, তখন এ বাড়িতে পা দিতে যাওয়াটাই আমাদের ভুল। এবার বাড়ির সকল সম্বন্ধই আমার ঘুচল। এই বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেল। শৈলেশ পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া সসঙ্কোচে কহিল, না হয়, আমার লাইব্রেরী-ঘরে এসেই একটু বস্ না বিভা।

বিভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। কিন্তু আমার বৌদিদিকে একেবারে ভুলে যেও না দাদা। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, সোমেন বিলাতে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়— দোহাই তোমার, তাকে নষ্ট হতে দিয়ো না। আজ তাকে যেভাবে চোখে দেখতে পেলুম, এই শিক্ষাই যদি তার চলতে থাকে, সমাজের মধ্যে আর মুখ দেখাতে পারব না।

তাহার অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া শৈলেশ মিনতি করিয়া কহিল, তুই আমার বাইরের ঘরে বসবি চল্ বোন, এমন করে চলে গেলে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। সোমেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কি না জানি না, কিন্তু অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথাও গিয়ে আর বসতে চাইনে দাদা, কিন্তু সোমেন আমাদের বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, একেবারে আত্মহারা হয়ে যেয়ো না দাদা। এই বলিয়া সে সোজা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার গাড়িতে গিয়া উপবেশন করিল। ঊষা বরাবর নীরব হইয়াই

ছিল, এখনও সে একটি কথাতেও কথা যোগ করিল না, নিঃশব্দে বিভার পার্শ্বে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বিভা, সোমেনকে না হয় তুই নিয়ে যা। তোর নিজের ছেলে-পুলে নেই, তাকে তুই নিজের মত করেই মানুষ করে তোল্।

বিভা এবং উমা উভয়েই একান্ত বিস্ময়ে শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বিভা কহিল, কেন এই নিরর্থক প্রস্তাব করচ দাদা, এ তুমি পারবে না—তোমাকে পারতেও দেব না।

শৈলেশ ঝোঁকের উপর জোর করিয়া উত্তর দিল, আমি পারবই – এই তোকে কথা দিলাম বিভা।

বিভা সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে মাথা নাড়িয়া কহিল, পারো ভালই। তাকে পাঠিয়ে দিয়ো। তাকে উচ্চশিক্ষা দেবার টাকা যদি তোমার না থাকে, আমিও কথা দিচ্চি দাদা, সে ভার আজ থেকে আমি নিলাম। এই বলিয়া সে উমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, উপরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঊষা নীচে তাদের দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরক্ষণে মোটর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শৈলেশ তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। উপরে যাইতে তাহার ইচ্ছাও হইল না, সাহসও ছিল না, সমস্ত কথাই যে ঊষা শুনিতে পাইয়াছে, ইহা জানিতে তাহার অবশিষ্ট ছিল না।

৯

রাত্রে খাবার দিয়া স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঊষা অন্যান্য দিনের মত নিকটে বসিয়াছিল। শুধু সোমেন আজ তাহার কাছে ছিল না। হয়ত সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিংবা এমনি কিছু একটা হইবে। শৈলেশ আসিল, তাহার মুখ অতিশয় গম্ভীর। হইবারই কথা। ব্যর্থ প্রশ্ন করা ঊষার স্বভাব নয়, আজিকার ঘটনা সম্বন্ধে সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এবং যাহা জানে না তাহা জানিবার জন্যও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। স্ত্রীর এই স্বভাবের পরিচয়টুকু অন্ততঃ শৈলেশ এই কয়দিনেই পাইয়াছিল। আহারে বসিয়া মনে মনে সে রাগ করিল, কিন্তু আশ্চর্য্য হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আড়চোখে চাহিয়া সে স্ত্রীর মুখের চেহারা দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ঊষা ইচ্ছা করিয়াই আলোটার দিকে আড় হইয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দিনের মত সে খাইতে পারিল না।

যেজন্য আজ তাহার আহারে রুচি ছিল না তাহার কারণ আলাদা, তথাপি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও গায়ে পড়িয়া শুনাইয়া দিল যে, অনভ্যস্ত খাওয়া-পরা শুধু দু-চার দিনই চলিতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড় করাইলে আর স্বাদ থাকে না, তখন অরুচি অত্যাচারে গিয়া দাঁড়ায়।

কথাটা তর্কের দিক দিয়া যাই হোক, এ-ক্ষেত্রে সত্য নয় জানিয়া উষা চুপ করিয়া রহিল। মিথ্যা জিনিসটা নিশ্চয়ই মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক করিতে কোনদিনই তাহার প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু এমন করিয়া নিঃশব্দে অস্বীকার করিলে প্রতিপক্ষের রাগ বাড়িয়া যায়। তাই শুইতে আসিয়া শৈলেশ খামকা বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার প্রতি একদিন অতিশয় অন্যায় করেছিলাম তা মানি, কিন্তু তাই বলেই আজ তোমার ছাড়া আর কারও ব্যবস্থাই চলবে না এও ত ভারী জুলুম!

এরূপ শক্তকথা শৈলেশ প্রথম দিনটাতেও উচ্চারণ করে নাই। উষা মনে মনে বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে শুধু বলিল, আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এমন করিয়া অত্যন্ত বিনয়ে কবুল করিয়া লইলে আরও রাগ বাড়ে।

শৈলেশ কহিল, তোমার বোঝা উচিত ছিল। আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সমাজ সমস্ত উল্টে দিয়ে যদি এ-বাড়িকে তোমার বাপের বাড়ি বানিয়ে তুলতে চাও ত আমাদের মত লোকের পক্ষে বড় মুস্কিল হতে থাকে সোমেনকে বোধ হয় কাল ওর পিসীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি কি বল?

উষা কহিল, ওর ভালর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় ত দিতে হবে বৈ কি।

তাহার বলার মধ্যে উত্তাপ বা শ্লেষ কিছুই ধরিতে না পারিয়া শৈলেশ দ্বিধার মধ্যে পড়িল। কিসের জন্য সে এসব করিতেছে তাহার হেতুও মনের মধ্যে বেশ দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু এই সকল দুর্বল প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে, তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অসঙ্গত অভিমানের দ্বার ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে বলেই সকলের বিশ্বাস। যেসব আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি আমরা মানিনে, মানতে পারিনে, তাই নিয়ে অযথা ভাই-বোনের মধ্যে বিবাদ হয়, সমাজের কাছে পরিহাসের পাত্র হতে হয়—এ আমার ভাল লাগে না।

উষা প্রতিবাদ করিল না, নিজের দিক হইতে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা মাত্র করিল না, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শৈলেশের তাহা কানে গেল। উষা নিজে কলহ করে নাই, তাহার পক্ষ লইয়া বিভার প্রতি যত কটু কথা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার একটিও যে উষার নিজের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, তাহা এতখানিই সত্য যে সে লইয়া ইঙ্গিত করাও চলে না, ভুলাও যায় না।

সুতরাং ক্ষেত্রমোহনের দুষ্কৃতির শাস্তি যে আর একজনের স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে না—ইহাতে প্রতিহিংসার কিছুই যে নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিতে সে পুনশ্চ কহিল, যাকে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে হবে, যে সমাজের মধ্যে তাকে চলা-ফেরা করতে হবে, ছেলেবেলা থেকে তার সেই আবহওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়া আবশ্যক। শিশুকালটা তার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাটতে দেওয়া তার প্রতি গভীর অন্যায় এবং অবিচার করা হবে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিল, এ-সম্বন্ধে তোমার বলবার কিছু না থাকে ত স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মুখ বুজে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেই তার জবাব হয় না। সোমেনের সম্বন্ধে আমরা রীতিমত চিন্তা করেই তবে স্থির করেচি।

সোমেন পাশেই ঘুমাইতেছিল। এ বাটীতে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকায় আসিয়া পর্য্যন্ত উষা তাহাকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিত। তাহার নিদ্রিত ললাটের উপর সে সস্নেহে ও সন্তর্পণে বামহাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, যাই কেন না স্থির কর, ছেলের কল্যাণের জন্যই তুমি স্থির করবে। এ ছাড়া আর কি কেউ কখনও ভাবতে পারে! বেশ ত, তাই তুমি ক'রো।

ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া ঘরের কোণে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটা তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই সামান্য আলোকে শৈলেশ নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অদূরবর্ত্তী শয্যায় শায়িত উষার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা ছাড়া সে সোমেনের সমস্ত পড়ার খরচ দেবে বলেচে। সে ত কম নয়!

উষার কণ্ঠস্বরে কিছুতেই উত্তেজনা প্রকাশ পাইত না। শান্তভাবে কথা কহাই তাহার প্রকৃতি। কহিল, না, সে হতে পারবে না। ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।

শৈলেশ কহিল, সে যে অনেক টাকার দরকার।

উষা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, দরকার হয় দিতে হবে। কিন্তু আর রাত জেগো না, তুমি ঘুমোও।

পরদিন অপরাহ্নকালে শৈলেশ কলেজ ও ক্লাব হইতে বাড়ি ফিরিয়া রান্নার এক-প্রকার সুপরিচিত ও সুপ্রিয় গন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিতচিত্তে তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল পরে চা ও খাবার লইয়া যে ব্যক্তি দর্শন দিলেন, শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সে মুসলমান।

রাত্রে খাবারঘরে আলো জ্বলিল, এবং সজ্জিত টেবিলের চেহারা দেখিয়া শৈলেশ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিল না যে, ইহার জন্য অত্যন্ত সঙ্গোপনে মন তাহার সত্যই ব্যগ্র এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ডিনার তখনও দুই-একটা ডিসের অধিক অগ্রসর হয় নাই, ঊষা আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া একটু দূরে বসিল।

শৈলেশের মন প্রসন্ন ছিল, ঠাট্টা করিয়া বলিল, ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ঘ্রাণেও যে অর্দ্ধভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

ঊষা অল্প একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ তোমার উচিত নয়। যে শাস্ত্রকে তুমি মান না, গণ না, তার দোহাই দেওয়া তোমার সাজে না।

শৈলেশও হাসিল। কহিল, আচ্ছা হার মানলুম। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই আমিও দেব না, তুমিও কিন্তু পালিয়ো না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, ভাগ্যে কাল খোঁটা দিয়েছিলুম তাই ত আজ এমন বস্তুটি অদৃষ্টে জুটলো! ঠিক না ঊষা? কিন্তু খরচপত্র কি তোমার খুব বেশী পড়বে?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। অপব্যয় না হলে কোন খাবার জিনিসেই খুব বেশি পড়ে না। আসচে মাস থেকে আমি নিজেই এ সব করব ভেবেছিলাম। কিছু এইটি দেখো, জিনিসপত্র বৃথা নষ্ট যেন না হয়। আমার খরচের খাতায় যেমনটি লিখে রেখেচি, ঠিক তেমনিটি যেন হয়। হবে ত?

শৈলেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন হবে না শুনি?

ঊষা তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কাল সারারাত ভেবে ভেবে আমি যা স্থির করেচি তাকে অস্থির করবার জন্য আমাকে আদেশ ক'রো না, তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

শৈলেশ আর্দ্রচিত্তে কহিল, তা ত আমি কোনদিন করবার চেষ্টা করিনে ঊষা! আমি নিশ্চয় জানি, তোমার সিদ্ধান্ত তোমারই যোগ্য। তার নড়চড় হয়ও না, হওয়া উচিতও নয়। আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তোমার মন তেমনি সবল, তেমনি দৃঢ়।

স্বামীর মুখের উপর হইতে ঊষা দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, সত্যিই আর কিছু হবার নয়, আমি ভেবে দেখেচি।

শৈলেশ নিশ্চয়ই বুঝিল ইহা সোমেনের কথা। সহাস্যে কহিল, ভূমিকা ত হ'ল, এখন স্থির কি করেচ বল ত? আমি শপথ করে বলতে পারি তোমাকে কখনো অন্যথা করতে অনুরোধ করব না।

ঊষা মিনিট-খানেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপরে বলিল, দাদার সংসারে আমার চলে যাচ্ছিল—বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। কাল আবার আমি তাঁদের কাছেই যাব।

তাঁদের কাছে যাবে? কবে ফিরবে?

ঊষা বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, ফিরতে আর আমি পারব না। আমি

অনেক চিন্তা করে দেখেছি, এখানে আমার থাকা চলবে না। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

কথা শুনিয়া শৈলেশ একেবারে যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন নিরন্তর মুগুর মারিয়া মারিয়া কহিতে লাগিল, যে লৌহকবাট রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সাধ্য এ দুনিয়ায় কাহারও নাই।

১০

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া শৈলেশের প্রথমেই মনে হইল, সারারাত্রি ধরিয়া সে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল উষা নিত্যনিয়মিত গৃহকর্মে ব্যাপৃতা,—সোমেন সঙ্গে, বোধ হয় সে খাবার তাগাদায় আছে। সিঁড়িতে নামিবার পথে দেখা হইতে উষা মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার চা তৈরি করে ফেলেচে, মুখ-হাত ধুতে দেরি করলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু। একটু তাড়াতাড়ি নিয়ো।

শৈলেশ কহিল,বেশ ত, তুমি পাঠিয়ে দাও গে, আমার এক মিনিট দেরি হবে না। এই বলিয়া সে যেন লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তাহার বাথরুমে প্রবেশ করিল। মনে মনে কহিল, আচ্ছা ইডিয়ট্ আমি ? দাম্পত্য-কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা জ্ঞান করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, সকালবেলায় এই কথা মনে করিয়া শুধু তাহার হাসি পাইল তাই নয়, নিজের কাছে লজ্জা বোধ হইল। সংসার করিতে একটা মতভেদ বা দুটো কথা-কাটাকাটি হইলেই স্ত্রী যদি স্বামীগৃহ ছাড়িয়া দাদার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইত, দুনিয়ায় ত তাহা হইলে মানুষ বলিয়া আর কোন জীবই থাকিত না। সোমেনের মা হইলেও বা দু-দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু উষার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে গড়া স্ত্রী,—ধর্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়,তাহা হইলে সংসারের আর বাকী থাকে কি ? এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশী পাগলামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল। এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে উষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজে আরও দুই-চারিজন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। এমনি ধারা শিক্ষা-দীক্ষা পেলেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। এই বলিয়া

সে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নবনিযুক্ত মুসলমান খানসামা চা, রুটি, মাখন, কেক্ প্রভৃতি প্রাতরাশের আয়োজন লইয়া হাজির হইতে তাহার হঠাৎ যেন চমক লাগিল। এই সকল বস্তুতেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, মাঝে কেবল দিন-কয়েক বাধা পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু টেবিলে রাখিয়া দিয়া বেহারা চলিয়া গেলে এই জিনিসগুলির পানে চাহিয়াই আজ তাহার অরুচি বোধ হইল; উষা গৃহে আসিয়া পর্য্যন্ত এই সকলের পরিবর্ত্তে নিমকি, কচুরি প্রভৃতি স্বহস্তে-রচিত খাদ্যদ্রব্য সকালে চায়ের সঙ্গে আসিত, সে নিজে উপস্থিত থাকিত, কিন্তু আজ তাহার কোনটাই নাই দেখিয়া, তাহার আহারের প্রবৃত্তি রহিল না। শুধু এক পেয়ালা চা কেৎলি হইতে নিজে ঢালিয়া লইয়া খানসামাকে ডাকিয়া সমস্ত বিদায় করিয়া দিয়া শৈলেশ পর্দ্দার বাহিরে একটা অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনির আশায় কান খাড়া করিয়া রাখিল। এবং না-খাওয়ার কৈফিয়ত যে একটু কড়া করিয়াই দিবে, এই মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে অযথা দেরি করিয়া পেয়ালা যখন শেষ করিল, তখন চা ঠাণ্ডা এবং বিস্বাদ হইয়া গেছে; ফিরিয়া আসিয়া লোকটা শূন্য পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না, উষা ঘরে প্রবেশ করিল না।

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল, স্নানাহার সারিয়া কলেজের জন্য প্রস্তুত হইবে। খাবার সময় আজও উষা অন্যান্য দিনের মত কাছে আসিয়া বসিল; তাহার আগ্রহ, যত্ন বা কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন প্রভেদ বাড়ির কাহারও কাছে ধরা পড়িল না, পড়িল শুধু শৈলেশের কাছে। একটা রাত্রির মধ্যে একটা লোক যে বিনা চেষ্টায়, বিনা আড়ম্বরে কতদূরে সরিয়া যাইতে পারে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলেজ যাইবার পোষাক পরিতে এ ঘরে ঢুকিয়া এখন প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল টেবিলের উপরে সংসার-খরচের সেই ছোট্ট খাতাটি। হয়ত কাল হইতেই এমনি পড়িয়া আছে, সে লক্ষ্য করে নাই—না হইলে তাহারই জন্য উষা এইমাত্র রাখিয়া গেছে তাহা সম্ভবও নয়, সত্যও নয়। আজও ত মাস শেষ হয় নাই—অকস্মাৎ এখানে ইহার প্রয়োজন হইলই বা কিসে? তথাপি গলায় টাই বাঁধা তাহার অসমাপ্ত রহিল, কতক কৌতুহলে, কতক অন্যমনস্কতাবশে একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইয়া একেবারে শেষপাতায় আসিয়া থামিল। পাতায় পাতায় একই কথা—সেই মাছ, শাক, আলু, পটল, চালের বস্তা, দুধের দাম, চাকরের মাইনে—কাল পর্য্যন্ত জমা বইতে খরচ বাদ দিয়া মজুত টাকার অঙ্ক স্পষ্ট করিয়া লেখা। এই লেখা যেদিন আরম্ভ হয়, সেদিন সে এলাহাবাদে। তখনও তাহার হাত ছিল না, আজ এইখানেই যদি ইহার সমাপ্তি ঘটে তাহাতেও তেমনি হাত নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত

প্রথম দিনের প্রথম পাতাটির প্রতি শৈলেশ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। এই জিনিসটা সংসারে তাহার দুর্দিনের ব্যাপার। আগেও ছিল না, পরেও যদি না থাকে ত সংসার অচল হইয়া থাকিবে না—দুদিন পরে হয়ত সে নিজেই ভুলিবে। তবুও কত কি-ই না মনে হয়। খাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনশ্চ টাই বাঁধার কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া হঠাৎ এই কথাটাই আজ তাহার সবচেয়ে বড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল, এজগতে কোনকিছুর মূল্যই একান্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। এই খাতা, এই হিসাব লেখারই একদিন প্রয়োজনের অবধি ছিল না, আবার একদিন সেই সকলই না কত-খানি অকিঞ্চিৎকর হইতে চলিল।

অবশেষে পোষাক পরিয়া শৈলেশ যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে উষাকে ডাকিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে মন তাহার বারংবার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল, তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিয়া লইবার সাহসও সে নিজের মধ্যে কোনক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

১১

কলেজের ছুটির পর শৈলেশ বাটী না ফিরিয়া সোজা বিভার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, অনুমান তাহার নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। ভগিনীপতি আদালতে বাহির হ'ন নাই, এবং ইতিমধ্যেই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার রফা হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া সে তৃপ্তি বোধ করিল। কহিল, কই সোমেনকে আনতে লোক পাঠালে না বিভা?

বিভা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, হাতি যে কিনছিল সে নেই।

তার মানে?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি গল্প শোননি? কে একজন মাতাল নাকি নেশার ঝোঁকে রাজার হাতি কিনতে চেয়েছিল। পরদিন ধরে এনে এই বেয়াদপির কৈফিয়ত চাওয়ায় সে হাত জোড় করে বলেছিল, হাতিতে তার প্রয়োজন নেই, কারণ হাতির যে সত্যিকারের খরিদ্দার সে আর নেই, চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিলেন, এবং পরে হাসি থামিলে বলিলেন, এই গল্পটা শুনিয়ে

বৌঠাকরুনকে রাগ করতে বারণ ক'রো শৈলেশ, সত্যিকার খদ্দের আর নেই—সে চলে গেছে। মায়ের চেয়ে পিসীর কাছে এসে যদি ছেলে মানুষ হয়, তার চেয়ে না হয় ধার-ধোর করে বিভাকে একটা হাতিই আমি কিনে দেব। এই বলিয়া তিনি বিভার অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে হাসিতে শৈলেশ যোগ দিল না, এবং পাছে পরিহাসের সূত্র ধরিয়া বিভার সুপ্ত ক্রোধ উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে প্রাণপণে আপনাকে সংবরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষেত্রমোহন লজ্জিত হইয়া কহিলেন, ব্যাপার কি শৈলেশ?

শৈলেশ কহিল, বিভার কথায় সোমেনের সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন হবে না, তখন আবার কোন একটা নূতন ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, অর্থাৎ ডাইনির হাতে ছেলে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না—না?

শৈলেশ বলিল, এই কট ক্তির জবাব না দিয়েও এ-কথা বলা যেতে পারে যে, উষা শীঘ্রই চলে যাচ্চেন।

চলে যাচ্চেন? কোথায়?

শৈলেশ কহিল, যেখান থেকে এসেছিলেন—তাঁর দাদার বাড়িতে।

ক্ষেত্রমোহনের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি স্ত্রীর মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, আমি এই রকমই কতকটা ভয় করেছিলাম শৈলেশ।

বিভা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, স্বামীর সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের অর্থ সে বুঝিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমাকে নিমিত্ত করেই কি তুমি এই ব্যবস্থা করতে যাচ্চো? তা যদি হয়, আমি নিষেধ করব না, কিন্তু একদিন তোমাদের দুজনকেই কাঁদতে হবে বলে দিচ্চি।

শৈলেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পরে সে মুসলমান ভৃত্য রাখা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সকালের সেই খাতাটার কথা পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিল, যেতে আমি বলিনি, কিন্তু যেতে বাধাও আমি দেব না। আত্মীয়-বন্ধু-মহলে একটা আলোচনা উঠবে এবং তাতে যশ আমার বাড়বে না তাও নিশ্চয় জানি, কিন্তু প্রকাণ্ড ভুলের একটা সংশোধন হয়ে গেল, তার জন্তে ভগবানকে আমি আন্তরিক ধন্তবাদ দেব।

বিভা মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ক্ষেত্রমোহনও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোনরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করিলেন না। শৈলেশ কহিল, তোমাদের কাছে সমস্ত জানানো কর্ত্তব্য বলেই আজ আমি এসেছি। অন্ততঃ তোমরা না আমাকে ভুল কর।

ক্ষেত্রমোহন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, তার সাধ্য কি। হাঁ হে শৈলেশ, ভবানীপুরে সেই যে একবার একটা কথাবার্তা হয়েছিল, ইতিমধ্যে তাঁরা কেউ খবর-টবর নিয়েছিলেন কি?

শৈলেশ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, তোমার ইঙ্গিত এত অভদ্র এবং হীন যে আপনাকে সামলানো শক্ত। তোমাকে কেবল এই বলেই ক্ষমা যায় যে, কোথায় আঘাত করচ তুমি জানো না। এই বলিয়া সে ভিতরের উত্তাপে একবার নড়িয়া চড়িয়া আবার সোজা হইয়া বসিল।

ক্ষেত্রমোহন তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অবিচলিতভাবে এবং অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়া কহিলেন, সে ঠিক। জায়গাটা যে তোমার কোথায় আমি ঠাওর করতে পারিনি।

শৈলেশ নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বলিল, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সেদিন যে ব্যবহার করলে,—তাতে আমি আর তোমার কাছে কি বেশী প্রত্যাশা করতে পারি! তোমার মনে ঘা লাগবে বলেই কখনো কিছু বলিনি, কিন্তু বহুপূর্ব্বেই বোধ করি বলা উচিত ছিল।

ক্ষেত্রমোহন মুচকিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, তাই তাই ত হে শৈলেশ, it reminds স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার! ওটা আজও ঠিক শিখে উঠতে পারিনি, শেখবার বয়সও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—কিন্তু তুমি যদি এ সম্বন্ধে একটা বই লিখে যেতে পারতে ভাই—আচ্ছা, তোমরা ভাইবোন ততক্ষণ নিরিবিলি একটু পরামর্শ কর, আমি এলাম বলে। এই বলিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ চেঁচাইয়া বলিল, বই লিখতে হয়ত দেরি হতেও পারে, কিন্তু ততক্ষণ শুনে যাও, ওই যে ভবানীপুরের উল্লেখ করে বিদ্রূপ করলে, তাঁরা কেউ আমার খবর নিন বা না নিন, আমাকে উদ্যোগী হয়ে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের বাহির হইতে শুধু জবাব দিলেন, নিশ্চয় হবে। এমনি ত অযথা বিলম্ব হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই আসিয়া ক্ষেত্রমোহন পটলডাঙ্গার বাড়িতে দেখা দিলেন। শৈলেশ স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ অসময়ে ভগিনীপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কালকের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারের পর অযাচিত ও এত শীঘ্র ইঁহাকে সে আশা করে নাই। মনে মনে কতকটা লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, আজ কি হাইকোর্ট বন্ধ না কি?

ক্ষেত্রমোহন সহাস্যে বলিলেন, প্রশ্ন বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, তবে প্র্যাক্টিশ ছেড়ে দিলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ততোধিক বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, বোধ করি আমিও বাহুল্য। আমার স্নানের সময় হয়েচে, তাতে বোধ করি তোমার আপত্তি হবে না?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তুমি যেতে পারো।

বৌঠাকরুন, আসতে পারি?

পূজার ঘর এ গৃহে ছিল না। শোবার ঘরে একধারে আসন পাতিয়া উষা আহ্নিকে বসিবার আয়োজন করিতেছিল; কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া ভিজা চুলের উপর অঞ্চল টানিয়া আহ্বান করিল, আসুন।

ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিয়াই অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, অসময়ে এসে অত্যাচার করলুম। হঠাৎ বাপের বাড়ি যাবার খেয়াল হয়েচে না কি? বাবা কি পীড়িত?

উষা কহিল, বাবা বেঁচে নেই।

ওঃ—তা হলে মা'র অসুখ না কি?

উষা বলিল, তিনি বাবার পূর্ব্বেই গেছেন।

ক্ষেত্রমোহন ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তা হলে যাচ্ছেন কোথায়? আছে কে? এমন জায়গায় ত কোনমতেই যাওয়া হতে পারে না! শৈলেশের কথা ছেড়ে দিন, আমরাই ত রাজী হতে পারিনে।

উষা মুখ নীচু করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, পারবেন না?

না, কিছুতেই না।

কিন্তু এতকাল ত আমার সেই দাদার বাড়িতেই কেটে গেছে ক্ষেত্রবাবু। অচল হয়ে ত ছিল না।

ক্ষেত্রবাবু কহিলেন, যদি নিতান্তই যান, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে তা সত্যি করে বলে যান। না হলে কিছুতেই যেতে পাবেন না।

উষা নীরব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, কিন্তু সোমেন?

উষা কহিল, তার পিসী আছেন।

ক্ষেত্রমোহন হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, সে আমার স্ত্রী। আমি তার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

উষা মৌন হইয়া রহিল।

পারবেন না ক্ষমা করতে?

উষা তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, জগতে অপরাধ যখন আছে, তখন তার দুঃখভোগও আছে, এবং থাকবারই কথা। কিন্তু এর বিচার নেই কেন বলতে পারেন?

উষা কহিল, অর্থাৎ একজনের অপরাধের শাস্তি আর একজনকে পোহাতে হয় কেন? হয় এইমাত্রই জানি, কিন্তু কেন, তা আমি জানিনে ক্ষেত্রমোহনবাবু।

কবে যাবেন?

দাদা নিতে এলেই। কালও আসতে পারেন।

ক্ষেত্রমোহনবাবু ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, একটা কথা আপনাকে কোনদিন জানাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্চে, গোপন রাখলে আমার অপরাধ হবে। আপনার আসবার পূর্ব্বে এ-বাড়িতে আর-একজনের আসবার সম্ভাবনা হয়েছিল। মনে হয় সে ষড়যন্ত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

উষা কহিল, আমি জানি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তা হলে রাগ করে সেই ষড়যন্ত্রটাকেই কি অবশেষে জয়ী হতে দেবেন? এতেই কি—

কথা শেষ হইতে পাইল না। উষা শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, জয়ী হোক, পরাস্ত হোক ক্ষেত্রমোহনবাবু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—এই বলিয়া উষা দুই হাত যুক্ত করিয়া এতক্ষণ পরে ক্ষেত্রমোহনের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল।

সেই দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষেত্রমোহন নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

১২

স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ শৈলেশ বন্ধ করিল, কিন্তু উষা করিল না। তাহার আচরণে লেশমাত্র পরিবর্ত্তন নাই—সাংসারিক যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম ঠিক তেমনিই সে করিয়া যাইতেছে। মুখ ফুটিয়া শৈলেশ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, অথচ সব-চেয়ে মুস্কিল হইল তাহার এই কথা ভাবিয়া, এ গৃহ যে-লোক চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া যাইতেছে সেই গৃহের প্রতি তাহার এতখানি মমতা-বোধ রহিল কি করিয়া? আজ সকালেই তাহার কানে গিয়াছে, দেওয়ালের গায়ে হাত মুছিবার অপরাধে উষা নূতন ভৃত্যটাকে তিরস্কার করিতেছে। অভ্যাসমত কাজে ভুলভ্রান্তি তাহার নাই যদি-বা হয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে এতটুকু শিথিলতাও যে শৈলেশের চোখে পড়ে না। উষাকে ভাল করিয়া জানিবার তাহার সময় হয় নাই, তাহাকে সে সামান্যই জানিয়াছে, কিন্তু সেইটুকু জানার মধ্যেই কিন্তু এটুকু জানা তাহার হইয়া গেছে যে,

যাবার সংকল্প তাহার বিচলিত হইবে না। অথচ, সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এ-বয়সে তাহার সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রকাণ্ড গরমিল যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিশ্রাম নাগর-দোলায় পাক খাওয়াইয়া মরিতেছে।

ক্ষেত্রমোহন আসিয়া একেবারে সোজা রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দেখা দিলেন, কহিলেন, প্রসাদ পাবার আর বিলম্ব কত বৌঠাকরুন?

উষা মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, সে কথা আপনার বন্ধু কুটুম্বটিকে জিজ্ঞাসা করে আসুন, নইলে আমার সব হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ঠক্‌বার পাত্রী আপনি নন, কিন্তু ঠকে গেলাম আমি নিজে। রান্নার বহর দেখে এই ভরা-পেটেও লোভ হয় বৌঠাকরুন, কিন্তু অসুখের ভয় করে। তবে নেমতন্ন ক্যান্‌সেল করলে চলবে না, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।

উষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনার ছেলেটি কই?

উষা কহিল, আজ কি যে মাথায় খেয়াল এল কিছুতেই ইস্কুলে যাবে না। কোনমতে দুটি খাইয়ে এইমাত্র পাঠিয়ে দিলাম।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনাকে সে বড্ড ভালবাসে! একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ভালকথা, আপনার সেই বাপের বাড়ি যাবার প্রস্তাবটা কি হ'ল? বাস্তবিক বৌঠাকরুন, রাগের মাথায় আপনার মুখ দিয়েও যদি বেফাঁস কথা বার হয় ত ভরসা করবার সংসারে আর কিছু থাকে না।

উষা এ অভিযোগের উত্তর দিল না, নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। তথা হইতে বাহির হইয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের পড়ার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলেশ স্নানান্তে আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিল, মুখ ফিরিয়া চাহিল।

ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজ আজ বন্ধ না কি হে?

না। তবে প্রথম দুঘণ্টা ক্লাস নেই।

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা বেশ। কিন্তু বৌঠাকরুনের বাপের বাড়ি যাবার আয়োজন কিরূপ করলে?

শৈলেশ কহিল, আয়োজন যা করবার তিনি গেলে তবে করব। শুনচি কাল তাঁর দাদা এসে নিয়ে যাবেন।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি একটি ইডিয়ট্। ও স্ত্রী নিয়ে তুমি পেরে উঠবে না ভাই, তার চেয়ে বরঞ্চ বদলাবদলী করে নাও, তুমিও সুখে থাকো, আমিও সুখে থাকি।

শৈলেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, বয়েস ত ঢের হ'ল ক্ষেত্র, এইবার এই অভদ্র রসিকতাগুলো ত্যাগ কর না!

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ত্যাগ কি সাধে করতে পারিনে ভাই, তোমাদের ব্যবহারে পারিনে। তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে বললেন, বাপের বাড়ি চলে যাবো; তুমি অমনি জবাব দিলে, যাবে যাও—আমার ভবানীপুর এখনও হাতছাড়া হয়নি। এই সমস্ত কি ব্যবহার? ভাই-বোন একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। যাক, আমি সব ভেঙ্গে দিয়ে এসেচি, যাওয়া-টাওয়া তাঁর হবে না। তুমি কিন্তু আর খুঁচিয়ে ঘা ক'রো না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন, উঃ—ভারী বেলা হয়ে গেল, এখন চললুম, কাল সকালেই আসবো। ফিরতে উদ্যত হইয়া সহসা গলা খাটো করিয়া কহিলেন, দিন-কতক একটু বনিয়ে চল না শৈলেশ! অধ্যাপকের ঘরের মেয়ে, অনাচার সহ্য করতে পারেন না, খানাটানাগুলো দুদিন না-ই খেলে! তাছাড়া এসব ভালও ত নয়—খরচের দিকটাতেই চেয়ে দেখ না! আচ্ছা, চললুম ভাই, এই বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কখন আসিল, কি বলিয়া, কি করিয়া হঠাৎ সমস্ত ব্যাপার উল্টাইয়া দিয়া গেল, সে ভাবিয়াই পাইল না।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল খাবার দেওয়া হইয়াছে। উত্তরের ঢাকা বারান্দায় যথানিয়মে আসন পাতিয়া ঠাঁই করা। প্রতিদিনের মত বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া অদূরে ঊষা বসিয়া আছে, শৈলেশ ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে বসিয়া গেল। অনেকবার তাহার ইচ্ছা হইল, ক্ষেত্রর কথাটা মুখো-মুখি যাচাই করিয়া লইয়া সময়োচিত মিষ্ট দুটো কথা বলিয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিতে পারিল না, কিছুতেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। এমন কি সোমেনের ছুতা করিয়াও আলোচনা আরম্ভ করিতে পারিল না। অবশেষে খাওয়া সমাধা হইলে নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

১৩

পরদিন সকালে অবিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলেশ সেইমাত্র হাত-মুখ ধুইয়া পড়িবার ঘরে চা খাইতে যাইতেছিল, বাড়ির মধ্যে এই অপরিচিত লোকটিকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? আগন্তুক উষার ছোট ভাই। সে আপনার পরিচয় দিয়া কহিল, দাদা নিজে আসতে পারলেন না, দিদিকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বেশ ত নিয়ে যান। এই বলিয়া শৈলেশ তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রাতরাশের সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম টেবিলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র একবাটি চা ঢালিয়া লইয়া সে নিজে আরাম-কেদারায় আসিয়া উপবেশন করিল, অবশিষ্ট সমস্ত পড়িয়া রহিল, তাহার স্পর্শ করিবারও রুচি হইল না। উষার পিতৃগৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার কথা। এ দিক দিয়া অবিনাশকে দেখিয়া তাহার চমকাইবার কিছু ছিল না, এবং আসিয়াছে বলিয়াই যে অপরকে যাইতেই হইবে এমনও কিছু নয়; হয়ত শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই হইবে না,—কিন্তু নিশ্চয় একটা কিছু এ বিষয়ে না জানা পর্য্যন্ত দেহ-মন তাহার কি রকম যে করিতে লাগিল তাহার উপমা নাই। আজ সকালবেলাতেই ক্ষেত্রমোহনের আসিবার কথা, কিন্তু সে ভুলিয়াই গেল, কিংবা কোন একটা কাজে আবদ্ধ হইয়া রহিল, সহসা এই আশঙ্কাই যেন তাহার সকল আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিল। সে আসিয়া পড়িলে যা হোক একটা মীমাংসা হইয়া যায়। এইটাই তাঁহার একান্ত প্রয়োজন। অধৈর্য্যের উত্তেজনায় তাহার কেবলি ভয় করিতে লাগিল, পাছে আপনাকে আর সে ধরিয়া না রাখিতে পারে, পাছে নিজেই ছুটিয়া গিয়া উষাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, কাল ক্ষেত্রমোহনের সহিত তাহার কি কথা হইয়াছে। শৈলেশ নিজেকে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া ঘড়ির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সময় যখন তার কাটে না, এমনি সময়ে দ্বারের ভারী পর্দ্দা সরাইয়া যে ব্যক্তি সহসা প্রবেশ করিল সে একান্ত প্রত্যাশিত ক্ষেত্রমোহন নয়—অবিনাশ। শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া একখানা বই টানিয়া লইল। তাহার সর্ব্বদেহে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল।

অবিনাশ বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি চোখ পড়িতে ও-ধারের একখানা চেয়ার আরও খানিকটা দূরে টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। গৃহস্বামী অভ্যর্থনা করিবে এ ভরসা বোধ করি তাহার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢোকার একটা

কারণ পর্য্যন্তও যখন সে জিজ্ঞাসাও করিল না, তখন অবিনাশ নিজেই কথা কহিল। বলিল, এই আড়াইটার গাড়িতেই ত দিদি যেতে চাচ্চেন।

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, চাচ্চেন? কেন, আমার পক্ষ থেকে কি তিনি বাধা পাবার আশঙ্কা করেচেন?

অবিনাশ ছেলেমানুষ, সে হঠাৎ কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, আজ্ঞে না।

দরজার বাহিরে চুড়ির শব্দ পাইয়া শৈলেশের মন আরও বাঁকিয়া গেল। বলিল, না, আমার তরফ থেকে তাঁর যাবার কোন নিষেধ নেই।

অবিনাশ নীরব হইয়া রহিল। শৈলেশ প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার আসবার কথা শুনেছিলুম, তিনি এলেন না কেন?

অবিনাশ সঙ্কুচিতভাবে আস্তে আস্তে বলিল, তাঁর আমাকে পাঠাবারও তেমন ইচ্ছে ছিল না।

কেন?

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ বলিল, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে সব কথা বলাও যায় না, বলে লাভও নেই। তবে, তোমার দাদা যদি কখনো জানতে চান ত ব'লো যে, এ ব্যাপারে উষার দোষ নেই, দোষ কিংবা ভুল যদি কারও হয়ে থাকে ত সে আমার। তাঁকে আনতে পাঠানোই আমার উচিত হয়নি।

একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, মনে হ'ত বাবা অন্যায় করে গেছেন। দীর্ঘকাল পরে অবস্থাবশে যখন সময় এল, ভাবলুম এবার তার প্রতিকার হবে। তোমার দিদি এলেন বটে, কিন্তু এক দোষ শত দোষ হয়ে দেখা দিল।

ইহার আর উত্তর কি! অবিনাশ মৌন হইয়া রহিল, এমনি সময় সহসা অন্য দিকের দরজা ঠেলিয়া ঘরে ক্ষেত্রমোহন প্রবেশ করিলেন। শৈলেশ চাহিয়া দেখিল, কিন্তু থামিতে পারিল না। কঠিন বাক্যের স্বভাবই এই যে, সে নিজের ভারেই নিজে কঠিনতর হইয়া উঠিতে থাকে। উষা অন্তরালে দাঁড়াইয়া; অভ্রান্ত লক্ষ্যে তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ করিবার নির্দ্দয় উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া শৈলেশ বলিতে লাগিল, তোমার ভগিনীকে একদিন বিবাহ করেছিলুম সত্য, কিন্তু সহধর্ম্মিণী তাঁকে কোনমতেই বলা চলে না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম কিছুই এক নয়—জোর করে তাঁকে গৃহে রাখতে নিজের বাড়িটাকে যদি স্মৃতিশাস্ত্রের টোল বানিয়েও তুলি, কিন্তু আমার একমাত্র ছোট বোন দুঃখে ক্ষোভে পর হয়ে যায়, একটিমাত্র ছেলে কুশিক্ষায় কু-দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ ত কোনক্রমেই আমি হতে দিতে পারিনে। তবে তাঁর কাছে আমি এই জন্যে কৃতজ্ঞ যে মুখ ফুটে আমি যা

বলতে পারছিলুম না, তিনি নিজে থেকে সেই দুরূহ কর্তব্যটাই আমার সম্পন্ন করে দিলেন।

ক্ষেত্রমোহন বিস্ময়ে বাকশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। শৈলেশ লাজুক দুর্বল স্বভাবের লোক, ভয়ঙ্কর কিছু উচ্চারণ করা তাহার একান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু উন্মাদের মত সে কি করিতেছে! ঊষার ছোট ভাই লইতে আসিয়াছে এ-সংবাদ তিনি ইতিপূর্বে পাইয়াছিলেন, অতএব অপরিচিত লোকটি যে সে-ই, তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহারই সম্মুখে এ-সব কি? ক্ষেত্রমোহন ব্যাগ্র-অনুনয়ে হাত দুটি প্রায় জোড় করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, দেখবেন, আপনার দিদিকে যেন এ-সব ঘুণাগ্রেও জানাবেন না।

অপরিচিত ছেলেটি দ্বারের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে কিছুই জানাতে হবে না, বাইরে দাঁড়িয়ে দিদি নিজের কানেই সমস্ত শুনতে পাচ্চেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে? ওইখানে?

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি জবাব দিবার পূর্বে শৈলেশ স্পষ্ট করিয়া বলিল, হাঁ, আমি জানি ক্ষেত্র, তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে।

উত্তর শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন শুদ্ধ বিবর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সেইদিন ঘণ্টাদুই-তিন পরে ভগিনীকে লইয়া যখন অবিনাশ স্টেশন অভিমুখে রওনা হইল, তখন সোমেন তাহার পিসীর বাড়িতে, তাহার পিতা কলেজ-গৃহে এবং ক্ষেত্রমোহন হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া বিভা স্বামীকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কি করচেন দেখলে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, দেখলুম ত হাতে আছে একখানা বই, কিন্তু আসলে করচেন, বোধ করি অনুশোচনা।

এ কাজটা তুমি কবে করবে?

কোনটা? বই, না অনুশোচনা?

বিভা কহিল, বই তোমার হাতে আর মানাবে না, আমি শেষের কাজটাই বলচি।

ক্ষেত্রমোহন খোঁচা খাইয়া বলিলেন, ভাইকে ডেকে বাপের বাড়ি চলে গেলেই বোধ হয় করতে পারি।

বিভার মন আজ প্রসন্ন ছিল, সে রাগ করিল না। কহিল, ও কাজটা আমি বোধ হয় পেরে উঠব না। কারণ, হিঁদুয়ানীর জপ-তপ এবং ছুঁই-ছুঁই করার বিদ্যেটা ছেলেবেলা থেকেই শিখে ওঠবার সুবিধে পাইনি।

স্ত্রীর কথায় ক্ষেত্রমোহন আজকাল প্রায়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন, এখন কিন্তু,

ক্রোধ সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে বলিলেন, তোমার অতি বড় দুর্ভাগ্য যে, ও-সুযোগ তুমি পাওনি। পেলে হয়ত এতবড় বিড়ম্বনা তোমার দাদার অদৃষ্টে আজ ঘটত না। এই বলিয়া তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

১৪

ভবানীপুরের সেই সুশিক্ষিতা পাত্রীটিকে পাত্রস্থ করিবার চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হইল, শুধু বিভা এবার স্বামীর আন্তরিক বিরাগের ভয়ে তাহাতে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি নানা প্রকারে দেখাইতে বিরত রহিল না। কন্যা-পক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রমোহন একদিন সোজা-সুজি প্রশ্ন করিলে শৈলেশ অস্বীকার করিয়া সহজভাবেই কহিল, জীবনের অধিকাংশই ত গত হয়ে গেল ক্ষেত্র, বাকী ক'টা দিনের জন্য আর নতুন ঝঞ্ঝাট মাথায় নিতে ভরসা হয় না। সোমেন আছে, বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ কর তোমরা, সে বেঁচে থাক্—এ সবে আমার আর কাজ নেই।

মানুষের অকপট কথাটা বুঝা যায়, ক্ষেত্রমোহন মনে মনে আজ বেদনা বোধ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি আদালতের ফেরত প্রায়ই আসিতে লাগিলেন।

গৃহে গৃহিণী নাই, সন্তান নাই, গোটা-তিনেক চাকরে মিলিয়া সংসার চালাইতেছে —দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাড়িটা এমনি বিশৃঙ্খলা ছন্নছাড়া মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, ক্লেশ অনুভব না করিয়া পারা যায় না। প্রায় মাসাধিককাল পরে সে সেই কথারই পুনরুত্থাপন করিয়া কহিল, তুমি ত মনের ভাব আমার জান শৈলেশ, কিন্তু কেউ একজন বাড়িতে না থাকলে বাঁচা কঠিন। বিশেষ বুড়ো বয়সে—

উমা আজ উপস্থিত ছিল, সে বলিল, বুড়ো বয়সের এখনো ঢের দেরি এবং তার ঢের আগেই বৌদি এসে হাজির হবেন। রাগ করে মানুষে আর কতকাল বাপের বাড়ি থাকে? এই বলিয়া সে একবার দাদার প্রতি ও একবার শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু দুজনের কেহই জবাব দিল না। বিশেষতঃ শৈলেশের মুখ যেন সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু উমা চাহিয়াই আছে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ পরে শুধু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, তিনি আর আসবেন না।

উমা অত্যন্ত অবিশ্বাসে জোর করিয়া বলিল, আসবেন না? নিশ্চয় আসবেন। হয়ত এই মাসের মধ্যেই এসে পড়তে পারেন। হাঁ দাদা, পারেন না?

ফিরিয়া আসা যে কত কঠিন দাদা তাহা জানিতেন। যাইবার পূর্ব্বে শৈলেশের মুখের প্রত্যেক কথাটি তাহার বুকে গাঁথা হইয়াছিল, উষা কোনদিন যেসে-সকল বিস্মৃত হইতে পারিবে, তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। বধূর প্রতি শৈলেশের পিতা অপরিসীম অবিচার করিয়াছে, ফিরিয়া আসার পরে বিভা ঈর্ষাবশে বহুবিধ অপমান করিয়াছে এবং তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে শৈলেশ নিজে তাহার যাবার দিনটিতে তথাপি হিন্দু নারীর শিক্ষা ও সংস্কার, বিশেষ উষার মধুর চরিত্রের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়াটা ক্ষেত্রমোহন কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেন না। এই কথা মনে করিয়া তাঁহার যখনই কষ্ট হইত, তখনই এই বলিয়া তিনি আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিতেন যে, উষা নিজের প্রতি অনাদর অবহেলা সহিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যখন তাহার ধর্ম্মাচরণে ঘা দিল, সে আঘাত সে সহিল না। বোধ করি এইজন্যই বহুদিন পরে একদিন যখন তাহার স্বামী-গৃহে ডাক পড়িল, তখন এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু অভিমান করে নাই, নিঃশব্দে এবং নির্ব্বিচারে ফিরিয়া আসিয়াছিল। হিন্দু রমণীর এই ধর্ম্মাচরণ বস্তুটির সহিত সংস্কার-মুক্ত ও আলোক-প্রাপ্ত ক্ষেত্রমোহনের বিশেষ পরিচয় ছিল না। এখন নিজের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করিয়া আর-একজনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা, আপনাকে বঞ্চিত করিবার শক্তি দেখিয়া তাঁহার নিজেদের সমস্ত সমাজটাকেই যেন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হইত। তিনি মনে মনে বলিতেন, এতখানি সত্যিকার তেজ ত আমাদের কোন মেয়ের মধ্যেই নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইত, বুঝি এই সত্যকারের ধর্ম্ম-বস্তুটাই তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গেছে। যে বিশ্বাস আপনাকে পীড়িত করিতে পিছাইয়া দাঁড়ায় না, শ্রদ্ধার গভীরতা যাহার দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে দিয়া আপনাকে যাচাই করিয়া লয়, এ বিশ্বাস কই বিভার? কই উমার? আরও সে ত অনেককেই জানে, কিন্তু কোথায় ইহার তুলনা? ইহারই অনুভূতি একদিকে সঙ্কোচ ও আর-একদিকে ভক্তিতে তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ করিয়া দিতে থাকিত। কারণ, এই কয়টা দিনের মধ্যেই স্বামীকে যে উষা কতখানি ভালবাসিয়াছিল এ কথা ত তাঁহার অবিদিত ছিল না। আবার পরক্ষণেই যখন মনে হইত, সমস্ত ভাসিয়া গিয়া এত বড় কাণ্ড ঘটিল কিনা শুধু একজন মুসলমান ভৃত্য লইয়া—যে আচার সে পালন করে না, বাটীর মধ্যে তাহারই পুনঃপ্রচলন একেবারে তাহাকে বাড়ি ছাড়া করিয়া দিল। অপরে যাই কেন না করুক, কিন্তু বৌঠাকরুনকে স্মরণ করিয়া ইহারই সঙ্কীর্ণ তুচ্ছতায় এই লোকটি যেন একেবারে বিস্ময় ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

উমা প্রশ্ন করিয়া মুখপানে চাহিয়াই ছিল, জবাব না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, হাঁ দাদা, বললে না?

কি রে?

উমা কহিল, বেশ! আমি বলছিলুম বৌদি হয়ত এই মাসেই ফিরে আসতে পারেন। তোমার মনে হয় না দাদা?

ভগিনীর প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যদি ধরাই যায় তিনি আসবেন না—বহুকাল তাঁর না এসেই কাটছিল, বাকীটাও না এসে কাটতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি অন্য উপায় নেই? আমি সেই কথাই বলচি।

উমা ঠিক বুঝিল না, সে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

শৈলেশ তাহার বিস্মিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাঁর ফিরে আসা আমি সঙ্গত মনে করিনে উমা। তিনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু সহধর্ম্মিণী তাঁকে আমি বলতে পারিনে।

উষার বিরুদ্ধে এই অভদ্র ইঙ্গিতে ক্ষেত্রমোহন মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, ধর্ম্মই নেই আমাদের, তা আবার সহধর্ম্মিণী। ওসব উচ্চাঙ্গের আলোচনায় কাজ নেই ভাই, আমি সংসার চালাবার মত একটা ব্যবস্থার প্রস্তাব করচি।

শৈলেশ গভীর বিস্ময়ে কহিল, ধর্ম্ম নেই আমাদের?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, কোন্‌খানে আছে দেখাও? রোজগার করি, খাই-দাই থাকি, ব্যস্। আমাদের সহধর্ম্মিণী না হলেও চলে। তখনকার লোকের ছিল শ্রাদ্ধ-শান্তি, পূজো-পাঠ, ব্রত-নিয়ম—ধর্ম্ম নিয়েই তারা মেতে থাকত, তাদের ছিল সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। আমাদের অত বায়নাক্কা কিসের?

শৈলেশ মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, সহধর্ম্মিণী তাই? শ্রদ্ধ-শান্তি, পূজো-পাঠ—

কথা তাহার শেষ হইল না, ক্ষেত্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাই ভাই তাই, তা ছাড়া আর কিছু নয়। তুমিও হিঁদু, আমিও হিঁদু—without offence—পূজোও করিনে, মন্দিরেও যাইনে, কেষ্ট-বিষ্টুকে ধরে খোঁচা-খুঁচি করার কু-অভ্যাসও আমাদের নেই—মেয়েরা ত আরও harmless, আমরা সহজ মানুষ—লোক ভাল। কি হবে ভাই আমাদের অত বড় পাঁচ-সাতটা অক্ষরের সহধর্ম্মিণী নিয়ে, ছোট্ট একটু স্ত্রী হলেই আমাদের খাসা চলে যাবে। তুমি ভাই দয়া করে একটু রাজী হও—ভবানীপুরের ওঁরা ভারী ধরেছেন—তোমার বোনটিরও ভয়ানক ইচ্ছে, কথাটা রাখো শৈলেশ।

শৈলেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ কোরচ, ক্ষেত্র!

ব্যাপার দেখিয়া উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রমোহন ভীত হইয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, না ভাই শৈলেশ, না। যদি ও রকম কিছু করেও থাকি, তোমার চেয়ে আমাকেই আমি বেশী করেচি।

শৈলেশ প্রতিবাদ করিল না, কেবল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

১৫

কথাটাকে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে শান্ত হইবার পাঁচ-সাত দিন সময় দিয়া আর একদিন ফিরিয়া আসিয়া তখন ভবানীপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া তিনি উমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু সপ্তাহ গত না হইতেই ছাপরার কোর্টে হঠাৎ একটা মোকদ্দমা পাওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে পাত্রী-পক্ষ ও পাত্র-পক্ষের তরফে বিভাকে আশা দিয়া গেলেন যে, কেস যতটা হোপলেস মনে হইতেছে, বস্তুত তাহা নয়। বরঞ্চ, মাছ চারের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, হঠাৎ টোপ গিলিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নয়।

অনেকদিন পরে স্ত্রীর সহিত আজ তাঁহার সদ্ভাবে বাক্যালাপ হইল। উমার মুখে বিভা কিছু কিছু ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, আমি মনে করতুম ঊষা-বৌদিদির তুমি পরম বন্ধু, তুমি যে আবার দাদার বিয়ের উদ্যোগ করতে পারো, মাসখানেক আগে এ কথা ভাবতেও পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মাসখানেক পূর্ব্বে কি আমিই ভাবতে পারতুম? কিন্তু এখন শুধু ভাবা নয়, উচিত বলেই মনে হয়। ঊষা-বৌঠাকরুনের বন্ধু আমি এখনও, এবং চিরদিন তাঁর শুভ কামনাই করব; কিন্তু যা হবার নয়, হয়ে লাভ নেই তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেই বা ফল কি!

বিভা অতি-বিজ্ঞের চাপাহাসি দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, তোমরা পুরুষ-মানুষ বলেই বোধ হয় বৌঠাকরুনটিকে বুঝতে এত দেরি হ'ল, আমি কিন্তু দেখবামাত্রই তাঁকে চিনেছিলুম। তাঁকে নিয়ে আমরা চলতে পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, সে ত চোখেই দেখতে পেলুম বিভা, তাঁকে সরে পড়তে হ'ল এবং তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বোঝবার পার্থক্য ঘটেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একটু অন্য রকমের হলে আজ জিনিসটা কি দাঁড়াত এখন সে আলোচনা বৃথা, তবে এ কথা তোমার মানি, ভুল আমার একটু হয়েছিল।

বিভা কহিল, যাক, তা হলেই হ'ল। জপ-তপ আর হিঁদুয়ানীর সুখ্যাতিতে হঠাৎ যে রকম মেতে উঠেছিলে, আমার ত ভয় হয়েছিল। আমরাও মুসলমান-খ্রীষ্টান নই, কিন্তু নিজে ছাড়া সবাই ছোট, হাতে খেলে-ছুঁলেই জাত যাবে—এ দর্প কেন? শুধু ভট্টচায্যিগিরি ছাড়া আর সব রাস্তাই নরকে যাবার, এই ধারণা তাঁর বাপের বাড়িতে চলতে পারে, কিন্তু এখানে পারে না। আর পারে না বলেই ত স্বামীর আশ্রয়ে তাঁর স্থান হ'ল না।

কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। এমন করিয়া সত্য-মিথ্যায় জড়ানো বলিয়া ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, জবাব দিতে পারিলেন না।

এই সময়ে উমা ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

বিভা তাহার নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, শুধু আপনার জাত বাঁচিয়ে যাওয়াটাই কি বৌদিদির সবচেয়ে বড় হ'ল? ধর, তোমার নালিশটা যদি সত্যি হয়, আমার জন্যে দাদা যদি তাঁকে অপমান করেই থাকেন, তেমনি অপমান কি তাঁর জন্যে তুমি আমাকে করনি? তাই বলে কি তোমাকে ছেড়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব। এই কি তুমি বল?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, না, তা আমি বলিনে।

বিভা কহিল, বলতে পারো না আমি জানি। উমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার দাদা হঠাৎ একটা নূতন জিনিসের বাইরেটা দেখেই মজে গিয়েছিলেন। হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামির শিক্ষা আমরা পাইনি, কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে যা পেয়েছিলুম সে ঢের ভদ্র, ঢের সত্য। একটু হাসিয়া কহিল, তোমার দাদার ভারী ইচ্ছে ছিল, বৌঠাকরুনের কাছ থেকে তুমি অনেক কিছু শেখো। বসে শোনবার এখন সময় নেই ভাই, কিন্তু কি কি তাঁর কাছে শিখলে আর কি-ই বা বাকী রয়ে গেল, তোমার দাদাকে না হয় শোনাও। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছোট ভগিনীর সম্মুখে স্ত্রীর হাতের খোঁচা তাঁহাকে বেশী করিয়াই বিঁধিল, কিন্তু জবাব দিতে পারিলেন না। হিঁদুয়ানীর অনেকখানি হইতেই তাঁহারা ভ্রষ্ট, কিন্তু মেয়েদের আচারনিষ্ঠা সাবেক দিনের জীবন-যাত্রার ধারা কল্পনায় তাঁহাকে অতিশয় আকর্ষণ করিত। এইজন্যেই চোখের উপরে অকস্মাৎ ঊষাকে পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাহারই আচরণে আজ সকলের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গেছে। এই বধূটিকেই কেন্দ্র করিয়া সে যে শিক্ষা ও সংস্কারের কথা আত্মীয়-পরিজন মধ্যে মেয়েদের কাছে সগর্ব্বে বার বার বলিত, সেইখানেই তাহার অত্যন্ত লাগিয়াছে। নিজের জন্য ঊষা নিজেই শুধু দায়ী, তাহার অন্যায় আর কিছু স্পর্শ করে নাই—করিতেই পারে না। এই কথাটা তিনি জোর দিয়া বলিতে চাহিলেও মুখে তাঁহার বাধিয়া যাইত। তাই স্ত্রী চলিয়া গেলে তিনি উমার কাছে কতকটা জবাবদিহির মতই সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, গোঁড়ামি সকল জিনিসেরই মন্দ এ আমি অস্বীকার করিনে উমা—হিঁদুয়ানীর ঐ গলদটাই ঘুচানো চাই—কিন্তু আমরা যে আরও মন্দ এ কথা অস্বীকার করলে ত আরও অন্যায় হবে।

দাদা ও বৌদির বাদ-বিতণ্ডার আলোচনায় উমা চিরদিনই মৌন হইয়া থাকিত, বিভার অনুপস্থিতিতেও তাই এখনও নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

সেই রাত্রে ছাপরা যাইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রমোহন বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার ফিরতে বোধ করি চার-পাঁচদিন দেরি হবে, ইতিমধ্যে ভবানীপুরে ওঁদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়, ব'লো, শৈলেশকে সম্মত করাতে আমি পারব।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠাকুরুন তাহলে আর ফিরবেন না।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, না। যতই ভাবছি, মনে হচ্চে শৈলেশের চেয়ে তাঁর অপরাধই বেশী। তুমি ঠিক কথাই বলেচ। যে শিক্ষায় মানুষকে এত বড় সঙ্কীর্ণ এবং স্বার্থপর করে তোলে, সে শিক্ষার মূল্য এককালে যতই থাক্ এখন আর নেই। অন্ততঃ আমাদের মধ্যে তার আর পুনঃপ্রচলনের আবশ্যকতা নেই। তাই বটে। বৌঠাকরুনের আচার-বিচারের বিড়ম্বনাই ছিল, বস্তু কিছু ছিল না। থাকলে গৃহাশ্রম ত্যাগ করতেন না। আচ্ছা চললুম, এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া মোটরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

মফঃস্বলে মোকদ্দমা সারিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার পাঁচদিনের বদলে দিন-দশেক বিলম্ব হইয়া গেল। বাটীতে পা দিয়া প্রথমেই দেখা মিলিল উমার। সে-ই খবর দিল যে, দিন-দুই পূর্ব্বে মাস-ছয়েকের ছুটি লইয়া শৈলেশবাবু আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছেন, এবং সোমেনকেও স্কুল ছাড়াইয়া এবার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

এমন হঠাৎ যে?

উমা কহিল, কি জানি! সোমেনকে নিতে এসেছিলেন, বললেন, শরীর ভাল নয়।

বিভার ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শরীর ভাল না থাকবারই কথা, কিন্তু সারবার ব্যবস্থাও এ নয়। আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু উমা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

১৬

আরও পাঁচটা জুনিয়ার ব্যারিস্টারের যে ভাবে দিন কাটে, ক্ষেত্রমোহনের দিনও তেমনি কাটিতে লাগিল। হাতে টাকার টান পড়িলে হিঁদুয়ানী ও সাবেক চাল-চলনের অশেষ প্রশংসা করেন, আবার অর্থাগম হইলেই চুপ করিয়া যান—যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলে। শৈলেশের তিনি বাস্তবিক শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাকে

চিনিতেন, তাহার মত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষকে দিয়ে প্রায় সব কাজই করানো যায়, এই মনে করিয়া তিনি ভবানীপুর এখনও হাতছাড়া করেন নাই। তাহাদের এই বলিয়া ভরসা দিতেন যে, পশ্চিম হইতে ঘুরিয়া আসার যা বিলম্ব। বৌঠাকরুনকে তিনি এখনও প্রায় তেমনি স্নেহ করেন, তেমনি শ্রদ্ধাই প্রায় এখনও তাঁহার প্রতি আছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কাজ নেই। যেখানে থাকুন, সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন, ধর্ম্ম-জীবনের তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক, কিন্তু শৈলেশের গৃহস্থালীর মধ্যে আর নয়। নিজের একটা ভুল এখন প্রায়ই মনে হয়, স্বামীকে উষা ভালবাসিতে পারে নাই, পারাও কখনও সম্ভব নয়। ছেলেবেলা হইতে কড়া রকমের আচার-বিচারের ভিতর দিয়া ধাতটা তাহার কড়া হইয়াই গেছে, সুতরাং ইহকালের চেয়ে পরকালই তাহার বেশী আপনার। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও তাই এত সহজ হইয়াছে। তাঁহার নিজের মধ্যে যে স্বামী ছিল, উষার এই আচরণে সে যেমন ভীত, তেমনি ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইত, সোমেনকে যে সে এত সত্বর ভাল বাসিয়াছিল, সেও কেবল সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার কড়া কর্ত্তব্যের দিক দিয়া। সত্যকার স্নেহ নয় বলিয়াই যাবার দিনটিতে কোথাও কোন টান লাগে নাই।

এমনিভাবেই যখন কলিকাতায় ইহাদের দিন কাটিতেছিল, তখন মাস-দুই পরে সহসা এলাহাবাদ হইতে খবর আসিল যে, সোমেনের এই কচি বয়সেই শৈলেশ তাহার পৈতা দিয়াছে. এবং নিজেও এক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গাস্নান একটা দিনের জন্যেও পিতাপুত্রের বাদ যাইবার জো নাই এবং মাছ-মাংস যে পাড়ায় আসে সে পথ দিয়া শৈলেশ হাঁটে না।

শুনিয়া উমা চুপি চুপি হাসিতে লাগিল। বিভা কহিল, তামাশাটি কে করলেন? যোগেশবাবু?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, খবর যোগেশবাবুর কাছ থেকেই এসেচে সত্যি, কিন্তু তামাশা করবার মত ঘনিষ্ঠতা ত তাঁর সঙ্গে নেই।

বিভা কহিল, দাদার বন্ধু ত, দোষ কি? একটু থামিয়া বলিলেন, কেন জানো? বৌদিদির সমস্ত ব্যাপার দাদার কাছেই শুনেছেন এবং এত লোকের মাঝখানে তুমিই শুধু তাঁর গোঁড়ামির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে—তাই এ রসিকতাটুকু তোমার 'পরেই হয়েচে। সহাস্যে বলিতে লাগিল, কেস্ আরম্ভ করবার সময় মাঝে মাঝে বুদ্ধিটা যদি আমার কাছে নাও ত মোকদ্দমা বোধ হয় তোমাকে এত হারতে হয় না। উমা, আজ একটু চটপট তৈরি হয়ে নাও, সাতটার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে কিন্তু লাবণ্য রাগ করবে। তোমার দাদাটিকে আড়ালে ডেকে একটু বলে দিয়ো ভাই, ঠেকলে যেন এখন থেকে কমপ্লেন্ট করেন। পয়সা যারা দেয় তারা খুশী হবে।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবুর হঠাৎ ঠাট্টা করার হেতুটা যে বৌদিদি ঠিক অনুমান করিয়াছেন তাহা সে বুঝিল।

ইহার দিন পাঁচ-ছয় পরে, একখানা মস্ত চিঠি আনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, যোগেশবাবুর বাবার লেখা। বয়স সত্তর-বাহাত্তর—চাক্ষুস আলাপ নেই, চিঠিপত্রেই পরিচয়। লোক কেমন ঠিক জানিনে, তবে এটা ঠিক জানি যে, ঠাট্টার সুবাদ আমার সঙ্গে তাঁর নেই।

দীর্ঘ পত্র, বাংলায় লেখা। আদ্যোপান্ত বার-দুই নিঃশব্দে পড়িয়া বিভা মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি? তোমাকে ত একবার যেতে হয়।

কিন্তু আমার ত এক মিনিটের সময় নেই।

বিভা কহিল, সে বললে হবে না। এ বিপদে আমরা না গেলে আর যাবে কে? এ চিঠির অর্দ্ধেকও যদি সত্যি হয়, সে যে ঘোরতর বিপদ তাতে ত আর একবিন্দু সন্দেহ নেই!

ক্ষেত্রমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যাই কি করে? এবং গেলেই যে বিপদ কাটবে তারই বা ঠিকানা কি!

দুজনে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশের দ্বারা সমস্তই সম্ভব, মনের জোর বলে যে বস্তু, সে তার একেবারে নেই। মরুক গে সে, কিন্তু দুঃখ এইটুকু যে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও সে বিগড়ে তুলচে। যেমন করে পারো এইখানে তোমার বাধা দেওয়া চাই।

বিভা বিষণ্ণ গম্ভীর-মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কান্নাকাটি, অভিমান সমস্তই করিতে পারে, কিন্তু ঠেকাইবার সাধ্য তাহার নাই, তাহা সে মনে মনে জানিত। ক্ষেত্রমোহন অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল, কিন্তু একটি জিনিস আমি নিশ্চয় ধরেচি বিভা, উষাকে তোমার দাদা সত্যই ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমেনের মাকে কোনদিন বাসেনি। এ-সব হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া।

বিভা রাগ করিল। কহিল, তাই, এমনি করে তাঁর মন পাওয়ার চেষ্টা করচেন? দেখ, দাদা আমার দুর্ব্বল হতে পারেন, কিন্তু ইতর নন। কারও জন্যেই এই সঙ সাজার ফন্দি মাথায় আসবে না।

এই প্রতিক্রিয়া বস্তুটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার বিভা তাহার কি জানে! শব্দটা শুধু ক্ষেত্রমোহন বইয়ে পড়িয়াছেন, তিনিও ইহার বিশেষ কিছু জানেন না, তাই স্ত্রীর ক্রোধের প্রত্যুত্তরে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন অন্ধকারে তর্কযুদ্ধ চালাইতে তাঁহার সাহস হইল না।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া যাই হোক কাজের বেলায় বিভাই জয়ী হইল। স্বামীকে দিন-

দুদিনের মধ্যেই কাজ-কর্ম ফেলিয়া এলাহাবাদ রওনা হইতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি অপ্রিয়। যোগেশবাবুর বাটীর কাছেই বাসা, কিন্তু শৈলেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সে গুরু-ভাইদের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনে বৃন্দাবনে গিয়াছে, দেখা হইয়াছে সোমেনের সঙ্গে। তাহার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচারীর বেশ, শাস্ত্রসম্মত আচার-বিচার। স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় বোধ করি ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখাইয়া যান। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমাকে দেখে সে বেচারার দুচোখ ছল ছল করতে লাগলো। তার চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন খাবার কষ্টটাই তার বেশী হয়েছে।

ওই ছেলেটির প্রতি বিভার একপ্রকারের স্নেহ ছিল, তাহা অত্যন্ত বেশী না হইলেও বিদেশে দুঃখ পাইতেছে শুনিয়া সে সহিতে পারিল না। তাহার নিজের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তাকে জোর করে নিয়ে এলে না কেন?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু ভেবে দেখলুম, তাতে শেষ পর্য্যন্ত সুফল ফলবে না। ধর্ম্মের ঝোঁকটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি। শৈলেশ আমাদের উপর ঢের বেশী বেঁকে যেত।

বিভা চোখ মুছিয়া কহিল, এত ব্যাপার ঘটেছে জানলে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যেতুম।

১৭

চিঠি লেখালেখি এক প্রকার বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, তথাপি কলিকাতায় আত্মীয়-বন্ধুমহলে শৈলেশের অদ্ভুত কীর্ত্তিকথা প্রচারিত হইতে বাধে নাই। হয়ত বা স্থানে স্থানে বিবরণ একটু ঘোরালো হইয়াই রটিয়াছিল। ভবানীপুরে এ সংবাদ যে গোপন ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। লজ্জায় বিভা মুখ দেখাইতে পারিত না, শুধু স্বামীর কাছে সে দম্ভ করিয়া বলিত, দাদা আগে ফিরে আসুন, আমার সুমুখে কি করে এ-সব করেন আমি দেখবো।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া থাকিতেন—বিভার দ্বারা বিশেষ কিছু যে হইবে তাহা বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু সমাজের সমবেত মর‍্যাল প্রেসারের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। দুর্ব্বলচিত্ত শৈলেশ হয়ত তাহা বেশী দিন ঠেকাইতে পারিবে না, এ ভরসা তিনি করিতেন।

এদিকে শৈলেশ আরও মাস-চারেক ছুটি বাড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাও শেষ হইতে আর মাস-দুই বাকী। চাকরি ছাড়িতে সে পারিবে না তাহা নিশ্চয়। গঙ্গাস্নান ও

ফোঁটা-তিলক যতই কেন না সে প্রয়াগে বসিয়া করুক, শ্রীগুরু ও গুরুভাইদের দল এ কুমতলব তাহাকে প্রাণ গেলেও দিবে না। তার পরে ফিরিয়া আসিলে একবার লড়াই করিয়া দেখিতে হইবে।

সেদিন চা খাইতে বসিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এবার কিন্তু উষা বৌঠাকরুন এলে তাঁকে তাড়াতাড়ি ভাইকে ডাকিয়ে, আর বাপের বাড়ি পালাবার ফন্দি করতে হবে না। জপ-তপের মধ্যে দুজনের বনবে!

বিভার মুখ মলিন হইল, জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আসার কথা তুমি শুনেচ নাকি!

না।

বিভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, পাড়াগাঁয়ে শুনেচি নানা-রকমের তুক্‌তাক্‌ আছে, আচ্ছা, তুমি বিশ্বাস কর?

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, না। যদিও বা থাকে তিনি এসব করবেন না।

কেন করবেন না?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, বৌঠাকরুনের ওপর আমি খুশী নই, তাঁর প্রতি আমার সে শ্রদ্ধাও আর নেই, কিন্তু এই সব হীন কাজ যে তিনি করতেই পারেন না তা তোমাকে আমি দিব্যি করে বলতে পারি।

বিভা ঠিক বিশ্বাস করিল না। শুধু ধীরে ধীরে কহিল, যা ইচ্ছে হোক, কিন্তু ছেলেটাকে আমি কেড়ে আনবই, তোমাকেও আমি প্রতিজ্ঞা করে বললুম।

বেহারা আসিয়া খবর দিল, বন্ধু দু'খানা বড় কার্পেট চাহিতে আসিয়াছে। বন্ধু শৈলেশের অনেক দিনের ভৃত্য, বিভা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সে কার্পেট নিয়ে কি করবে? বলিতে বলিতে উভয়েই বাহিরে আসিতেই বন্ধু সেলাম করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল।

কার্পেটে হবে কি বন্ধু?

কি জানি মেমসাহেব, গান-বাজনা না কি হবে।

করবে কে?

সাহেবের সঙ্গে তিন-চারজন লোক এসেছে, করবে বোধ হয় তারাই।

দাদা এসেছেন?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশ এসেছে?

বন্ধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, কাল রাত্রে সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। কার্পেট লইয়া সে প্রস্থান করিলে দুজনেই নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেইদিনটা কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষেত্রমোহন পরদিন বিকালে বিভা ও উমাকে সঙ্গে করিয়া এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্যাসমত নীচের লাইব্রেরি-ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পড়িল। দরজার সে ভারী পর্দাটা নাই, ভিতরের সমস্তই

চোখে পড়িল। একটা দিনেই বাড়ির চেহারা বদলাইয়া গেছে। বইয়ের আলমারি-গুলো আছে, আর কোন আসবাব নাই। মেঝের উপর কম্বল ও তাহাতে ফর্সা জাজিম পাতিয়া জন-দুই লোক নধর পরিপুষ্ট-দেহের সর্ব্বত্র হরিনামের ছাপ মারিয়া, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা পরিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ সাহেব-মেম দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটাইয়া তিনজনে উপরে যাইতেছিলেন, উড়িয়া পাচক-ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়া কহিল, উপরের ঘরে গোঁসাইনি আছেন।

গোঁসাইনিটা কে?

পাচক ঠাকুর চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কোথায়?

উত্তরে সে উপরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে ক্ষেত্রমোহন সেইখানে দাঁড়াইয়া শৈলেশ, শৈলেশ করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ছুটিয়া আসিল সোমেন। হঠাৎ তাহার বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া বিভা কাঁদিয়া ফেলিল। পরণে সাদা থান, মাথায় মস্ত টিকি, গলায় তুলসীর মালা, সে দূর হইতে প্রণাম করিল, কিন্তু কাছে আসিল না। উমা ধরিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক্‌, অ-বেলায় আর ছুঁয়ে কাজ নেই। ও-বেচারাকে হয়ত আবার নাইয়ে দেবে। বাবা কোথায় সোমেন?

সোমেন কহিল, প্রভুপাদ শ্রীভাগবৎ পড়ছেন।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম, শ্রীবাবাকে একবার খবরটা দাও।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে খড়ম পায়ে শৈলেশ নীচে আসিল। থান কাপড়, গায়ে জামা, মাথায় একটা সরু গোছের টিকি ছাড়া বাইরের চেহারায় তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু ভিতরের দিকে যে অনেক বদল হইয়া গেছে তাহা চক্ষের পলকেই চোখে পড়ে। অত্যন্ত বিনীত ভাব, মৃদু কথা—উমা ও বিভা প্রণাম করিলে সে দূরে দাঁড়াইয়াই আশীর্ব্বাদ করিল, স্পর্শ করিতে নিকটে আসিল না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাড়িতে একটু বসবার জায়গা নেই নাকি হে?

শৈলেশ লজ্জিতভাবে কহিল, বাইরের ঘরটা নোঙরা হয়ে আছে, পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তাহলে এখনকার মতো আমরা বিদায় হই। সোমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এখন চললুম। আমাদের বোধ করি আর বড় একটা প্রয়োজন হবে না, তবু বলে যাই, বসবার জায়গা যদি কখনও একটা হয় ত খবর দিস্‌ বাবা। চল।

শৈলেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ীতে বিভা কাহারও সহিত একটা কথাও কহিল না, তাহার দুচক্ষু বাহিয়া হু-হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। একটা কথা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া আসিলেন, ও-বাড়িতে তাঁহাদের আর স্থান নাই। দাদা যা-ই কেন না করুক, সোমেনকে সে জোর করিয়া কাড়িয়া আনিবে বলিয়া বিভা স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। স্নেহের সেই দাম্ভিক উক্তি স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই বার বার মনে পড়িল, কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় ইহার আভাস পর্য্যন্তও কেহ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ইহার পর মাসাধিক-কাল গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কথাটা আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু-সমাজে এমন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে যে, লোকে সত্যের মধ্যেও আর যেন আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। মুখে মুখে অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া সমস্ত জিনিসটা এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে যে কোথাও যাওয়া আসাও বিভার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, অথচ কোনদিকে কোন রাস্তাই কাহারও চোখে পড়িতেছে না। ক্ষেত্রমোহন জানিতেন, সংসারে অনেক উত্তেজনাই কালক্রমে ম্লান হইয়া আসে, ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়া থাকাই তাহার উপায়, শুধু এই পরকালের লোভের ব্যবসাটাই একবার শুরু হইয়া গেলে আর সহজে থামিতে চাহে না। অনিশ্চিতের পথে এই অত্যন্ত সুনিশ্চিতের আশাই মানুষকে পাগল করিয় যেন নিরন্তর ঠেলা দিয়া চালাইতে থাকে। ইহার উপরেও প্রচণ্ড বিভীষিকা ঊষা। বন্ধু ও শত্রুভাবে সর্ব্বনাশের বনিয়াদ গড়িয়া গেছে সে-ই। কোনমতে একটা খবর পাইয়া যদি আসিয়া পড়ে ত অনিষ্টের বাকী কিছু আর থাকিবে না। কেবল বিভাই নয়, তাহার উল্লেখে উমার, এমনকি ক্ষেত্রমোহনেরও আজকাল গা জ্বলিতে থাকে। বাস্তবিক তাহাকে না আনিলে ত এ বালাই কোনদিনই ঘটার সম্ভাবনা ছিল না।

আজ রবিবারে সকালবেলা স্বামী-স্ত্রীতে আসিয়া এই আলোচনাই করিতেছিল। সেই অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসার দিন হইতে ইঁহারা সে-মুখোও আর হন নাই, কিন্তু সে বাড়ির খবর পাইতে বাকী থাকিত না। গুরুভ্রাতার দল অদ্যাবধি নড়িবার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনেন না এবং শ্রীগুরু ও গোঁসাই-ঠাকুরানী উপরের ঘরে তেমনি কায়েম হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সকাল-সন্ধ্যায় নামকীর্ত্তন অব্যাহত চলিয়াছে, ভোগাদির ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, এ-সকল সংবাদ বন্ধুজনের মুখে নিয়মিতভাবেই বিভার কানে পৌঁছে; কেবল অতিরিক্ত একটা কথা সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা জায়গা লইয়া শৈলেশ গুরুদেবের আশ্রম তৈরি করার সঙ্কল্প করিয়াছে এবং এই হেতু অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে।

বিভা মলিনমুখে কহিল, যদি সত্যই হয়, দাদাকে কি একবার বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না? ছেলেটা কি চোখের সামনে ভেসেই যাবে?

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি করতে পারি বল?

বিভা চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া কি হইতে পারে সে তাহার কি জানে।

ক্ষেত্রমোহন সহসা বলিয়া উঠিলেন, সেই পর্য্যন্ত ত কখনও যাইনি, আজ চল না একবার যাই!

বিভার বুকের মধ্যেটা আজ সত্যই কাঁদিতেছিল, তাই বোধ হয় আজ তথায় মান-অভিমানের স্থান হইল না, সহজেই সম্মত হইয়া বলিল, চল।

উমাকে আজ তাহারা সঙ্গে লইল না। এই মেয়েটির সম্মুখে লজ্জার মাত্রাটা আজ তাহাদের বাড়াইবার প্রবৃত্তি হইল না। মোটর যখন তাহাদের শৈলেশের বাড়ির সুমুখে আসিয়া থামিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গেছে। বাহিরের ঘরটা আজ খোলা, গুরুভাই-যুগল মেঝের উপরে বসিয়া একটা বড় পুঁটুলি করিয়া বাঁধিতেছেন। ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈলেশবাবু বাড়ি আছেন?

তাঁহারা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শেষে উত্তর দিলেন, না, তিনি পরশু গেছেন নবদ্বীপধামে।

কবে ফিরবেন?

কাল কিংবা পরশু সকালে।

বাবুর ছেলে বাড়িতে আছে?

তাঁহারা উভয়েই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন আছে, এবং তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেলেন।

অতঃপর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুজনের একসঙ্গেই চোখে পড়িল, লাইব্রেরি-ঘরের দ্বারে সেই পুরানো ভারী পর্দ্দাটা আজ আবার ঝুলিতেছে। একটু ফাঁক করিতেই চোখে পড়িল, পূর্ব্বের আসবাব-পত্র যথাস্থানে সমস্তই ফিরিয়া আসিয়াছে। বিভা কহিল, ওই দুটো লোককে সরিয়ে দিয়ে দাদা আবার ঘরটায় শ্রী ফিরিয়েচেন। এটুকু সুবুদ্ধিও যে তাঁর আর কখনও হবে আমার আশা ছিল না। কিন্তু বলা তাহার শেষ না হইতেই সহসা পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বাকশূন্য হইয়া গেল। সোমেন বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, রবারের একটা বল লুফিতে লুফিতে আসিতেছে। কোথায় বা মালা, কোথায় বা টিকি, আর কোথায় বা তাহার ব্রহ্মচারীর বেশ। খালি গা, কিন্তু পরনে চমৎকার লালপেড়ে জরি বসানো ধুতি, মাথার চুল বাঙালী ছেলেদের মত পরিপাটি ছাঁটা, পায়ে বার্নিশ-করা পাম্পসু। সে ছুটিয়া আসিয়া বিভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, মা এসেচেন পিসীমা, রান্নাঘরে রাঁধচেন, চল। এই বলিয়া সে টানিতে লাগিল।

বিভা স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মা এসেছেন, না সোমেন? তাই ত বলি—

কাল দুপুরবেলা এসেছেন। চলুন পিসেমশাই রান্নাঘরে।

চল।

তিনজনে রন্ধনশালার সুমুখেই আসিতে উষা সাড়া পাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভা পায়ের জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল। কহিল, কি কাণ্ড হয়েছে দেখলে বৌদি?

উষা হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাসিয়া কহিল, দেখলুম বই কি ভাই। ছেলেটার আকৃতি দেখে কেঁদে বাঁচিনে। তাড়াতাড়ি মালা-কালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নাপতে ডাকিয়ে চুল কেটে দিই, নতুন কাপড় জুতো কিনে আনিয়ে পরিয়ে তবে তার পানে চাইতে পারি। আচ্ছা আপনিই বা কি করছিলেন বলুন ত? এই বলিয়া সে কটাক্ষে ক্ষেত্রমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বলবার তাড়াহুড়ো নেই বৌঠাকরুন, ধীরে সুস্থে সমস্তই বলতে পারব, এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু খেতে দিন। ভাল কথা, গুরুভাই দুটি ত দেখলুম, বাহিরে পুঁটলি বাঁধছেন, কিন্তু শ্রীপ্রভুপাদ-যুগল মূর্ত্তির কি করলেন? ওপরে তাঁরা ত নেই?

উষা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না, ভয় নেই, তাঁরা নবদ্বীপধামে গেছেন।

বলি, আবার ফিরে আসছেন না ত?

উষা তেমনই মৃদু হাসিয়া শুধু কহিল, না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বৌঠাকরুন, আপনার যে এরূপ সুবুদ্ধি হবে এ ত আমাদের স্বপ্নের অগোচর। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-কুমারের স্বহস্তে তুলসীমালা ছিঁড়ে দিয়ে টিকি কেটে দিয়ে—এসব কি বলুন ত?

উষা হাসিমুখে ক্ষেত্রমোহনের কথা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, বেশ ত, বলবার তাড়াহুড়ো কি জামাইবাবু! ধীরে-সুস্থে সমস্তই বলতে পারব এখন। ওপরে চলুন, আগে কিছু আপনাদের খেতে দিই।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীকান্ত (২য় পর্ব্ব)

প্রথম প্রকাশ—১৩২৪ সালের আষাঢ়—ভাদ্র, অগ্রহায়ণ—চৈত্র এবং ১৩২৫ সালের বৈশাখ—আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ (ভাদ্র, ১৩২৫)।

পল্লী-সমাজ

প্রথম প্রকাশ—১৩২২ সালের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—১৫ই জানুয়ারী, ১৯১৬ (মাঘ, ১৩১২)। ১৩৫৫ সালের শ্রাবণ মাসে ইহার নাট্য-রূপ 'রমা' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

বিরাজ-বৌ

প্রথম প্রকাশ—১৩২০ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—২রা মে, ১৯১৪ (বৈশাখ, ১৩২১)। ইহার নাট্য-রূপ সর্ব্বপ্রথমে ১৩৪১ সালে প্রকাশিত হয়।

নব-বিধান

প্রথম প্রকাশ—১৩৩০ সালের মাঘ—ফাল্গুন এবং ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন—কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯২৪ (আশ্বিন, ১৩৩১)।

দ্বিতীয় সম্ভার

সমাপ্ত